প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান

রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন
বি.এ, ডি-লিট্, কবিশেখর

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম ছাপা—অক্টোবর, ১৯৪০

প্রকাশক

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রিণ্টার্স

১৩৮ বিধান সরণী

কলকাতা-৪

ভূমিকা

এই পুস্তকের অনেকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া তথায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমি লিখিয়াছি। ১৯৩৭ সনের নভেম্বর মাসে আমি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চারিটি বক্তৃতা প্রদান করি। সেই বক্তৃতাগুলি এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

বেহালা
২৬শে সেপ্টেম্বর,
১৯৩৮

সূচীপত্র

———

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতরণিকা

আশা করি, আপনারা আমার বক্তৃতাগুলি কতকটা ক্ষমা-সহকারে শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য রাখিয়া শুনিবেন। আমার বিশ্বাস, আমি আপনাদিগকে কতকগুলি নূতন তথ্যের সন্ধান দিতে পারিব, তাহা জানিলে আপনারা প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুরাগী হইবেন। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র ভাণ্ডার-গৃহে যাইতে হইলে কতকটা সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হইবে; এই নিবন্ধের প্রথম দিকটায় সেই সিঁড়ি ভাঙ্গার কষ্ট আপনাদিগকে সহ্য করিতে হইবে। আমার একান্ত অনুরোধ, শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া আপনারা আমার বিচার করিবেন না।

সূচনায় একটা কড়া কথা দিয়া বক্তৃতার মুখ-বন্ধ করিব। এই কথাটার ভাবের সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। কিন্তু ভাষাটা বড়ই তীব্র, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। কথাটা আমি লিখি নাই, একজন মুসলমান কবি লিখিয়াছেন।

নোয়াখালী জেলার সন্দ্বীপ নামক স্থানের সুধারাম পল্লীনিবাসী আবদুল হাকিম নামক এক কবি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিয়াছিলেন—

"যে সবে বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি॥
মাতা-পিতামহ-ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগি' কেন বিদেশে না যায়॥"

—নূর নামা। *

যে সকল মুসলমান বঙ্গদেশের সন্তান হইয়াও বঙ্গভাষা-বিদ্বেষী, কবির তাঁহাদিগের প্রতি এই কড়া বিদ্রূপ। ডক্টর এনামুল হক্ এবং সাহিত্য-বিশারদ আবদুল করিম লিখিয়াছেন—"এই শ্লেষ শুধু পূর্ব্ব-বঙ্গীয় মুসলমানদের বঙ্গভাষা প্রীতি ঘোষণা করিতেছে না, বরং এখনও যাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমানের ঘাড়ে উর্দ্দু চাপাইতে চাহেন, তাঁহাদের অদ্ভুত মানসিকতার প্রতি ইহা অতি তীব্র মন্তব্য।" ডক্টর এনামুল হক্ আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে,—"অল্প-সংখ্যক সৈয়দ, সেখ ও মোগল ছাড়া বাঙ্গালার বিপুল মুসলমান জনসাধারণ খাঁটি বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলা ভাষাকেই প্রাচীনকাল হইতে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।" * *

এই জনসাধারণ কাহারা? ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইস্‌লাম গ্রহণ করিবার বহুপূর্ব্বে অপরাপর বাঙ্গালীর সঙ্গে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও 'হেলায় লঙ্কা জয়' করিয়াছিল। এই বাঙ্গালা দেশের অনেকাংশ পূর্ব্বে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল এবং সেই প্রাচীন বাঙ্গালীরা 'কলিঙ্গবাসী' নামে পরিচয় দিয়া যাভা, বলি, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপসমূহে

* 'আরাকান রাজ-সভায় বাঙ্গলা সাহিত্য'—ডক্টর এনামুল হক্ ও সাহিত্য-বিশারদ আবদুল করিম প্রণীত—৯১ পৃঃ।

* * ঐ—৯১—৯৩ পৃঃ।

বাঙ্গালার অক্ষয় ভাস্কর্য্য ও চিত্র-সংস্কৃতি লইয়া গিয়াছিল।* জাপানের বৌদ্ধ পুরোহিতেরা ইহাদের অক্ষর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাকার হুরি-উজি মন্দিরে তাহার যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, আধুনিককাল পর্য্যন্ত তথাকার বৌদ্ধ-পুরোহিতেরা তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন; সে অক্ষর নবম-দশম শতাব্দীর বাঙ্গলা অক্ষর। এই বাঙ্গালী জনসাধারণই কাম্বোডিয়া ও শ্যামে তাঁহাদের রূপ-কথা প্রচলন করিয়াছিলেন এবং ইহাদেরই মস্‌লিনের ভুবনবিজয়ী খ্যাতি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। প্রধানতঃ ইহাদেরই প্রভাবে মগধ-সাম্রাজ্য এবং পরবর্ত্তী পাল-সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের এই বাঙ্গালা দেশে নানা জাতির মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। আর্য্য, অনার্য্য, মঙ্গোলিয়ান, দ্রাবিড়, তিব্বত-ব্রহ্ম (Tebeto-Burman) প্রভৃতি নানা জাতীয় সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই দেশের জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং তাহার ফলে এদেশের লোকের মনে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব, ধর্ম্মমতের উদারতা ও ত্যাগের আদর্শের উদ্ভব হইয়াছিল। চব্বিশজন তীর্থঙ্করের পাদচারণ-পূত

---

* শুধু সুদূর পূর্ব্বোত্তরে নহে,—রাখাল দাস বাবু বলেন—"We find the proto.Bengali scripts in the Ananta Vasudev temple inscription of Bhatta Bhardev at Bhubaneshwar and the modern Bengali alphabets in the grants of the Ganga Kings of Nrisingha Dev II and Nrisingha Dev IV. The modern cursive Oriya script was developed out of the Bengali after the 14th century A, D. like the modern Assamese."

—Rakhaldas Banerji's "Origin of the Bengali script", p. p 5—6

গঙ্গাবংশীয় নৃপতিরা মেদিনীপুরবাসী বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাঁহাদের সময় শুধু বঙ্গাক্ষর নহে, বঙ্গের শিল্পও উড়িষ্যায় অনেকাংশে প্রচলিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ 'কোণার্ক মন্দির' তথাকার বাঙ্গালা-শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। একথা আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বীকার করিয়াছেন।

এই দেশ জৈন গুরুদের নিকট অহিংসার পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল,—বৌদ্ধগণের নিকট তাহারা ত্যাগ ও নিবৃত্তির শিক্ষা পাইয়াছিল,—তাহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের নিকট দেহ-তত্ত্বের বিশ্লেষণ শিখিয়া হঠযোগের নানাপ্রকার কস্‌রৎ ও ফকিরী কেরামৎ আয়ত্ত করিয়াছিল এবং বৈষ্ণবগণের নিকট ভক্তি-বাদ ও ভগবৎ-প্রেম শিখিয়া জগৎ মাতাইয়াছিল। পালরাজগণের উৎসাহে ইহারা ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া শিল্পাচার্য্য হইয়াছিল এবং পরিশেষে মুস্‌লিম্‌-সভ্যতা ইহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া জাতিভেদ-বিরোধী উদার সমাজ-নীতি ও ব্যবহার-সাম্য শিখাইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় 'পগ্‌-সাম্‌-জন্‌-জাঙ্‌' পুস্তকে লিখিত আছে—"স্থাপত্যে ও চারুশিল্পে বাঙ্গালীর নাম সর্ব্বোচ্চ, তৎপর নেওয়ার ও তিব্বতবাসীদের ও সর্ব্বশেষ চীনাদের।"*

বঙ্গীয় জনসাধারণের অধিকাংশই কৃষক, সুতরাং জন্মভূমির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে ইহাদের নাড়ীর সম্বন্ধ। বংশ-পরম্পরায় তাহাদের কুটীর বাঙ্গালার ফুল-পল্লবে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তাহারা বহুকাল বাঙ্গালা দেশের কোমল হাওয়া ভোগ করিয়া—এদেশের বেলা, যুই, কুন্দ ও নব-মল্লিকার সুবাসের মধ্যে বাস করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার শস্য-শ্যামল মাঠের সঙ্গে তাহাদের যুগ যুগের অন্তরঙ্গতা ও প্রীতির সম্বন্ধ,—বাঙ্গালার বংশ-লতা ও বেণু-কুঞ্জ তাহাদিগকে বাঁশীর সুর-লহরীর করুণ-গীতি শিক্ষা দিয়াছে। তাহারা এই দেশের সবুজ ক্ষেত্রজাত দেব-ভোগ, রাজ-ভোগ প্রভৃতি শত প্রকারের শালি-ধান্যের অন্নে পরিতৃপ্ত হইয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে। তাহারা ব্রহ্মপুত্র, অজয়, কংশ, ধনু, ভৈরব, ভাগীরথী, পদ্মা, ধলেশ্বরী, মধুমতী, যমুনা, ফুলেশ্বরী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি মহানীরা নদীর বিশাল সিকতা-ভূমিতে ভিন্নাঞ্জন-সদৃশ মেঘপংক্তির মধ্যে—পরিদৃশ্যমান বিরাট্‌

* ঢাকা মিউজিয়মের স্থাপত্য-নিদর্শন-সম্বন্ধীয় ডাঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালীর পুস্তকের ভূমিকায় ষ্টেপলটন সাহেবের উক্তি।

আকাশের পরিবেষ্টনীর মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া—এই সমৃদ্ধ প্রকৃতির বিচিত্র পুষ্প ও বল্লরীর সংস্পর্শে কোমল ভাবুকতা ও উদার সৌন্দর্য্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালী জনসাধারণ তাঁহাদের বংশধর—যাঁহাদের দুর্দ্দান্ত সাহসিকতা ও রণ-নৈপুণ্য দেখিয়া ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগে প্রসিদ্ধ রোমক কবি ভার্জ্জিল লিখিয়াছিলেন—"গঙ্গারাঢ়ীদের আশ্চর্য্য রণনৈপুণ্যের কথা বিজয়-স্তম্ভে গজদন্তের উপর স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।"—যাঁহাদের প্রভুভক্তি ও অসম সাহস দেখিয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের কহ্লণ কবি বিস্ময়সহকারে বলিয়াছিলেন—"সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও বুঝি এরূপ যোদ্ধা সৃষ্টি করিতে পারেন না।"—যাঁহাদের দেহের গঠন, অঙ্গের নিরুপম লাবণ্য ও মুখশ্রী দেখিয়া ভারতের বড়লাট মিণ্টো বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালীদের মত সুশ্রী মূর্ত্তি তিনি জগতে আর কোথাও দেখেন নাই।"—যাঁহাদের বাঁশের লাঠি ও বাঁশী জগতে অপরাজিত এবং অলাবু-নির্ম্মিত একতারা ও কাঠের সারঙ্গের মহিমা শত কাব্যে, শত পল্লীগাথায় প্রশংসিত,—যাঁহারা ছিলেন শিল্পগুরু, শিক্ষাগুরু, কোমলতায় ব্রততী-সম, দৃঢ়তায় শাল ও বিম্বকর; জগতের সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি বাঙ্গালী কেন মাথা হেঁট করিয়া অপর দেশের দোহাই দিবে? ইহাদের অক্ষর পরিচয় না থাকিলেও ইহারা জ্ঞানগুরু। ই, বি, হ্যাভেল সাহেব লিখিয়াছেন—"এ দেশের চিত্রকরেরা যদিও পাশ্চাত্য মতে নিরক্ষর, তথাপি জগতে চিত্রকরদের মধ্যে ইহাদের স্থান সকলের উপরে।" (**"Though illiterate in the western sense, the painters are the most cultured of their class in the world"—E. B. Havell**)*। ভারতবর্ষের বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডক্টর লিব্রুস লিখিয়াছেন যে—"এদেশের দরিদ্রতম কৃষকেরাও যেরূপ সর্ব্বোচ্চ দার্শনিক

* **Introductian, XIX—Ideals of the Indian Art—E. B. Havell.**

তত্ত্বগুলি আলোচনা করিতে পারে, তাহা বিস্ময়কর।"† সুপ্রসিদ্ধ আভিধানিক হটন সাহেব এদেশের জঙ্গলে জঙ্গলে অনাদৃত ভগ্ন মস্‌জিদ্ ও মন্দিরাদি দেখিয়া লিখিয়াছেন—"ইহাদের মত যদি একটিও ইউরোপে পাওয়া যায়, তবে তাহা পাশ্চাত্য-জগতে এক একটি তীর্থের সৃষ্টি করে, কত পর্য্যটক দূর-দূরান্তর হইতে তাহা দেখিতে আসে এবং তৎসম্বন্ধে কতই না সুবৃহৎ গ্রন্থ বিরচিত হয়।§" আমরা হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালার এই জনসাধারণের বংশধর। কয়েকটি বংশ দূরাগত বলিয়া আভিজাত্যের গর্ব্ব করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা ত বহুকাল এদেশে থাকিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার ফলের বাগানে এল্‌ফান্সো, বোম্বাই প্রভৃতি নানাপ্রকারের আমের গাছ আছে; কিন্তু তাহারা এখন বোম্বাই কি অন্য কোন দেশের নহে। বাঙ্গালার জল-মাটিতে জন্মিয়া তাহারা বাঙ্গালার ফলই হইয়া গিয়াছে। বিলাতী কুমড়ার গায়ে এখন আর বিলাতের গন্ধ নাই।

বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে শোভন নহে। একশত বৎসর পূর্ব্বে এই ভাষা সম্বন্ধে একাদশটি ভারতীয় প্রাদেশিক

† "...extraordinary aptitude with which the poorest and the most illiterate peasant (India) will engage in discussion in the deepest philosophical and ethical questions."—Dr. Lefroy.

§ "The traveller may observe temples, mosques and obelisks that have scarcely cost the bloom of artificer's hands ; works that in Europe could each have been the glory of the age, its country and its projector, the fame of which would have resounded from one end of the country to the other and consecrated in elaborate descriptions, commemorative of its proportions, and its extension, its difficulties and expense. These he may view with amazement, he will be convinced that he is among the most surprising races of men that ever existed."

—J. C. Haugton's Glossary, pp. VIII & IX

ভাষায় অভিজ্ঞ ডক্টর উইলিয়ম কেরি বলিয়াছিলেন—"আমি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি যে, ভারতীয় অপরাপর সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।"* —এবং অন্যত্র—"এই ভাষা প্রায় গ্রেট্ বৃটেনের তুল্য এক বৃহৎ ভূ-ভাগে প্রচলিত এবং যথোচিত অনুশীলন হইলে স্বতঃসিদ্ধ সৌন্দর্য্যে ও সুস্পষ্টরূপভাব ব্যঞ্জনায় ইহা জগতের কোন ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে না।" ** চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এফ, এইচ্ স্ক্রাইন বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গলা ভাষা ইহার মধুরাক্ষরা শব্দসমৃদ্ধিতে ইটালিয়ান ভাষার সমকক্ষ, তৎসহ জটিল বিষয়সমূহ প্রকাশ করার পক্ষে জার্ম্মাণ ভাষার ন্যায় শক্তি বহন করে।" † কেম্ব্রিজের ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জে, ডি, এণ্ডারসন্ আই-সি-এস্ বলিয়াছেন—"আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, মনের ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি করিবার উপযোগী এবং অমর কথার বাহন স্বরূপ যে সকল শ্রেষ্ঠ ভাষা জগতে বিদ্যমান, বাঙ্গলা ভাষা তাহার অন্যতম।" ‡

যে সকল বাঙ্গালী এ ভাষার গৌরব না করিয়া বিদেশের আভিজাত্যের স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদের "সোনা ফেলি' কেবল আঁচলে গেরো সার।"

* "Convinced I am that Bengali is intrinsically superior to all other spoken Indian languages"—William Carrey By S. Pearce Carrey M. A., pp 213.

'ত্রিপুরার রাজমালা' দ্রষ্টব্য।

* * "This language current through an extent of country nearly equal to Great Bretain when properly cultivated will be inferior to none in elegance and perspecuity."

† "This language unites the maltifluousness of Italian with the power possessed by German of rendering complex ideas"—F. H. Skrine.

‡ I am quite convinced that Bengali is one of the great expressive languages of the world capable of being the vehicle of as great things as any speech of men."—J. D. Anderson.

কবি আবদুল হাকিমের ভাষায় বলা উচিত—"তাঁহারা এদেশে বাস করিবার যোগ্য নহেন।" বাঙ্গলা ভাষার প্রসার কিছুদিন পূর্ব্বেও যতটা ব্যাপক হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আলোচনা করিলে, আমাদের গৌরব অনুভব করার কথা। রাচি ও তন্নিকটবর্ত্তী পাহাড়িয়া মুণ্ডাজাতি অধ্যুষিত বিহারের প্রান্তভাগ হইতে ভাগীরথীর সমস্ত প্রত্যন্ত দেশ এবং গর্জ্জনশীলা পদ্মার দুইকুল ব্যাপিয়া ধন-ধান্যশালিনী সুবিস্তৃত ভূমি এবং উত্তরে নেপাল ও ভূটানের উপত্যকা এবং পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, আসাম, চাকমা এবং নাফ্ ও সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী আরাকান পর্য্যন্ত এক বৃহৎ জনপদবাসী এই ভাষাকে 'দেশীভাষা' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ সুভাষা বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এখন সে গৌরব-রবি নানারূপ ষড়যন্ত্রের মেঘে অস্তমিত হইতে চলিয়াছে। আসাম পাদ্রীদের চেষ্টায় কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা ত্যাগ করিয়াছে; তথাকার তদানীন্তন স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর রবার্টসন্ সাহেব বহু প্রমাণ ও যুক্তির বলে ইহার যে সমুচিত ও অকাট্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপুত হয় নাই। মণিপুর এখনও বৈষ্ণব মহাজনদের মধুর পদাবলীতে মুখরিত; সেখানেও পাদ্রীরা বঙ্গ ভাষাকে তাড়িত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাহারা আবেদন করিয়াছে যে—"মণিপুরে প্রাদেশিক ভাষাকে স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার করিয়া তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতর 'ভার্ণাকুলার' রূপে গণ্য করা হোক্।" পাদ্রীরা সাঁওতালী ভাষাকেও রোমান্ অক্ষরে প্রচলিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছে। কোন 'বহতা' বিশাল নদীতে চর পড়িলে তাহার প্রসার যেরূপ সঙ্কীর্ণ হয়, দিনে দিনে বঙ্গভাষাকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর গণ্ডিতে আবদ্ধ করিবার সেইরূপ চেষ্টা চলিতেছে। পূর্ব্ব-দেশে চট্টগ্রাম হইতে আরাকান পর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যের বিস্তার সাধন

করিতে মুসলমান লেখকগণই বিশেষরূপ যত্নশীল ছিলেন। এই দেশের সাহিত্যের উপর তাহাদের রাজকীয় শীলমোহর সুস্পষ্ট। বাঙ্গালার মুসলমানগণের মাতৃভাষার প্রতি এই অনুরাগের নিদর্শন-স্বরূপ মহতী কীর্ত্তি এখন লোপ পাইবার মধ্যে। পাদ্রীরা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্ব-প্রান্তের দেশগুলিতে যাহাতে বাঙ্গলা ভাষা আর প্রসার লাভ না করে, তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছে। আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই চেষ্টার প্রতিরোধ করা উচিত। যুগে যুগে বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গলা ভাষাকে যে অমর ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন, তাহা এখন অনেকেরই জানা নাই। আমি এই নিবন্ধে সেই ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা পাইব। ডক্টর এনামুল হক্ লিখিয়াছেন—"সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানের রাজসভায় বাঙ্গলা ভাষা যেরূপ নানাদিক্ দিয়া পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহার আপন ভূমিতে ইহা তেমন হইতে পারে নাই, প্রধানতঃ চট্টগ্রামের মুসলমান কবিদের হাতেই ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল, আরাকান রাজ-সভার মুসলমান কবিদের হাতেই বাঙ্গলা ভাষা নূতন রূপ ও নবীন প্রেরণা লাভ করে।" আপনারা 'আরাকান রাজ-সভায় বাঙ্গলা সাহিত্য' নামক ডক্টর এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহেবের উপাদেয় পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিবেন, শুধু কবিরা নহেন, মুস্লিম রাজপুরুষেরা পর্য্যন্ত এই ভাষার প্রতি কিরূপ গভীর আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আরাকান-রাজ্য ঢাকা হইতে পেগু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৬২২—৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী আশ্‌রাফ খান বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, তাঁহারই আদেশে দৌলত কাজি অতি সুললিত ছন্দে 'লোর চন্দ্রানী' নামক বাঙ্গলা কাব্য রচনা করেন। তৎপরে কবি আলাওল মুসলমান সচিব মাগন ঠাকুরের আদেশে 'পদ্মাবতী', সৈয়দ মহম্মদের আদেশে "হপ্ত পয়কর" এবং মজলিস নামক অপর এক মন্ত্রীর ইচ্ছাক্রমে

'সেকেন্দর নামা'র বঙ্গানুবাদ সঙ্কলন করেন। তাহার পরে আরও নানা মুসলমান কবি, বিশুদ্ধ ও শ্রুতি-মধুর ভাষায় বহু বাঙ্গলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বিদেশের আবহাওয়া পাইয়া আমাদের বাঙ্গলা ভাষা নবশ্রী মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যথাস্থানে আবার বঙ্গ-সাহিত্যের এই দিকটার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব এবং চট্টগ্রামের পূর্ব্ব-দিকের নিবিড় অরণ্যানী ভেদ করিয়া বাঙ্গলা ভাষা নাফ্ ও কর্ণফুলির তীর পর্য্যন্ত কি করিয়া এতটা আদৃত হইয়াছিল, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাম্প্রদায়িক কলহ এবং বাঙ্গালী জাতি

একথা অস্বীকার করা চলে না যে, এদেশে এখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পূরা মাত্রায় চলিতেছে। কিন্তু সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যাইবে, এই বিরোধের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। এই দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চিরকালই চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে জনসাধারণের আদর্শের ঐক্য ও ক্রমবহমান প্রগতির কোন গুরুতর অন্তরায় ঘটে নাই। ঋগ্বেদে আর্য্য-অনার্য্যের যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধে যে-সকল সূক্ত আছে, তাহা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, এই যুদ্ধ-বিগ্রহ মূলতঃ দুই ভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে সংঘটিত হয় নাই; ইহা দুই ধর্ম্মমতের সংঘর্ষ-সূচক। এই সকল যুদ্ধ ঠিক আর্য্য ও অনার্য্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, আর্য্য ও অনার্য্য উভয় পক্ষেই ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই কলহ যাজ্ঞিক ও যজ্ঞ-

বিরোধীদের দ্বন্দ্ব বই আর কিছুই নহে। বহু আর্য্য-কুল-সম্ভূত ব্যক্তি যজ্ঞ সমর্থন করিতেন না এবং অনেক তথাকথিত অনার্য্য-কুলের বীরগণও ইন্দ্রের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। একদিকে ত্রস্ নামক অনার্য্য-রাজা ইন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন, অপরদিকে দাস-রাজ নমুচি (অনার্য্য) যজ্ঞ বিরোধী ছিলেন এবং ইন্দ্রের সহিত অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছিলেন। আর্য্য রাজা স্বর্ণ ও চিত্ররথ যজ্ঞবিরোধী ছিলেন; বহু যুদ্ধের পর ইন্দ্র ইঁহাদিগকে বধ করেন। আর্য্য-শাখা-ভুক্ত পণি জাতি ফিনিসিয়ানদের একশ্রেণী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন; ইঁহারা ইন্দ্রের বিরোধী ছিলেন এবং যজ্ঞ মানিতেন না। ইন্দ্রের সঙ্গে ইঁহাদের বিরোধ এবং তৎসম্বন্ধে সরমা নাম্নী পণি-রমণীর দৌত্যের কাহিনী ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে।

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৈদিক সময়ে যাজ্ঞিক ও যজ্ঞবিরোধীদের মধ্যে সাংঘাতিক যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে পুনরায় হিন্দু ও জৈনদের মধ্যে বিষম কলহ হইয়া গিয়াছে। রামায়ণে কথিত আছে—মান্ধাতা একজন জৈন-শ্রমণকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন।* "হস্তিনা পাড্যমানোপি ন গচ্ছেৎ জৈনমন্দিরম্" প্রভৃতি প্রচলিত শ্লোকে এই কলহের আভাস পাওয়া যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ বিগ্রহ চরমে উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ, বৌদ্ধ-পালরাজাদের অত্যাচারে শত শত বৈদিক-ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া গুজরাট্ ও দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।† সেই যুগের ব্রাহ্মণগণ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ ও মগধাদি বৌদ্ধভাবাপন্ন স্থান বর্জ্জন করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু-সমাজে এই দেশকে একরূপ পতিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন ("অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাংশ্চ সৌরাষ্ট্র-মগধানি চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্, পুনঃ সংস্কার-

* 'রামায়ণ'

† 'বৃহৎবঙ্গ', ৭১, ৮৬, ৮৮ পৃষ্ঠা

মর্হতি।") নবম শতাব্দীতে আজমীরের রাজপুত্র সারঙ্গদেব বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায় তদীয় পিতা বিশালদেব হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ শুনাইয়া তাঁহার মতি-গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, চাঁদ কবি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বিশালদেবের উপদেশের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম 'নষ্টজ্ঞান' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ("ইহ নষ্ট-জ্ঞান শুনিয়ে ন কাণ। রামায়ণ শুনহ ভারত নিদান॥") কথিত আছে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের আদেশ ছিল—সেতুবন্ধ হইতে হিমগিরি পর্য্যন্ত যত বৌদ্ধ আছে—বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে হত্যা করিবে, যে না করিবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইবে। অষ্টম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট 'বৌদ্ধ মাত্রই বধ্য' এই মত প্রচার করেন; কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দুদের যে কি ভীষণ আক্রোশ ছিল, তাহা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে। মাতুরার রাজা অষ্টম শতাব্দীতে কবি ও সাধু সম্বন্দরের সম্মতিক্রমে আট হাজার গোঁড়া জৈন পণ্ডিতকে শূলে চড়াইয়াছিলেন ("Eight thousand of the stuborn Jains with Sambandar's consent were impaled alive," —'Hymns of the Tamil Saivite saints.' by—F. Kingsbury.) 'শঙ্কর-বিজয়ে' উল্লিখিত আছে—রাজা সুধন্বা অসংখ্য জৈন ও বৌদ্ধ পণ্ডিতের মস্তক উলুখলে নিক্ষেপ করিয়া ঘোটনদণ্ডে নিষ্পেষণ পূর্ব্বক তাহাদের দুষ্টমত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে গাড়োয়ালের হিন্দু-রাজা—তিব্বত রাজা লাঃলামা ইয়োসী-হোতকে বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করাইবার চেষ্টায় তাঁহাকে যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস প্রণীত "Indian Pandits in the Land of Snow" নামক পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া হিন্দুরা যেভাবে বৌদ্ধ-ইতিহাস লোপ করিয়াছিলেন, তাহা অকথ্য অত্যাচার-লাঞ্ছিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়

লিখিয়াছেন—"বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলি জনসাধারণের ভাষা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। যে জনপদে (পূর্ব্ববঙ্গে) এক কোটির অধিক বৌদ্ধ এবং ১১৫০০ ভিক্ষু বাস করিত সেখানে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় পাওয়া যায় নাই। যে পূর্ব্ব-ভারত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল, তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও য়ুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় অধুনা আবিষ্কার করিতে হইয়াছে।" (Discoveries of Living Buddhism in Bengal, p. I.) এদিকে শত শত ডোমাচার্য্য ও হাড়ি জাতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধশ্রমণকে হিন্দুরা চূড়ান্ত শাস্তি দিয়া সমাজের অতি অধস্তন স্থানে নিপাতিত করিয়াছেন। মহত্তর বৃত্তিপ্রাপ্ত মেথরেরাও হয়ত বৌদ্ধশ্রমণ ছিল। হিন্দুসমাজে চণ্ডাল-দের যে কাজ, তাহাই বৌদ্ধ তান্ত্রিকের জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকিবে। কোন স্মৃতি বা শাস্ত্রানুশাসনে মেথর ও ডোম-হাড়ির নাম নাই; ইহারা তান্ত্রিক ছিলেন এবং মলমূত্র ও মৃতদেহ লইয়া নানারূপ বীভৎস সাধনা করিতেন, তজ্জন্যই হয়ত এই শাস্তি। অথচ এককালে যে ইহারা বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। হাড়ি-সিদ্ধা—গোপীচন্দ্র রাজার গুরু ছিলেন এবং এখনও ডোমেরা হারিতী দেবীর (শীতলা) পূজক এবং এখনও কোন কোন স্থানে ডোম ও হাড়িরা কালী-পূজার পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ দোঁহা ও গানে ডোমাচার্য্যদের প্রাধান্যের প্রমাণ আছে। ইহা ছাড়া হিন্দুরা বৌদ্ধ-কীর্ত্তি একেবারে লোপ করিবার জন্য যেখানে যেখানে তাঁহাদের প্রাচীন কীর্ত্তি ছিল, তাহা মহাভারতোক্ত পঞ্চ-পাণ্ডব অথবা আর কোন হিন্দু রাজ-রাজড়ার সম্পর্কিত এইরূপ পরি-কল্পনার দ্বারা বৌদ্ধাধিকারের চিহ্নমাত্র লোপ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এখনও অনেক মন্দিরে বুদ্ধ-বিগ্রহ বিষ্ণু-মূর্ত্তিরূপে পূজিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই—এক স্থানে বুদ্ধ বিগ্রহকে পুরোহিতেরা কালী বলিয়া

প্রচার করিতেছেন। কাশীতে অক্ষয়-বটের নীচে সমাসীন বুদ্ধমূর্ত্তিকে তিল ভাণ্ডেশ্বরের পাণ্ডারা 'জটাশঙ্কর' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। হিন্দুরা বৌদ্ধাধিকারের সমস্ত চিহ্ন ইতিহাস হইতে লুপ্ত করিয়াছিলেন। এমন কি, আমরা অশোক ও বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্করের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

এই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আমরা যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লক্ষ্য করিতেছি, তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। বৈদিক যুগের যুদ্ধাদি এবং পরবর্ত্তী যুগে হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সঙ্গে তুলনা করিলে, এখনকার এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা ষট্‌প্রকোষ্ঠ রাইফেলের গুলির কাছে পট্‌কার আগুনের মত নগণ্য।

কিন্তু এই সকল সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন শান্তির অন্তরায় হয় নাই। যিনি ধীরভাবে ভারতের এই বিশাল জনসাধারণের প্রতি লক্ষ্য করিবেন, তিনি এই অত্যদ্ভুত জনতার গতিবিধি ও আবর্ত্তন লীলা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। সমুদ্রের উপকূলের সিকতা-ভূমি হইতে যদি কেহ সেই অপরিমেয় জলরাশির প্রতি লক্ষ্য করেন, তবে তিনি কি দেখিতে পান? বারিধির উপরিভাগ কখনও উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল, বায়ুবিক্ষুব্ধ, বিরাট্ ও ভয়াবহ,—কখনও বা ঘুমন্ত-সিংহের ন্যায় প্রশান্ত,—যে কেশররাজি এক সময়ে দুর্জ্জয় ক্রোধে স্ফীত হইয়া ভয়াবহ হইয়াছিল তাহা সন্ন্যাসীর জটাজূটের ন্যায় নিরীহ, সেই মুহূর্ত্তে বিক্ষুব্ধ এবং মুহূর্ত্তে সুপ্ত সিংহের ন্যায়ই বিরাট্ সমুদ্র মুহুর্মুহুঃ আকৃতি পরিবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু বাহিরের এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল রূপ ভিতরের প্রকৃত সংবাদ দেয় না, অত্যন্ত বিক্ষোভের সময়ও সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করে না। তাহার অপ্রমেয় জলরাশি বেলাভূমি অতিক্রম না করিয়া সমভাবে তাহার অপার ঐশ্বর্য্য যুগ যুগ ধরিয়া বহন করিয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষের জনসাধারণেরও সেই এক রূপ,—এই জনসাধারণের কোন ক্ষোভ নাই, চাঞ্চল্য নাই, ইহার চিরধ্যানস্থ মূর্ত্তি ঐতিহাসিকের চক্ষে পরম বিস্ময়কর। একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছিলেন যে—"যখন পলাশীর যুদ্ধ হইতেছিল, তখন কয়েক ক্রোশ দূরে চাষা নিরুপদ্রবে তাহার লাঙ্গল লইয়া ক্ষেত চষিতেছিল এবং দূর গ্রামের ব্রাহ্মণ শিবলিঙ্গের উপর চক্ষু মুদিয়া বিল্বপত্রসহ জল ঢালিতেছিল।" এসকল কথায় কিছু অতিরঞ্জন আছে কিনা জানি না। কিন্তু ভারতীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভারত ইতিহাসের খুব বড় কথা নহে।

বাঙ্গালার জনসাধারণ বলিতে কাহাদিগকে বুঝিতে হইবে? ইঁহারা জৈন নহেন, বৌদ্ধ নহেন, খৃষ্টান নহেন, হিন্দু নহেন, মুসলমান নহেন—ইঁহারা বাঙ্গালী। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কত কীর্ত্তি, বাঙ্গালা ও বাঙ্গালার বাহিরে ছাইয়া আছে; তাহার উত্তরাধিকারী সমস্ত বাঙ্গালী জাতি, প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান। যাঁহারা জগজ্জয়ী 'মস্‌লিন' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,—যাহা কেহ কেহ 'বুনট্ করা বাতাসের জাল', 'চলন্ত নদীর স্রোতঃ', 'পরীর স্বপ্ন', 'সাঁঝের নীহার', 'অপ্সরা লীলা' প্রভৃতি নামকরণে পরিচিত করিয়াছেন, যাহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও জগতের বিস্ময়। সেই 'মস্‌লিনই' আমাদের পরিচয়। আমাদের পরিচয় বাঙ্গালার রেশম-শিল্প—কৌষেয় বস্ত্র যাহা এত মহার্ঘ ছিল যে, রোম-সম্রাট্ আরিলিয়ানের পত্নী স্বীয় অঙ্গরক্ষার জন্য কিছু কৌষেয় বস্ত্র চাহিলে, তাহা দুর্ম্মূল্য বলিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে তাহা দিতে পারেন নাই এবং খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট্ হেলিওগেবলস্ এই বস্ত্র ব্যবহার করাতে অপরিমিত ব্যয়শীলতার জন্য তাঁহার মন্ত্রী-সভা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। এই জগজ্জয়ী বস্ত্র শিল্পীরা নির্ব্বংশ হইয়া যায় নাই। এখনও ঢাকার সম্ভ্রান্ত রমণীরা বস্ত্রের উপর অতি সূক্ষ্ম জড়াও কারুকার্য্য করিয়া থাকেন। তাহা কি বংশানুক্রমিক নৈপুণ্যের পরিচায়ক

নহে? মুসলমান মহিলাদেরই এ বিষয়ে কৃতিত্ব সমধিক। যাহারা সপ্তগ্রাম, তমলুক ও চাটিগাঁর বন্দরে বিরাট্ অর্ণবযান নির্ম্মাণপূর্ব্বক উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল বঙ্গোপসাগর ও ভারত-মহাসাগরে যাতায়াত করিতেন এবং যাভায় ১২৭ গ্যালারীতে সন্নিবদ্ধ, কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তর-মূর্ত্তিসহ বরোবদোরের বিশাল পঞ্চতল মন্দির নির্ম্মাণের সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই শিল্পীরা যে বাঙ্গালীদের নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছিল, তাহা পাহাড়পুরে সোম-বিহারের আবিষ্কারের পর নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহাদের বংশধরগণ কি এখনও চট্টগ্রামের সমুদ্রগামী জাহাজের নির্ম্মাতা এবং সারেঙ্ ও খালাসি হইয়া চিরাচরিত ব্যবসায়-ধারা কথঞ্চিৎ বজায় রাখিতেছেন না? হিন্দুরা সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করার পর পক্ষশূন্য জটায়ুর মত নাবিকগণ ইস্‌লাম পরিগ্রহ করিয়া তাহাদের ব্যবসায় বজায় রাখিয়াছে। এখনও চট্টগ্রামের বন্দরে তাহারা 'গোধু', 'সারেঙ্গ', আধুনিক 'শ্লপ্', 'বালাম', 'সাম্পান', 'কেঁদো' প্রভৃতি বিবিধপ্রকারের ক্ষুদ্র-বৃহৎ অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। চৈনিক-পর্য্যটক মহিন্দ লিখিয়াছেন—"চট্টগ্রামের বালামীরা একসময়ে তুরস্কের সুলতান কর্ত্তৃক আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দরের জাহাজ নিৰ্ম্মাণে নিযুক্ত হইত। যে-সকল ভাস্কর ও চিত্রকর একদা অজন্তা, খজুরাহ, প্রম্বনম, ব্যাঙ্কক প্রভৃতি স্থানে চরম সফলতা লাভ করিয়াছিল, বঙ্গের প্রাচীন ভাস্কর্য্যে ও চিত্রকলায় সেই সকল দেশের সঙ্গে শিল্পরীতির আশ্চর্য্য ঐক্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইতেছে। বাঙ্গালার গৃহে গৃহে কিছু দিন পূর্ব্বেও রমণীরা যে অসামান্য ধৈর্য্য ও দক্ষতাসহ কাশ্মীরী-শাল-নিন্দিত কারুকার্য্যের দ্বারা কন্থা প্রস্তুত করিতেন, তাহাতে ভারতীয় শিল্পীর অতি-প্রাচীনধারাটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে। ইহা কি আমাদের সুচিরাগত গৌরবের নিদর্শন নহে? মুকুল দে প্রভৃতি এখনকার অনেক শিল্পীর মতে অজন্তা গুহার চিত্র-নির্ম্মাণে বাঙ্গালী চিত্রকরদের হস্তচিহ্ন সুস্পষ্ট। ইহাদের

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আমাদের পরিচয় বাঙ্গালীর শৌর্য্য, বীর্য্য এবং অগাধ আত্মত্যাগের কাহিনী, যাহা ইতিহাস-পূর্ব্বযুগে ভর্জ্জিল উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং অনেক পরে কাশ্মীরের কবি কহ্লন অত্যুক্তি দ্বারা সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। আমাদের পরিচয়—বাঙ্গালার বাউল ও সহজিয়া মত, যাহা শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে ভূমাকে লক্ষ্য করিয়াছিল এবং যাহাতে এদেশের বর্ণাশ্রমের ভিত্ত ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের পরিচয়—বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম, যাহা এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশকে মাতাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের পরিচয়—বাঙ্গালার পল্লীগীতি, যাহা আধুনিক হিন্দু-মুসলমানের পূর্ব্ব-পুরুষদের সৃষ্টি। সেই গীতি কিরূপ উচ্চ ভাবুকতা ও কবিত্বব্যাঞ্জক, তাহা পরে দেখাইব।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে-সম্প্রদায়ভুক্তই থাকুন না কেন, ইঁহারা এক বৃহৎ পরিবারভুক্ত, সেই পরিবারের নাম—বাঙ্গালী। ইঁহারা এক এবং ভিন্ন ভিন্ন নহেন। বাহ্য-দৃষ্টিতে হিন্দু, মুসলমান, দেশীয় খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি নামে এদেশবাসী শতধা-খণ্ডিত; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ইঁহাদের একই আদর্শ, একই অনুপ্রাণনা এবং একই বৈশিষ্ট্য। এখানে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম্মের বিভিন্নতা, শ্রেণীভেদ এসকল কোন প্রশ্নই তোলা সমীচীন নহে—আমাদের যে জাতিত্ব অচ্ছেদ্য এবং যাহা আদিযুগ হইতে আমাদের শোণিত প্রবাহে বিদ্যমান, তাহাই আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার পরম সাক্ষী। সাম্প্রদায়িক যতপ্রকার বৈষম্যই থাকুক না কেন, বাঙ্গালার জনসাধারণের একনাম জানি,—ইঁহারা বাঙ্গালী এবং এই নামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আমি আমার জাতিকে পুনঃ পুনঃ আন্তরিক প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি। সাম্প্রদায়িক ঝগড়া-বিবাদ ও রক্তারক্তি চিরকাল হইয়া আসিয়াছে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ আমি দিয়াছি, তথাপি বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর জ্ঞাতিত্ব লোপ পায় নাই।

কালের আবর্ত্তনে শত শত ব্রাহ্মণ—বৌদ্ধ-শ্রমণ হইয়া গিয়াছেন, কিংবা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অহরহঃ হিন্দুগণ মুসলমান অথবা খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে। যাঁহাদের পিতৃপিতামহ মন্দিরের দ্বার আগলাইয়া বিগ্রহ রক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশের দুলালেরা ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া সেই পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, বংশ-পরম্পরা-পূজিত দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। অনাদিকাল হইতে এদেশের জনসাধারণের মূলতঃ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভাস্কর ও স্থপতি বাটালী-হস্তে যে তপস্যা করিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষে কখনও 'তাজমহল'-এর সৃষ্টি হইয়াছে, কখনও বা কোণার্কের অতুলনীয় মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। ভক্ত তাহার নৃত্য-গীত, অনিদ্রা, উপবাস ও তপস্যার দ্বারা যে সুধা-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছে,—যুগযুগান্তরের সেই সাধনা হিন্দু-মুসলমান করিয়া আসিয়াছে। কত কুরুক্ষেত্র, কত হল্‌দিঘাট, কত পাণিপথ ও পলাশীতে কামান-নিনাদে, অসির ঝনৎকারে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের এই তাপস-মূর্ত্তি বদলায় নাই। এদেশের বৈশিষ্ট্য এই, ইহারা নিবৃত্তিমুখী; অপরাপর বহুদেশ ভোগমুখী। এদেশে আজ যে রাজা, কাল সে রাজদণ্ড ছাড়িয়া ফকিরের কন্থা লইয়াছে, আজ যে দুর্জ্জয় বীর, কাল সে পীরের দরগা বা মন্দিরের দীনতম সেবক; এদেশের প্রকৃত রাজা ফকির ও সাধু। বাহিরে আজ যে হিন্দু, কাল সে মুসলমান,—তাহার বংশধরেরা পরে হয়ত বৈষ্ণব বা খৃষ্টান। এই স্বাধীন চিন্তার যুগে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানবংশীয় লোকদের কেহ কেহ পুনশ্চ চার্ব্বাকের মতাবলম্বী হইবে কিনা কে বলিতে পারে? যুগে যুগে ধর্ম্ম-মত, সাম্প্রদায়িক-স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন দিকে পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক পরিচয় আমাদের প্রকৃত পরিচয় নহে, কিন্তু আমরা আদিকাল হইতে যে বাঙ্গালী, সেই বাঙ্গালী আছি এবং এই

দেশ যে-পর্য্যন্ত পম্পিয়াই নগরের ন্যায় রসাতলে না যাইবে, ততদিন এই কিঞ্চিন্‌ন্যূন দশ কোটী লোক বাঙ্গালীই থাকিবে। এই মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান মিশিয়া গিয়াছে।

আপনারা আমার উপরে বিরক্ত হইবেন না। আমার পরবর্ত্তী বক্তৃতায় আশা করি প্রমাণ করিতে পারিব, হিন্দু ও মুসলমান-কৃত বঙ্গ-সাহিত্যে এই এক জাতীয়ত্ব এত স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, সে সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুস্‌লিম-বিজয়ের প্রাক্‌কালে

খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রচ্ছদপটে এক মস্তবড় সাধুর মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাই—ইনি গোরক্ষনাথ। ইহার বাড়ী পাঞ্জাবে (জলন্ধর) ছিল ; কিন্তু ইহার গুরু মীননাথ বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। এইজন্য গোরক্ষনাথের বহু শিষ্য উত্তর-পশ্চিমে, এমন কি দাক্ষিণাত্যে থাকিলেও, ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মক্ষেত্র ছিল বাঙ্গালা। ইনি হঠযোগী ছিলেন এবং ইহার জীবন-চরিত 'গোরক্ষ-বিজয়'-এ ইহার অনেক অলৌকিক লীলা বর্ণিত আছে। ইনি চিরকুমার ও চিত্ত-সংযমী ছিলেন। এমন কি কথিত আছে, ভগবতী স্বয়ং নানারূপ প্রলোভন দ্বারাও ইহাকে টলাইতে পারেন নাই। শিশুর মত সরল, অথচ বীরের মত দৃঢ় এই গোরক্ষনাথের গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। মীননাথ যখন স্ত্রীলোকের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া অধঃপতনের সীমান্ত-গহ্বরে পতিত হন, তখন গুরুর এই অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া গোরক্ষনাথ তাঁহার উদ্ধারার্থ

অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। এই বঙ্গদেশে এখন যেমন বৈষ্ণব ভিখারীরা 'জয় চৈতন্য' হাঁক ছাড়িয়া ভিক্ষা করে, পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নাথ-যোগীরা গোরক্ষনাথের নাম লইয়া সেইরূপভাবে ভিক্ষা করিতেন।

"গোরখ জাগাই, শিঙ্গা ধ্বনি শুনইতে জটিলা ভিক্ আনি দিল।
মৌনী যোগীশ্বর মাথা হিলায়ত বুঝিলু ভিক্ নাহি নেল"*

মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, কপটিনাথ ও বিন্দুনাথ এবং ৮৪ সিদ্ধাকে লইয়া যে বৃহৎ নাথ-পরিবার গঠিত হইয়াছিল, ইঁহারাই উত্তর-কালে'নাথ-গুরু'নামে বাঙ্গালার জনসাধারণের উপর অখণ্ড অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। 'গোরক্ষ-বিজয়' বহু পূর্ব্বে বাঙ্গলায় লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফয়জুল্লাহ্ ও ভবাণী দাস ইহার যে পরিবর্ত্তিত সংস্করণ প্রকাশ করেন তাহাই'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্' হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 'গোরক্ষ-বিজয়'-এ শিবের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলেও ইহার অস্থিপঞ্জর বৌদ্ধ-তন্ত্র।

এই সঙ্গে রামাই পণ্ডিত ও ময়ূর ভট্টের নামও উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা বাঙ্গালা দেশে প্রচার করিতেছিলেন। নানা শ্রেণীর সহজিয়া মত ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া এদেশে পুষ্ট হইতেছিল। এই সহজিয়াদের আদি বহু প্রাচীন, খৃষ্ট জন্মিবার তিনশত বৎসর পূর্ব্বেও সহজিয়ারা বিদ্যমান ছিলেন। পালি 'কথা-বথু' নামক পুস্তকে তাহার আভাস আছে। এক শ্রেণীর বৌদ্ধ 'একাভিপ্রায়ী' নামে নিজদিগকে পরিচয় দিয়া স্ত্রী-পুরুষে গোপনে ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিত। ইহারাই কিশোরী-ভজন প্রভৃতি সহজিয়াদের পদ্ধতির সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা লাঃলামা ইয়সি হোত সম্ভবতঃ এই দলের ব্যাভিচারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা নীল আলখাল্লা পরিধান

* গোবিন্দ দাসের পদ দ্রষ্টব্য

পূর্ব্বক ধর্ম্মের নামে অবাধ স্ত্রী-পুরুষের মিলন প্রচার করিত। এই দলের প্রভাবে ভীত হইয়া তিব্বত-রাজ বঙ্গদেশ হইতে দীপঙ্করকে আনাইবার জন্ত প্রাণপাত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশ ও উড়িষ্যা উত্তরকালে এই সহজিয়াদের হাতে যাইয়া পড়িয়াছিল। সহজিয়ামত উপেক্ষণীয় নহে। ইহাদের অন্যতম শাখা—বাউল ও কর্ত্তাভজাদের মতের উচ্চতা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। বাউলেরা যদিও চৈতন্যের নাম কীর্ত্তন করে, কিন্তু তাহারা চৈতন্যের বিগ্রহ স্বীকার করে না। এক বাউলকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—'তোমার বাড়ীতে কি চৈতন্য-বিগ্রহ স্থাপিত নাই?' উত্তরে সে বলিয়াছিল—'চৈতন্য যে শূন্য-মূর্ত্তি তাহার আবার বিগ্রহ কি?' এই কথা মহাযান বৌদ্ধদের 'ধ্যায়েৎ শূন্য মূর্ত্তিম্' শ্লোকের প্রতিধ্বনির মত শোনায়। নবম শতাব্দীতে আচার্য্য বোধিধর্ম্মের শিষ্য বৌদ্ধ-শ্রমণ লোসি তিব্বতে যাইয়া বিগ্রহ-পূজার বিরুদ্ধে মত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"পিতল বা কাঁসার বুদ্ধ আগুনে গলিয়া যায়, কাঠের বুদ্ধ আগুনে দগ্ধ হয়, মাটীর বুদ্ধ জলে পড়িলে মিলিয়া যায়। যে নিজকে পরিত্রাণ করিতে পারে না, সে আমাকে পরিত্রান করিবে কিরূপে? ঐ যে আকাশচুম্বী পর্ব্বত, ঐ দূরগামিনী নদী, এই অদ্ভুত জগৎ এ সমস্ত কি তাঁহার বিগ্রহ নয়? কেন তুলি, ছাঁচ ও রং লইয়া বৃথা প্রয়াস পাইতেছ?"*

কর্ত্তাভজাদের মতও খুবই উচ্চ; স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম্মালোচনাকালে তাহারা অবাধ-মিলন প্রচার করিলেও তাহাদের নীতিসূক্ত এই :—

"স্ত্রী-হিজ্‌রে, পুরুষ-খোজা, তবে হবি কর্ত্তাভজা।"

এই সব সহজিয়া সম্প্রদায় বাঙ্গালায় উত্তরকালে রাম-বল্লভী, কর্ত্তাভজা, খুসী-বিশ্বাসী, দরবেশী, সাহেব-ধ্বনি, বলরামী, পাঁচু-ফকিরী প্রভৃতি নানা

* 'Indiau Pundits in the Law of snow.' P. 44.

শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে আড্ডা স্থাপন করিয়া আছে। ইহাদের গুরুরা কেহ অতি নিম্ন শ্রেণীর, যথা—বলরামী। বলরাম স্বয়ং হাড়িকুল-সম্ভূত ছিলেন। 'খুসী-বিশ্বাসী দল'-এর নেতা খুসী-বিশ্বাস মুসলমান ছিলেন। কিন্তু এই গুরুদের প্রতিপত্তি অসাধারণ। সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান এই দলে আছে। তাহাদের অনেকে ব্রাহ্মণ। কোন কোন দলে হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া গো-মাংস ভক্ষণ করে। কোন কোন দলে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ নাই। কোন কোন দল এখন বৈষ্ণব-মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা তাহাদের মণ্ডলীর জাতিভেদ আদৌ মানে না। তাহারা যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহা সাঙ্কেতিক; তাহাদের গণ্ডীর বাহিরে উহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই ভাষার নাম দিয়াছেন 'সন্ধ্যা ভাষা'। এই জাতিভেদ-প্রতিবাদিগণের আদি কথাও আমরা বহুপূর্ব্বে প্রায় বৌদ্ধের সমকালে বৌদ্ধ-শাস্ত্রে পাইয়াছি। সেই সময়ের একখানি বৌদ্ধ-পুস্তকের একটা গল্প এইরূপ:—তিশঙ্কুর নামে এক চণ্ডাল তাহার পুত্র শার্দ্দূলকর্ণকে লইয়া আর্য্যাবর্ত্তের কোন স্থানে বাস করিত। এই পুত্র বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে কৃত-বিদ্য ছিল, চণ্ডাল উৎসাহিত হইয়া তাহার পুত্রের সঙ্গে একটি ব্রাহ্মণ কন্যার প্রস্তাব করে. উক্ত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে—চণ্ডাল তাহাকে এই কথা বলে:—

"সোনাতে আর ছাইতে খুব একটা প্রভেদ আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণে আর অপর জাতীয় লোকের মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য নাই। কাঠে কাঠে ঘষিলে আগুন জন্মে, ব্রাহ্মণ তেমন কোন কাণ্ড হইতে জন্মে না। তাহারা আকাশ হইতে পড়ে না, ভুঁই ফুড়িয়া উঠে না, ঠিক চণ্ডালের মতই ব্রাহ্মণ মায়ের পেট হইতে পড়ে। যখন মরে, তখন অন্য জাতির মতই তাহার শব অশুচি হয়। ব্রাহ্মণ মাংস খাওয়ার লোভে ভয়ানক নিষ্ঠুর যজ্ঞ করে। তাহারা বলে—'ছাগল-আদি পশুকে মন্ত্রদ্বারা পবিত্র করিয়া যজ্ঞে বধ করিলে

তাহারা স্বর্গে যায়।' যদি স্বর্গে যাওয়ার পথ ইহাই হয়, তবে কেন তাহারা তাহাদের বাপ, মা, ভগিনীদিগকে সেই উত্তম পথে—স্বর্গে পাঠাইয়া দেয় না? সমস্ত মানুষের পা, উরু, নখ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গগুলি এক রকম, কোনও কিছুতে একটুও প্রভেদ নাই। সেজন্য চারটা আলাদা আলাদা শ্রেণী থাকিতে পারে না। ছেলেরা পথে খেলিতে খেলিতে খানিকটা ধূলা জড়ো করিয়া রাখিয়া বলে—'এই রহিল জল, এই দুধ, এই দই, এই মাংস, এই ঘি ইত্যাদি।' কিন্তু তাই বলিয়া ধূলারাশি এই সকল জিনিষের কোন একটা হয় না। তেমনই ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কতগুলি নাম মাত্র। তাহারা বিভিন্ন জিনিষ নহে। জন্তুদের মধ্যে গরু, ঘোড়া প্রভৃতির আকৃতি-গত প্রভেদ আছে, সেই জন্য গরু একটা জাতি, ঘোড়া একটা জাতি এবং আর, আর জন্তু আর আর জাতি। তেমনই আম, জাম, খেজুর বিভিন্ন জাতের, কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে আকারের তেমন কোন পার্থক্য না থাকায় উহারা ভিন্ন জাতের হইতে পারে না।"*

ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, নাথধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্মেরই পরবর্ত্তী সংস্করণ, কিন্তু ধর্ম্ম-পূজকগণ বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়ের মতের মিশ্রণে উৎপন্ন। সহজিয়ারা অবশ্য বৌদ্ধ-তন্ত্র আশ্রয় করিয়া প্রাচীন 'একাভিপ্রায়ী' দলের রীতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। শেষকালে ইহারা সকলেই হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃহৎ সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথ-পন্থীদের মত এবং ধর্ম্মঠাকুরের পূজক রামাই-পণ্ডিতের পদ্ধতির অনেক বিষয়ে মিল আছে। কারণ ইহাদের সকলেই সেই ভূ-পতিত বৌদ্ধ-তরুর পুনরায় সমুদ্ভূত অঙ্কুর-সদৃশ। সুতরাং ইহাদের মধ্যে একটা জ্ঞাতিত্ব থাকিবেই। সহজিয়াদিগকে শেষে

---

* রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, 'হরিজন পত্রিকা' ১৩৪০ সালের ২৯শে ভাদ্রের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় উদ্ধৃত।

বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাথ-পন্থী এবং ধর্ম্ম-ঠাকুরের অপরাপর পূজকদল উচ্চ হিন্দু-সমাজের গণ্ডির বাহিরে ও অনাচরনীয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ধর্ম্মঠাকুরই বিকৃত বুদ্ধের রূপ। ইনি মন্দিরে মন্দিরে কচ্ছপরূপে পূজা পাইতেছেন। বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণ সাধারণতঃ এই ধর্ম্মঠাকুরেরই অনুগামী ছিল। এখনও এদেশের বহু পল্লীতে 'ধর্ম্ম-থান' (স্থান) দৃষ্ট হয়। সেই সকল স্থান বা মন্দিরের সেবায়েত ডোম ও হাড়ি জাতীয় এবং এইসব স্থানের সংলগ্ন 'জিওস' (পুকুর) সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এই সকল পুকুরের জলে নাকি একসময়ে মৃতদেহে প্রাণ আসিত এবং সর্ব্বরোগের শান্তি হইত। বৌদ্ধ হঠ্‌যোগীরা এইসব আশ্রমে তপস্যা করিতেন এবং নানারূপ অলৌকিক কেরামত দেখাইতেন।

সেনদের রাজত্বকালে কণৌজিয়া ঠাকুরেরা এদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের প্রভাবে বঙ্গের এই বৃহৎ জনসাধারণের সঙ্গে উচ্চ-হিন্দুসমাজের নাড়ীচ্ছেদ হইয়া যায়। সহজিয়াদের মতের উদারতা এক এক সময়ে আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এক বৈষ্ণব সহজিয়া তাহার শিষ্যকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং সে যে-সকল উত্তর দিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে—তাহাদের বৈষ্ণব-রূপে পরিচয় দেওয়া একটা ভান মাত্র, তাহারা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ। সেই প্রশ্ন ও উত্তরের মর্ম্ম সংক্ষেপে এখানে দেওয়া গেল—

শিষ্যকে গুরুর প্রশ্ন :—"তুমি কি কৃষ্ণের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছ ?"

শিষ্য—"না"

গুরু—"তবে তিনি তোমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলে তাঁহাকে কি করিয়া কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া জানিতে পারিলে এবং কিরূপে তাঁহার মূর্ত্তি গড়িলে ? তুমি যে শুনিয়াছ, কৃষ্ণ নব-মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, জন্মান্ধ তাহা কিরূপ করিয়া

বর্ণনা করিবে? তাহার কাছে কৃষ্ণের-রূপ মিথ্যা এবং তুমিও যখন চক্ষুদিয়া তাঁহাকে দেখ নাই, কর্ণদ্বারা তাঁহার বাক্য শোন নাই, ত্বক্ দ্বারা তাঁহার স্পর্শ অনুভব কর নাই, তখন তোমার নিকটও কৃষ্ণ-রূপ মিথ্যা।"

শিষ্য—"এখন আমি বুঝিতেছি, কৃষ্ণ-রূপ আমার নিকট মিথ্যা।"

গুরু—"মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণেরা শৈশব হইতে লোকদিগকে নানা সংস্কারের জালে আবদ্ধ করে। এই সংস্কারের জন্য তাহারা উপবীত গ্রহণ করে, যজ্ঞাদি করিয়া পশু বিনষ্ট করে এবং নানারূপ মিথ্যা উপায় অবলম্বন করিয়া স্বর্গে যাইবার প্রত্যাশা করে। তাহাদের বেদ মিথ্যা, শাস্ত্র এবং তাহাদের বর্ণিত দেবতা মিথ্যা, তাহারা নিজের মনের দ্বারা অনুভব করে নাই, জন্ম বধির যেরূপ পিতামাতার নাম উচ্চারণ করিতে পারে না, জন্মান্ধ সেরূপ কোন কল্পনা করিতে পারে না। সেইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান-ব্যতিরেকে কেহ ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।"

শিষ্য—"আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, বেদ, যাগযজ্ঞ, কৃষ্ণপূজা সব মিথ্যা।"*

'শূন্যপুরাণে' ধর্ম্মঠাকুরের পূজকেরা আপনাদিগকে 'সদ্ধর্ম্মী' নামে পরিচয় দিয়াছে। এই 'সদ্ধর্ম্মী' অর্থে—বৌদ্ধ। যদিও 'শূন্যপুরাণ' বহু পুরাতন পুস্তক, তবুও বর্ত্তমানে ইহার যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত 'নিরঞ্জনের রুষ্যা' নামে একটি অধ্যায় সংযুক্ত আছে। ইহাতে লিখিত আছে,—"মালদহে ও হুগলী জেলার যাজ্পুর নামক এক গ্রামে সদ্ধর্ম্মীরা ষোলশত ঘর বৈদিক ব্রাহ্মণের দ্বারা ভীষণরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিল; তাহাতে তাহাদের 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' প্রার্থনায় নিরঞ্জন তাঁহার দলবলসহ অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন। সেন-রাজত্বকালে এদেশের বিপুল বৌদ্ধ-জনসাধারণকে

* 'জ্ঞানাদি সাধনা।'

রাজারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগকে অত্যাচার পূর্ব্বক বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিলেন।" 'শূন্যপুরাণে' আরও লিখিত আছে—"বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা—যেখানে যেখানে সদ্ধর্ম্মী, সেখানে সেখানে তাহাদের নিকট সাধ্যাতীত অর্থ প্রার্থনা করিতেন এবং অশক্তদিগের বাড়ী-ঘর পোড়াইয়া নানারূপ নিষ্ঠুর উৎপীড়ন দ্বারা এদেশে তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া ছিলেন। তাহাদের করুণ ক্রন্দনে বিচলিত নিরঞ্জনের আসন টলিয়াছিল।" প্রার্থনাটির আংশিক নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"বলিষ্ঠ হৈল বড় দশ বিশ হৈয়া জড়
সদ্ধর্ম্মীরে করয়ে বিনাশ ॥
বেদ করে উচ্চারণ বাইর হয় অগ্নি ঘন ঘন
দেখিয়া সবাই কম্পমান।
মনেতে পাই মর্ম্ম সবে বলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ ॥
এইরূপে দ্বিজগণ, করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হৈল অবিচার ॥"

এই উৎপীড়িত সদ্ধর্ম্ম ও নাথপন্থীদের ধর্ম্মমত ও সুফীদিগের মত অনেকটা এক প্রকার। ইহাদের সাদৃশ্যের কারণ এই যে, সুফী এবং নাথপন্থীদের মত উভয়ই মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুফীরা মুসলমান হইলেও তাহাদের পদ্ধতি অনেকটা বৌদ্ধ মতানুযায়ী, বহু পণ্ডিত ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। সেন-রাজগণের কোপানলে দগ্ধ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে নাথপন্থীরা ইস্‌লামের আশ্রয় লইয়া জুড়াইয়াছিল। ইস্‌লাম সেখানে উগ্রভাবে ধর্ম্মপ্রচার করে নাই। পূর্ব্ববঙ্গের বৌদ্ধ জন-সাধারণ সমধিক পরিমাণে সংখ্যায় গরিষ্ঠ ছিল। গোঁড়া হিন্দু সমাজের উৎপীড়নে ইহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইস্‌লামের আশ্রয় গ্রহণ

করে। এই জন্যই পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানেরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। নতুবা পশ্চিম বঙ্গবাসীরা প্রায় একশত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও মুসলমান-শাসনাধীনে থাকিয়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, অথচ পুর্ব্ববঙ্গ এতপরে বিজিত হইলেও ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদের এত অধিক পরিমাণে সংখ্যা গরিষ্ঠ হইবার কারণ কি? মুসলমানেরা যে খড়্গ-হস্তে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং কালাপাহাড় ও মুর্শিদ কুলি খাঁ প্রভৃতি যে-সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত হইয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই হিন্দুসমাজের উপর অধিক বিদ্বিষ্ট ছিলেন এবং হিন্দুদিগকে উৎপীড়ন করিতেন। ধীরে ধীরে যে বৃহৎ নাথপন্থী-সমাজ ইস্‌লামেরদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। বর্দ্ধমান জেলার বাতুল নামক গ্রামে প্রায় আশী বৎসর বয়স্ক শশিভূষণ পণ্ডিতের গৃহে বাং ১১৫০ সালে লিখিত, রামাই পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত একখানি পুঁথি আছে। উহা রামাই পণ্ডিতের দোহাই দিলেও তাঁহার বহুপরে লিখিত হইয়াছিল। এ দোহাইয়ের কোন মুল্য নাই। কিন্তু সদ্ধর্ম্মীরা যে ইস্‌লামেরদিকে কিভাবে অগ্রসর হইতেছিল, এই পুঁথিতে তাহার পরিচয় আছে। ইহার ধর্ম্ম-ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা এইরূপ ঃ—

"তোহ্মি সাহেব গোঁসাই, তোহ্মি জগন্নাথ॥
তোহ্মি ধরম গোঁসাই, তোহ্মি চারিবেদ।
তোহ্মি পীরপয়গম্বর, তোহ্মি সৈয়দ॥"

*

'ত্রিশ রোজার বাত কহে মিলে ফরমান।'

এই স্তোত্রটি খুব দীর্ঘ এবং ইহাতে উর্দ্দু শব্দ এত বেশী যে, তাহার অর্থবোধ হয় না। অথচ প্রার্থনাটি ধর্ম্মঠাকুরের কাছে। ইহার দ্বারা নিশ্চয়রূপে বুঝা যাইতেছে যে, সদ্ধর্ম্মীরা মুসলমানদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সুফীমতের সঙ্গে সহজ ও নাথ-পন্থীদের মতের অনেক ঐক্য আছে। সুফীরা গুরুর উপর অটল ভক্তিমান, নাথ-পন্থী ও সহজিয়ারাও তাহাই। সুফীরা স্ত্রীলোকের রূপক দিয়া ঈশ্বরের নিকট তাঁহাদের প্রেম নিবেদন করেন, সহজিয়াদের মতও সেই রূপ। সহজিয়া বৈষ্ণবেরা এখনও কোন কোন স্থলে স্ত্রীলোকের বেশ ভূষা পরিয়া রমণী-রূপে ঈশ্বরকে ভজনা করেন। এখনও নবদ্বীপে ললিতা-সখী তাঁহার বিস্তর অনুচরের সহিত কৃষ্ণকে ভজনা করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে স্ত্রীলোকোচিত অলঙ্কার এবং মাথায় ঘোমটা এবং তিনি পুরুষ দেখিলে ব্রীড়ানতা হইয়া মুখ ঘোমটায় আবৃত করিয়া সরিয়া যান। স্ত্রীলোকের মতই তিনি মৃদুভাবে কথা বলেন। তিনি চোখে-মুখে স্ত্রীলোকের ভাব এরূপ নিখুঁত ভাবে প্রকটিত করেন যে, তাহাতে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই যে, তিনি পুরুষ। ইহার নাম হরিমোহন চক্রবর্ত্তী, বাড়ী ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামে। আমরা আর একজন রমণী-বেশী পুরুষ সাধককে জানি, এখন ইহার বয়স নব্বই বৎসর। হাতে বালা ও চুড়ি, কর্ণে দুল, গলায় হার, মাথায় ঘোমটা,—এইভাবে নারীবেশে তিনি ভগবান্‌কে ভজনা করিতেছেন। একদা আদালতে তাঁহাকে হাজির হইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে উকিলেরা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি পুরুষ হইয়াও এরূপ অদ্ভুত আচরণ করিতেছেন কেন?" তিনি বলিলেন—"স্ত্রী-সুলভ কোমলতাই ভক্তির বিশেষ উপযোগী। ভগবান যেভাবে প্রীত হইবেন, তাহা আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, সেইরূপ অঙ্গসজ্জা করিয়া আমি তাঁহারই জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি।" এই কথায় নিউম্যানের উক্তি মনে পড়ে :—

"If thy soul is to go on into higher spiritual blessed-ness, it must become a woman ; yes, however

manly thou mayest be among men." (পুরুষগণের মধ্যে তুমি যতই পুরুষকার দেখাও না কেন, ধর্ম্ম-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে তোমার নারী সাজা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই।)

ডক্টর এনামুল হক্ বলেন—"ভারতীয় সুফীদের মধ্যে এক শ্রেণীর সাধক আছেন। যাঁহারা পুরুষ হইয়া রমণীজনোচিত অলঙ্কার পরেন এবং স্ত্রীভাবে ভগবানকে ভজনা করেন। মুসলমানদের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের নাম—'সদাসোহাগ সুফী'।" এই ভজনা-পদ্ধতি কাহার নিকট কে গ্রহণ করিয়াছিল, সে বিচারে প্রয়োজন নাই। বৌদ্ধ-সমাজে উত্তরকালে স্ত্রীলোক লইয়া যেরূপ ঘাঁটাঘাঁটি হইয়াছিল তাহাতে অনুমান হয়, এই ভজনা পদ্ধতির আদিস্থান বৌদ্ধতীর্থ; সুফী ও সহজিয়া উভয় সম্প্রদায়ই সেই তীর্থের নিকট ঋণী। নারী-ভজন ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হয় না, সহজিয়ারা এই মত প্রচার করিতে যাইয়া বৈষ্ণব-গুরুদের প্রতি পরকিয়া প্রেমের সাধনা আরোপ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে লিখিয়াছেন—'চণ্ডীদাস রামীকে, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে, বিদ্যাপতি লছিমা দেবীকে আশ্রয় করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন।" ইঁহারা—রূপসনাতন, মীরাবাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজকেও পরকিয়া প্রেমিকরূপে দাঁড় করাইয়া তাঁহাদের প্রেমের পাত্র-পাত্রীদের নাম করিয়াছেন। চৈতন্যদেবকেও তাঁহারা বাদ দেন নাই। সুফী-লেখকেরাও এইভাবে রমণী-প্রেমমুগ্ধ সাধুদের একটা তালিকা দিয়াছেন—

"বেশ্যাকুলে ছিল নারী মৈক্ষ শকনাবাত।
ভক্ত হৈল দেওয়ান হাফেজ অধিক তাহাত॥
হালওয়ালি সুত ছিল মোবারক সুন্দর।
ভক্ত হৈল তার রূপে বু-আলি কলন্দর॥
রূপবিনা প্রেম নাই, প্রেমবিনা ভক্তি।
ভাববিনা লক্ষ্য নাই, সিদ্ধিবিনা মুক্তি॥*

* 'জ্ঞান-সাগর'।

সহজিয়ারা এই নারী-ভজন দ্বারা সিদ্ধি-লাভকে 'লতা-সাধন' বলে। ইহারও আদি খুঁজিতে আমাদিগকে প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের খনির সন্ধান করিতে হইবে। খৃষ্টপূর্ব্ব তিন শতকে লিখিত পালি 'কথা-বথ্যু' পুস্তকে দেবগণ এবং সাধু পুরুষেরাও যে রমণীদিগকে অবলম্বন করিতেন, এই নীতির প্রচার আছে—"Even Infra human beings taking the shape of arhats follow sexual desire." যাহারা এই মতাবলম্বী, তাহারা বৌদ্ধগণের মধ্যে উত্তর পাঠক-শ্রেণীভূক্ত।

মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই আরব বণিকেরা বাণিজ্য করিবার জন্য এদেশে আসিতেন। সুফী সম্প্রদায়ের গুরু-স্থানীয় কেহ কেহ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। কথিত আছে—ঐ সময় সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের পাঁচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামের একটি টিলার উপর তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন আছে। ইনি ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। শাহ্ সুলতান রুমী কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপলের লোক; কোন কোচ-রাজাকে ইনি ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণার অন্তর্গত মদনপুরে ইনি সমাধিলাভ করেন। এই সাধক ১০৫৩ খৃঃ অব্দে তদীয় গুরু সৈয়দ শাহ্ সুর্খ্-খুল্ অন্তিয়া নামক কোন দরবেশ সমভিব্যাহারে মদনপুরে আগমন করেন এবং তদাঞ্চলের এক কোচ-রাজাকে কেরামত দেখাইয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শাহ্ সুলতান বল্‌খি একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বগুড়া জেলার রাজা পরশুরাম ও তদীয় কন্যা শীলা দেবীকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। কথিত আছে,—ইনি মধ্য-এসিয়ার বল্‌খের রাজা ছিলেন; যৌবনকালে রাজ্য ত্যাগ করিয়া ইনি সাধনার পথে অগ্রসর হন। মহাস্থানের রাজা পরশুরাম এবং তাঁহার কন্যা শীলাদেবী সম্বন্ধে

একটি পল্লী-গীতিকা আছে। * বগুড়ায় ইনি সর্ব্বপ্রথম ইস্‌লাম প্রচার করেন। তথায় তিনি একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মখ্‌দুম্‌ শেখ্‌ জালালুদ্দিন তব্‌রীজী লক্ষ্মণ সেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। হলায়ুধের 'শেখ্‌ শুভোদয়া' গ্রন্থে ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। † ইহা ছাড়া আরও কয়েকজন সুফী-সম্প্রদায়ের লোক মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিলেন। এই সকল সুফী-নেতারা হিন্দু-রাজত্বকালে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা পান নাই। ডক্টর এনামুল্‌ হক্‌ লিখিয়াছেন,—"নানা কারণে ইহারা সুফী-মতকে বঙ্গে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন নাই।"

কিন্তু পরবর্ত্তী সুফী-গুরুগণ ধর্ম্ম প্রচারে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি—১। সিরাজুদ্দিন বদায়ুনী (১৩৫৭ খৃঃ) ইহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল গৌড়; ২। নুরুদ্দিন কুতুব-ই-আলাম্‌ (১৪১৫ খৃঃ), গণেশের পুত্র যদু ইহার দ্বারা ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন; ৩। সফিউদ্দিন শহীদ্‌ (১২৯৫ খৃঃ), ইনি পাণ্ডুয়ার পাণ্ডু-রাজাকে পরাস্ত করিয়া সেই দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; ৪। শাহ্‌ ইস্‌লাম খান্নী উত্তর-বঙ্গে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন (১৪৭৪ খৃঃ), ৫। শাহ্‌ জালাল মুজর-রদ-ইয়মনী ১৩৪৬ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্টে দেহরক্ষা করেন এবং তাঁহার শিষ্য মুজসিন্‌ আউলিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে ইস্‌লাম প্রচার করেন।

---

* 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা' ৪র্থ খণ্ড ২য় সংখ্যা ৪৫—৭০ পৃষ্ঠা দেখুন।

† 'বৃহৎ বঙ্গ' ৫১৩-১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার কৃষ্টি ও সাহিত্যের ত্রিবেণী-সঙ্গম
বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান

মুসলমানগণ বুঝিয়াছিলেন—নাথ-পন্থী এবং সহজিয়ারা বঙ্গের জনসাধারণের গুরুস্থানীয়। পূর্ব্ব-বঙ্গে ইহাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। ইহারা পরাভূত বৌদ্ধ-শক্তির ধ্বংসাবশেষ;—বুদ্ধের জন্মোপলক্ষে ইহারা চড়কোৎসব করে। এক মাসকাল গেরুয়া পরিয়া ও কাছা গলায় বাঁধিয়া অহিংসা-নীতি পালন করে এবং সন্ন্যাসী সাজে। তাহারা বেদ মানে না এবং গুরুর বাক্যে একান্ত প্রত্যয়শীল। ইহাদের উৎসবের নাম 'ধর্ম্মের গাজন'। পরবর্ত্তীকালে তাহা 'শিবের গাজন' নামে পরিচিত হইয়াছিল। ইহাদের স্বাধীন মত ও সংস্কার-বর্জ্জিত উদারতা সুফী-মতের অনেকটা অনুকূল। ইহারা ভক্তি-সাধনায় অনেকটা অগ্রসর; ইহাদের সকলেই উচ্চ-হিন্দুশ্রেণী কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত। তাহা ছাড়া ইহারা গুরুবাদী ও অলৌকিক শক্তিতে আস্থাবান্। এই সকল কারণে সুফী সম্প্রদায় ইহাদের মধ্যেই প্রচার-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেকালে প্রচার-নীতি শুধু বর্জ্জনমূলক ছিল না। তাঁহারা একদিকে বর্জ্জন করিতেন এবং অন্যদিকে গ্রহণ করিতেন। এই সদ্ধর্ম্মীরা ব্রাহ্মণের উৎপীড়নে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল; ইস্‌লামের সামাজিক উদারতা ও সাম্য ইহাদিগকে বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বহু সংখ্যক নরনারী ইস্‌লামের ভুজাশ্রয়ে আসিয়া শান্তি লাভ করিল। বঙ্গের এক বৃহৎ জনসাধারণ গোঁড়া হিন্দু সমাজের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া সেই কঠোর গণ্ডীর

বাহিরে যে সাধনা করিতেছিল, ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া তাহারা তাহা ছাড়ে নাই। সুফী-গুরুগণ তাহাদিগকে অনেক নূতন তত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন এবং তাহারাও ইস্‌লামকে এদেশের উপযোগী করিয়া নূতন গড়ন দিতে ছাড়ে নাই। এই লেন-দেনের কারবারে সুফী-মত বঙ্গদেশে এক অপরূপভাবে পুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

গোঁড়া সম্প্রদায়ের বিরক্ত হওয়ার কোন কারণই নাই। যাঁহারা শত সহস্র বৎসরের সংস্কৃতি লইয়া মুসলমান হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের অবদান বিস্মৃত হইবেন কিরূপে? এই বঙ্গদেশ প্রেম ও ভক্তির স্বীয় নিকেতন, সেই প্রেম-পঙ্কজ হস্তে লইয়া এককালে মহাযানী বৌদ্ধ তাহার বুদ্ধ ও পরে গুরুর পায়ে অঞ্জলি দিয়াছে। পর যুগে মুসলমান হইয়া তাহারা তাহাদের হৃৎপদ্ম যে প্রাণ-প্রিয় হজরতের পায়ে দিলে, তাহাতে বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই। তাহাদেব নিজের ঘরে যে ফুল-পল্লব আছে, তাহা লইয়া তাহারা মস্‌জিদে প্রবেশ করিয়াছে। তদ্দ্বারা তাহারা তাহাদের অন্তর-দেবতার প্রতি প্রাণের অনুরাগ সহজেই বুঝাইয়া দিয়াছে। যে সকল উপকরণ তাহাদের নিজস্ব, যে অনবদ্য ও দুর্লভ কোমলতা বাঙ্গালী প্রকৃতি-সুলভ ও যাহা তাহারা শত সহস্র বৎসরের সাধনায় লাভ করিয়াছে, তাহা দিয়া যদি তাহারা অন্তরের কথা বুঝায়, তবে তাহাতে বাধা দেওয়ার কোন কারণই নাই। সুফীরা মুসলমান হইয়াও বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোমল অংশ ও দেহ-তত্ত্ব ছাড়িতে পারে নাই। সেই কোমলতায় হাফেজ ও সাদীর অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ইঙ্গিত রূপকের কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে কোন সংস্কৃতি বা ধর্ম্ম দেশ-বিদেশে ছুটিয়া যায়, তাহা সেই দেশের সিকতা-ভূমি, শ্যামল-ক্ষেত্র এড়াইয়া যাইতে পারে না, দেশজ উপাদানগুলির যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহার সুরভি ও রেণু বহন করিয়া সেই প্রবাহ সার্থক হয়। যখন কোন ধর্ম্ম সতেজ ও জীবন্ত থাকে, তখন তাহা পরস্ব গ্রহণ করিয়া

শক্তিশালী হয়। যেরূপ রাজা সর্ব্ব দেশের প্রজা হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভাণ্ডার পূর্ণ করেন, ইস্‌লামের গৌরবের দিনে আরব দেশ সেই ভাবে হিন্দুস্তানের জ্ঞান-বিজ্ঞান লুটিয়া লইয়াছিল। এমন কি, সেখ সাদী ও আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজী ছদ্মবেশে শিষ্যরূপে ব্রাহ্মণের ঘরে ঢুকিয়া সংস্কৃত-লিখিত শাস্ত্রের মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু যখন কোন ধর্ম্ম নিস্তেজ ও মৃতপ্রায় হয়, তখন তাহা মুমূর্ষু রোগীর স্থায় বাহিরের আলো ও বাতাস গায়ে লাগিবে বলিয়া ভীত হয়, মহাসাগর এবং সিন্ধু, গঙ্গা প্রভৃতি নদ-নদী দেশের নানারূপ ঐশ্বর্য্য ও আবর্জ্জনার মধ্য দিয়া সগৌরবে চলিয়া যায়, যাহা কিছু পথে থাকে তাহা শোধন করিয়া আত্মসাৎ করিবার শক্তি তাহাদের আছে। কিন্তু কূপোদক কোন দ্রব্যের সংস্পর্শের আশঙ্কায় সর্ব্বদা স্বীয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ভীত হইয়া থাকে। এই ছোঁয়াচে রোগে আমরা—হিন্দুরা যে সর্ব্বনাশের পথে চলিতেছি, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানের প্রভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল, কিন্তু এই সময়েই হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে ধর্ম্মক্ষেত্রে আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা পাইল। বিজয়গুপ্তের 'পদ্ম পুরাণ'-এ হিন্দু-মুসলমানের যে উৎকট দ্বন্দ্ব সূচিত হইয়াছে,, তাহাতে যেন শান্তিজল প্রক্ষেপ করিয়া বঙ্গের পল্লীতে সত্যপীর, মাণিকপীর ও মল্লিকপীর প্রভৃতি সাধুদের সম্বন্ধে বিবিধ কাব্য রচিত হইল। এই বিরাট সাহিত্যে আমার এখন প্রবেশ করার সময় ও সুযোগ নাই। আমরা দেখাইয়াছি যে, নাথপন্থী ও সদ্ধর্ম্মীরা হিন্দু-দেবতাদিগকে মুসলমান পীর-পয়গম্বররূপে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। এইরূপে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে গাজীর যুদ্ধ লইয়া যে সমস্ত ব্যাঘ্রের পাঁচালী 'কালু গাজি ও চম্পা' প্রভৃতি নামে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে গঙ্গাকে গাজীর মাসীমাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই কাব্য মুসলমান সমাজে প্রচলিত : 'জেবল মুলুক শামারোখ' কাব্যে দৃষ্ট হয় যে, হিন্দু দেবতাদিগকে মুসলমানের পীর সাজাইবার চেষ্টা মুসলমান কবি করিয়াছেন। এই পুস্তকের রচয়িতা মোহাম্মদ আকবর (জন্ম ১৬৫৭ খৃঃ অঃ)। তিনি লিখিয়াছেন—

"বিনয় করিয়া বন্দি ফিরিস্তার পদ।
ছুন্নীকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুর নারদ॥
তক্ত সিংহাসনে বন্দি আল্লার দরবারে।
হিন্দুকুলে ঈশ্বর যেন জগতে প্রচারে॥
পয়গম্বর সকল বন্দি করিয়া ভকতি।
হিন্দুকুলে দেবতা যেন হৈল প্রকৃতি॥
হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ॥
হিন্দুকুলে অনাদি নর প্রচার-প্রতাপ॥
মা হাওয়া বন্দুম জগত-জননী।
হিন্দুকুলে কালী নাম প্রচারে মোহিনী॥
হজরত রসুল বন্দি প্রভুর নিজ সখা।
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা॥
খোয়াজ খিজির বন্দুম জলেত বসতি।
হিন্দুকুলে বাসুদেব, শূন্যে যে প্রকৃতি॥
আছহবা সকল বন্দি নবীর সভায়।
হিন্দুকুলে দোয়াদশ গোপাল খেয়ায়॥
আওলিয়া, আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরাণ্
হিন্দুকুলে মুনিভাব আছয়ে পুরাণ॥
পীর, মুর্শিদ বন্দুম ওস্তাদ-চরণ।
হিন্দুকুলে গুরু যেন করয়ে পূজন॥"

ডক্টর এনামুল, হক্ লিখিয়াছেন—"কবি তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণটি লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই চমৎকার ও উপভোগ্য। দুঃখের বিষয়, বটতলার ছাপা পুঁথিতে ইহা পরিত্যক্ত হইয়া কোথা হইতে আর একটি বন্দনা সংযোজিত হইয়াছে। কবি তাঁহার বন্দনায় হিন্দু ও মুসলমান বিশ্বাসের মধ্যে কি কি সমান বস্তু আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া একটি বেশ উপভোগ্য বর্ণনা দান করিয়াছেন। তাঁহার হাতে—ফিরিস্তা (Angel) নারদে, আল্লাহ্—ঈশ্বরে, পয়গম্বর (Prophet) দেবতায়, আদম (Adam) অনাদি-নরে, হাওয়া (Eve) কালীতে, হজরত মহম্মদ—চৈতন্য অবতারে, খাজা-খিজির—বাসুদেবে, আস্‌হাবগণ (Companions of the Prophet) দ্বাদশ গোপালে, আওলিয়া-আম্বিয়া (Muslim saints) মুনিতে, কোরান্—পুরাণে এবং পীর, মুর্শিদ ও ওস্তাদ—গুরুতে পরিণত হইয়াছেন।" *

এখনও উত্তর পশ্চিমে হিন্দুরা মহরম উৎসবে যোগ দেয় এবং আমরা পীরের দরগায় সিন্নি দিয়া থাকি; ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। হিন্দু-মুসলমান এদেশে চালে-চালে ঠেকাঠেকি হইয়া বাস করিতেছে, হিন্দু-গৃহের মাধবীলতার ফুল মুসলমান-গৃহের চালায় যাইয়া ফুটিতেছে এবং মুসলমান-গৃহের এক-কোণ হইতে চন্দ্র-রশ্মি হিন্দুর মন্দিরের উপর পড়িতেছে। হিন্দুর উদ্যানের পুষ্প-সুরভি মুসলমানের আঙ্গিনার বায়ু বহিয়া আনিতেছে। এদেশে টিকিয়া থাকিতে হইলে হিন্দু-মুসলমানে যে সৌহার্দ্দ্য ঘটিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। পল্লী-বাসীরা একত্র হইয়া পরস্পরের আনন্দোৎসবে যোগদান করে; ইহা আমোদ বই আর কিছুই নয়। কবি এণ্টনী ফিরিঙ্গী ধুতি চাদর পরিয়া আসরে দাঁড়াইয়া রাধা-কৃষ্ণের গান গাহিতেন। কখনও কখনও—'ভজন-সাধন জানিনা মা,

* 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য'—৮২ পৃঃ

জাতে আমি ফিরিঙ্গী”—এই ভাবের শাক্ত সঙ্গীতও গাহিতেন। কিন্তু তিনি খৃষ্ট ধর্ম্ম ছাড়েন নাই। আমি নিজে দেখিয়াছি, ত্রিপুরাবাসী গোলমাহ্‌মুদ স্বীয় দলবল লইয়া স্ব-রচিত কালী-বিষয়ক নানা সঙ্গীত ঝিঁঝিট রাগিণীতে আসরে গাহিতেন। তাঁহার রচিত—“উন্মত্তা, ছিন্নমস্তা এ রমণী কা'র—” প্রভৃতি গানের রেশ এখনও আমার কানে বাজিতেছে। কিন্তু গোলমাহ্‌মুদকে মুসলমানেরা কখনও 'কাফের' বলেন নাই। তিনি স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ ছিলেন। সৈয়দ জাফর শাহের কালী-বিষয়ক গান অনেকেই জানেন।

পূর্ব্বোক্ত পীরদের সম্বন্ধীয় কাব্যের মধ্যে একজন মাত্র কবির রচিত একখানি কাব্যের কথা উল্লেখ করিব। তাঁহার রচিত 'সত্যপীরের কথা' সমস্ত সত্যপীর-সম্বন্ধীয় কাব্যের আদি। উহা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে একজন মুসলমান পীরের আজ্ঞায় রচিত হয়। এই কবির নাম—কঙ্ক এবং তাঁহার রচিত কাব্যের অপর নাম—'বিদ্যাসুন্দর'। যে কয়েকখানি বাঙ্গলা 'বিদ্যাসুন্দর' পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে এইখানি সর্ব্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল। 'বিদ্যাসুন্দর' নামের সঙ্গে যে কুরুচির ভাব জড়িত, এই কাব্যখানিতে তাহা আদৌ নাই। কঙ্ক ময়মনসিংহের কোন গ্রামবাসী গুণরাজ নামক ব্রাহ্মণের পুত্র। কিন্তু দৈবদোষে মুরারি নামক এক চণ্ডাল ও তৎপত্নী কৌশল্যার যত্নে অতি শৈশবে লালিত-পালিত হন। ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁহার কোন্ স্থান ছিল না। কিন্তু পঞ্চ বর্ষ বয়সে তাহার চণ্ডাল ধর্ম্মপিতা এবং চণ্ডালিনী মাতা স্বল্প সময়ের ব্যবধানের মধ্যে স্বর্গীয় হইলে—বালক একেবারে সকল সমাজের পরিত্যক্ত হয়। একে ত 'অপয়া শিশু' বলিয়া কোন দয়ালু লোক কুসংস্কার বশতঃ এই বালকের ভার গ্রহণে সম্মত হ'ন নাই, তারপর সে চণ্ডাল-পালিত। সুতরাং কে তাহাকে গ্রহণ করিবে? এই বালক তাহার চণ্ডাল পিতামাতার শ্মশানে দুই দিন দুই

রাত্রি উপবাসী হইয়া চিতাভস্মের উপর পড়িয়াছিল। ঋষিতুল্য সর্ব্বজন-পূজ্য ব্রাহ্মণ গর্গ ইহাকে শ্মশান হইতে তুলিয়া লইয়া তাঁহার গা নামাবলী দিয়া মুছিয়া স্বীয় পত্নী সাবিত্রীর হস্তে সমর্পণ করেন। তথায় বালক কঙ্ক 'সুরভি' নামক একটি গরু চরাইত এবং অতি সুমিষ্ট স্বরে বাঁশী বাজাইত। গর্গ পণ্ডিত—অপূর্ব্ব মেধাবী দেখিয়া ইহাকে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শিক্ষা দেন। অনতিক্রান্ত-কৈশোরে এই বালক 'মলয়ার বারমাসী' নামক এক কাব্য লিখিয়া সমস্ত ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। *

এই সময়ে বিপ্র গ্রামে এক মুসলমান পীর আগমন করিয়া গ্রামের এক প্রান্তে আস্তানা করেন। ইঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল। ইঁহার সঙ্গে পঞ্চ শিষ্য থাকিতেন—

"সাকরেত লইয়া পঞ্চ, পীর একজন।
গো-চারণ মাঠে আসিয়া দিল দরশন॥
বট গাছের তলখানি চাঁছিয়া ছুলিয়া।
বাস করে পীর তথা দরগা স্থাপিয়া॥
নামে ডাকের পীর, তার বড় হেকমত।
ধুলা দিয়া ভাল করে আইসে রোগী যত॥
অন্তরের কথা নাহি দেয় বলিবারে।
আপনি কহিয়া যায় অতি সুবিস্তারে॥
মাটী দিয়া বানায় মেওয়া কিবা মন্ত্র বলে।
শিশুগণে ডাকি তবে হস্তে দেয় তুলে॥
অবাক হইল সবে দেখি কেরামত।
দর্শন মানসে লোক আইসে শত শত॥

* 'মলয়ার বারমাসী' আংশিকভাবে পাওয়া গিয়াছে।

যে যাহা মানস করে, সিদ্ধি হয় তার।
হেক্‌মত জাহির হইল দেশের মাঝার ॥
চাউল, কলা কত সিন্নি আইসে নিতি নিতি।
মোরগ, ছাগল, কইতর নাহি তার ইতি॥
সিন্নির কণিকা মাত্র পীর নাহি খায়।
গরীব দুখীরে সব ডাকিয়া বিলায় ॥" *

এই পীর দূর হইতে কঙ্কের বাঁশী শুনিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন। উভয়ের প্রতি উভয়ের নিবিড় পরিচয়ের ফলে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পীরের আদেশে কঙ্ক সত্যপীরের কাহিনী রচনা করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাই বঙ্গভাষার প্রথম 'বিদ্যাসুন্দর'।

'মলয়ার বারমাসী' লিখিয়া কঙ্ক ইতিপূর্ব্বেই 'কবি কঙ্ক' নামে পরিচিত হইয়াছিল। সে এখন পীরের শিষ্য—

"সর্ব্বদা নিকটে থাকে ভক্তিপূর্ণ মনে।
চরণে লুটায় তার দেবতার জ্ঞানে ॥
তারপর জাতি-ধর্ম্ম সকল ভুলিয়া।
পীরের প্রসাদ খায় অমৃত বলিয়া ॥
জাতি-ধর্ম্ম নাশ কৈল রটিল বদনাম।
পীরের নিকটে কঙ্ক শিখিল কালাম ॥
দীক্ষিত হইল কঙ্ক সেই পীরের স্থানে।
সর্ব্বনাশের কথা গর্গ কিছু নাহি জানে ॥
পীরের নিকটে যায় অতি সঙ্গোপনে ॥
যাতায়াত করে কঙ্ক কেহ নাহি জানে ॥"

* 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা' কঙ্ক ও লীলা—১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ ২৩০।

'সত্যপীরের পাঁচালী' কঙ্ককে লিখিতে বলিয়া একদিন সেই পীর বিপ্রগ্রাম হইতে চলিয়া গেলেন। তারপর—

"গুরুর আদেশ শুনি, লিখিয়া পাঁচালী আনি,
পাঠাইল দেশ আর বিদেশে।
কঙ্কের লিখন কথা, ব্যাপ্ত হৈল যথা তথা,
দেশ পূর্ণ হৈল তার যশে॥
কঙ্ক আর রাখাল নহে, 'কবি কঙ্ক' সবে কহে,
শুনি গর্গ মানে চমৎকার।
হিন্দু আর মুসলমানে- সত্যপীরে সবে মানে,
পাঁচালীর হৈল সমাদর॥
যেই পূজে সত্যপীরে, কঙ্কের পাঁচালী পড়ে,
দেশে দেশে কঙ্কের গুণ গায়।"

গর্গের নিকট কঙ্ক সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও পালি রীতিমত শিক্ষা করিয়াছিল। এখন সে কবিত্ব গুণে সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছে দেখিয়া, গর্গ তাহাকে ব্রাহ্মণ-সমাজে তুলিতে চেষ্টা করিলেন। এইবার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে গর্গ স্বগৃহে এক প্রকাণ্ড সভায় আহ্বান করিয়া—"কঙ্ক ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হোক্।"—এই প্রস্তাব করিলেন।—"কঙ্ক ব্রাহ্মণের সন্তান, অপোগণ্ড অবস্থায় সে চণ্ডালের গৃহে পালিত হইয়াছিল - তাহার তখন কোন জ্ঞান হয় নাই এবং সেজন্য সে দায়ী হইতে পারে না।"—এই ছিল গর্গের যুক্তি। নন্দ নামক এক পণ্ডিত প্রতিবাদী গোঁড়া ব্রাহ্মণের দলে নেতা হইল। বহু জটলা ও তর্ক-বিতর্ক চলিল, কিন্তু গর্গ ছিলেন পণ্ডিত-শিরোমণি—তাঁহার সহিত বিচারে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা তর্কে পরাভূত হইয়া গোপনে কঙ্কের সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল—

"নানামত ভাবি তারা উপায় করিল।
সাপের চোখেতে যেন ধুলা-পড়া দিল ॥
রটে—কঙ্ক নহে শুধু চণ্ডালের সুত।
মুসলমান পীরের কাছে হয়েছে দীক্ষিত ॥
হিন্দুযত গণে কঙ্কে ম সলমান বলি।
কেহ ছেঁড়ে, কেহ পোড়ে সত্যের পাঁচালী ॥
জাতি গেল মুসলমানের পুঁথি নিয়া ঘরে।
যথাবিধি সবে মিলি প্রায়শ্চিত্ত করে ॥"*

শুধু ইহাই নহে, তাহারা কঙ্কের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়া গর্গকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল। দারুণ অনুতাপে গর্গ উন্মত্তের মত কঙ্ককে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কারণ শত্রুপক্ষ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল যে, তাঁহার প্রাণ-প্রতিমা কন্যার প্রতি কঙ্ক আসক্ত। এই মিথ্যা কলঙ্ক কথায় গর্গ একেবারে বুদ্ধিহারা হইলেন। বিষাক্ত খাদ্য লীলা ফেলিয়া দিল, কিন্তু তাহা খাইয়া বাড়ীর সুরভি গাভীটা মারা গেল। লীলা কঙ্ককে বলিল—"তুমি এখনই এই পাপ-স্থান হইতে পলাইয়া যাও।" সেই ভীষণ রাত্রে কঙ্ক নিরাশা ও দুশ্চিন্তার চরমে পৌছিয়া বাহির ঘরের আঙ্গিনায় পড়িয়া রহিল। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিল—সে যেন নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। বিকৃতাকৃতি যমদূতগণ তাহাকে পোড়াইতেছে। কিন্তু এক 'রক্ত গৌর-বরণ' সুপুরুষ বৈকুণ্ঠের বাতাস তাহার গায়ে লইয়া আসিয়া তাহার সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া দিলেন। তিনি কঙ্ককে ইঙ্গিত করিয়া তাহার নিকট যাইতে বলিয়া অদৃশ্য হইলেন। ইনি দেব-মানব চৈতন্য। ঘুম ভাঙ্গিলে কঙ্ক তাহাকে দেখিতে তৎ-চরণ-নূপুর

* ২৩৩ পৃঃ 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'—প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

শিক্ষিত নবদ্বীপে চলিয়া গেল। কথিত আছে—যাত্রা-পথে নৌকা ডুবি হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

কঙ্কের সত্যপীরের কথা বা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের মার্জ্জিত রুচি ও কবিত্ব আমাদিগকে মুগ্ধ করে। এই পুস্তক চৈতন্য-প্রভুর সমসাময়িক এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন 'বিদ্যাসুন্দর'। পুস্তকখানি ছাপা হয় নাই। কিন্তু পুঁথি আমার নিকট আছে। সত্যপীরের কাহিনীর ভূমিকায় কঙ্ক নিজ জীবনের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহার সহিত রঘুসুত প্রভৃতি কবি রচিত কঙ্ক-জীবনীর সঙ্গে সকল বিষয়েই ঐক্য দৃষ্ট হয়। আত্মচরিতটি অবশ্য সংক্ষিপ্ত। মুসলমান পীরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার ফলে এবং স্বয়ং জাতিবৈষম্য-জনিত নানা দুঃখের ভুক্তভোগী হইয়া এবং গর্গের মত মহামনা সাধু পুরুষের সংসর্গে তাঁহার চিত্তের যে উদারতা হইয়াছিল, তাহা 'বিদ্যাসুন্দর'-এর ভূমিকায় সূচিত হইতেছে। ইনি তাঁহার চণ্ডালিনী মাতা কৌশল্যার পায়ে যেভাবে প্রণতি জানাইয়াছিলেন, কোন ব্রাহ্মণ-পুত্র সেইরূপ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

বহু কবি সত্যপীর, মাণিকপীর প্রভৃতি সম্বন্ধে পাঁচালী লিখিয়াছেন, ইহাদের শ্রোতা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অসংখ্য। ইহার ইতিহাস দিতে গেলে এই সন্দর্ভ অতিকায় হইয়া পড়িবে। এই সকল কাব্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সেতু-স্বরূপ এবং ইহারা উভয় সম্প্রদায়ের নিকট আদৃত হইয়া আসিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পল্লী-গাথার ঐতিহাসিক পট-ভূমিকা

বাঙ্গালার পল্লী-গাথা বাঙ্গালার অতুলনীয় সম্পদ। পল্লী-সাহিত্য ভারতে বৈদিক-যুগ হইতে আদৃত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধাধিকারে জন-সাধারণের ভাষাকে রাজারা বিশেষ উৎসাহ দিতেন। প্রজারা তাঁহাদিগকে কীর্ত্তি-জ্ঞাপক গান রচনা করিয়া শুনাইতেন। হিন্দু-যুগে রঘু রাজা প্রজাদের রচিত ঐরূপ গান শুনিতে ভালবাসিতেন। খালিমপুরের তাম্রশাসনে ধর্ম্মপাল (অষ্টম শতাব্দী) সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, গ্রামোপকণ্ঠে রাখাল বালকগণ ও সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিকগণ তদীয় প্রশংসা-সূচক গান গাহিত—এমন কি, পিঞ্জরাবদ্ধ শুক-সারীরাও সেই সমস্ত গান আবৃত্তি করিতে শিখিত। বানগড়ের তাম্র-শাসনে রামপাল (দশম শতাব্দী) সম্বন্ধেও ঐরূপ পল্লী গীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় মহীপাল-সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা তাম্রশাসনে আছে ('কীর্ত্তি প্রজা-নন্দিত বিশ্বগীত')। চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে লিখিত আছে যে—"জনসাধারণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও 'যোগীপাল', 'ভোগীপাল' ও 'মহী-পালের' গীত শুনিতে ভালবাসিত" 'শেখ্-শুভোদয়া' গ্রন্থে রামপাল সম্বন্ধে পল্লী-গীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একাদশ শতাব্দীর একখানি তাম্র-শাসনে ঈশ্বর ঘোষের পিতা ধবল ঘোষ সম্বন্ধেও ঐরূপ পল্লী গীতিকার উল্লেখ আছে।

কিন্তু পালদের সময় পর্য্যন্ত আসিয়া এই প্রকারের রাজ-বন্দনার স্রোত হঠাৎ থামিয়া গেল। সেন-রাজাদের সম্বন্ধে সেরূপ একটিও স্তুতি-গীতি পাওয়া যায় না। সেন-রাজাদের কোন তাম্রশাসন, কাব্য বা ইতিহাসে প্রজাগণ যে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন গীতি রচনা করিয়াছে,

সেরূপ কথা আভাসেও জানা যায় না; তাঁহাদের বহু পূর্ব্বের মহীপালের সম্বন্ধে বাঙ্গলা গান আংশিকভাবে পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের সমসাময়িক অথবা কিছু পূর্ব্বের গোপীচন্দ্রের গানও অজস্র পাওয়া যাইতেছে। লক্ষ্মণ সেনের সময় বাঙ্গালার ইতিহাসে অতি গুরুতর বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয়, রাজদণ্ড হিন্দু-রাজার হাত হইতে খসিয়া ইসলামধর্ম্মী-রাজার হস্তে যাইয়া পড়ে। এতবড় ঘটনাতে প্রজাদের হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিবার কথা অথচ তাহারা তাহাদের চিরাগত অভ্যাসানুযায়ী এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনার অভিব্যক্তি-স্বরূপ কোন গীতিকা রচনা করে নাই। ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, সেই রাজত্বের লোপে জনসাধারণের মনে তেমন আঘাত লাগে নাই; সেন-রাজত্ব ধ্বংসে কাণোজিয়া ব্রাহ্মণ-বংশ এবং কতিপয় উচ্চ-শ্রেণীর লোকের মধ্যে অবশ্যই কতকটা পরিতাপের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-অনুশাসনের ফলে এককালে যে, জনসাধারণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, সেই অধঃপতিত ও অপাংক্তের প্রজামণ্ডলীর সঙ্গে রাজাদের অন্তরঙ্গতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই বিপুল প্রজাশক্তি সেন-রাজাদের অনুকূলে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা রাজ-দরবারে ঢুকিতে সাহস পাইত না—নাপিত, ধোপা, তেলি হইতে হাঁড়ি, ডোম, চণ্ডাল পর্য্যন্ত একান্ত ঘৃণার সহিত বর্জ্জিত হইয়াছিল। ইহাদের সহিত সাহচর্য্য ত দূরের কথা, এই সকল শ্রেণীর কোন লোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখিলে যাত্রা-ভঙ্গ হইত। 'ছি ছি,' 'দূর দূর' এই ছিল তাহাদের প্রতি সম্ভাষণের ভাষা। অথচ এই পর্য্যন্ত বঙ্গেশ্বরদের সিংহাসন ডোম ও অপরাপর তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণ-দেওয়া রাজভক্তি ও দুর্জ্জেয় সাহসের ফলে রক্ষা পাইয়া আসিয়াছিল। 'ধর্ম্ম-মঙ্গল' কাব্যে ডোম-সৈন্যের রাজভক্তির যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাহার তুলনা

নাই। সেন-রাজত্বকালে ইহারা অনাচরণীয় হইয়া একেবারে পর হইয়া রহিল।

শুধু তাহাই নহে, সংস্কৃত ভাষার অত্যধিক আদরে রাজসভা হইতে মাতৃভাষা তাড়িত হইল। যদি কেহ 'রামায়ণ' বা 'পুরাণ'-এর কথা বাঙ্গলা ভাষায় প্রচার করে এবং শ্রবণ করে, তবে সে রৌরব-নরকে পতিত হয়—ইহাই হইল অনুশাসন—"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং গচ্ছেৎ॥" সুতরাং প্রজা সাধারণের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া তাহাও যেন আস্তাকুঁড়ে ফেলা হইল, তাহাদের শিক্ষার পথ একেবারে বন্ধ হইল। কবি কাশীদাস প্রতি অধ্যায়ের শেষে—"মস্তকে বাঁধিয়া ব্রাহ্মণের পদ-রজঃ। কহে কাশীদাস—" প্রভৃতি ভাবে ব্রাহ্মণের বন্দনা করিয়াও তাঁহাদিগকে খুসী করিতে পারেন নাই। রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস এবং মহাভারতের অনুবাদক কাশীদাসের উপর অভিসম্পাত করিয়া ভট্টাচার্য্যেরা এই প্রবাদ-বাক্য রচনা করিলেন—"কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে আর বামুন ঘেষে, এই তিন সর্ব্বনেশে।"*

বঙ্গের যে অবদান, শিউলী ফুলের মত অজস্র ও সুন্দর। সেই রূপকথা ও গীতিকথা (যাহার কিয়দংশ গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় বিলাতে প্রচার করিয়াছেন), যে মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি রূপকথার তুলনা জগতে নাই।* সেই রূপকথা ও গীতিকথার পুষ্পবন ভাঙ্গিয়া পড়িল, অমৃত-কুণ্ডের খাদ যেন শুকাইয়া গেল। বঙ্গের উচ্চ-কুল-সম্ভূত রমণী-সমাজে যাহারা এই সকল গীতিকথা আবৃত্তি করিত, তাহারা 'আলাপিনী' নামে পরিচিত ছিল। এবার আলাপিনীদের কাজ শেষ হইয়া গেল। রূপকথার

* রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল'।

* মৎকৃত "Folk Literature of Bengal" দ্রষ্টব্য।

বাঁধুনী ছিল মস্‌লিনের ন্যায় সূক্ষ্ম। দিদিমা ও জননীদের মুখে এই সকল রূপকথা শুনিয়া শিশুরা যে কত আনন্দ পাইত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা অতি শৈশবে রাজপুত্র, সদাগরের পুত্র, কোটালের পুত্র ও পল্লীর নরনারীর প্রেম-বিষয়ক বহু গল্প শুনিয়াছি, যাহার কিয়দংশ গ্রীম্‌ ভ্রাতৃদ্বয়ের কৃপায় ইংরাজী অনুবাদে পড়িতেছি। তাহার অনেকগুলির উৎপত্তি স্থান যে এই বঙ্গদেশ তাহা কি আমরা কোনকালে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি? ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে আমরা রূপকথা হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু একথাটা মনে রাখা উচিত যে, সহস্র কল্পনা ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও সেই সকল রূপকথা-বর্ণিত বীরত্ব, সাধুতা ও ত্যাগের উপাদান জোগাইয়াছে—প্রধানতঃ গুপ্ত ও পাল-যুগ। যে সময় বাঙ্গালী-বণিক বীরদর্পে দেশ-বিদেশে পর্য্যটন করিত, রাক্ষস-দানবের মত দুর্জ্জয় শত্রুর সন্নিহিত হইত, কত রূপসী রাজকুমারী ও লাঞ্ছিতা রমণীকে খড়্গহস্তে উদ্ধার করিত, বিশাল অরণ্যের দুর্ভেদ্য ব্যূহে তান্ত্রিকগণ ('Flesh to flesh and bone to bone') মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃতের খণ্ডিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়া দেওয়ার গর্ব্ব করিত—যখন অজ্ঞাত বিদেশের অচিহ্নিত পথে কত পরী-দানোর স্বপ্ন দেখিত এবং শত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন শত্রুর শিরশ্ছেদ-পূর্ব্বক প্রণয়িনীর পদে জীবন-অর্ঘ্য দান করিত,—অজানা উৎকট দেশে, অমানিশার অন্ধকারে অজগর ও ব্যাঘ্র-সঙ্কুল বিপুল অরণ্যানীর ঘন-পত্রাচ্ছাদিত তরুশাখার ছায়ায় ছায়ায় ভূত প্রেতের কল্পনা করিত,—সেই সকল অনৈসর্গিক ও অবাস্তবতার রাজ্যেও আমরা সেই বীর-জগতের ছায়া দেখিতে পাই, যেখানে লোক আরাম চাহিত না, নিত্য নূতন জয়ের অভিযানে উন্মত্ত ছিল,

যখন ভক্তির ছায়ায় বসিয়া অশ্রুপাত করাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য মনে করিত না—যখন উন্মত্ত তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে তাহারা প্রাণের ভয় ত্যাগ করিয়া দূর-দূরান্তরে চলিতে থাকিত। দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, নির্জ্জন সিকতা-ভূমির লোক-বিরলতা, নানারূপ জনশ্রুতির কাহিনীর বিভীষিকা, কিছুতেই তাহাদিগকে টলাইতে পারিত না—যখন সুন্দরীর প্রেম অর্থে—লোকে বুঝিত না শুধু—ফুরফুরে হাওয়া, চাঁদিনী রাতের মলয়-সমীর, আগুন-বর্ণ অশোক ফুলের বসন্ত-লীলা, কিন্তু যখন সুন্দরী রমণী কত দুর্লভ ও ঈপ্সিত, তাহাকে পাইতে হইলে শবাসনে তাপসের ন্যায় সাধনা চাই, প্রতিপদে উৎকট ও দুরূহ বিপদ তৃণবৎ দলন করিয়া যাইতে হয় এবং ছিন্নমস্তার মত নিজের মস্তক বলি দিয়া সিদ্ধিলাভ ঘটে,—সেই সকল রূপকথা শুনিতে শুনিতে শিশুর মনে দেশ পর্য্যটনের দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইত, যুবকের মনে সাফল্য ও প্রণয়িনীর প্রেমের জন্য জীবন-পণ করিতে ইচ্ছা হইত। পুরুষোচিত কর্ম্মশীলতার ভাব তরুণ-মনে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইত। এই রূপকথার বনে মালঞ্চমালার গল্প ছিল বনস্পতি। উহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ইংরেজ-সমালোচক স্বীকার করিয়াছেন। সেন-রাজত্বের সময় সেই সকল রূপকথার যাদুমন্ত্র আমরা ভুলিয়া গেলাম। তৎস্থলে কথকঠাকুর চন্দন-চর্চ্চিত ললাটে, তুলসী-মঞ্জরী ও ফুলের মালা পরিয়া—ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশীর কথা শুনাইতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাস ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিলেন—"এই সকল গল্প-গুজব শুনিয়া 'বৃথ কাল যায়'।" হিন্দুরা ছাড়িয়া দিলেও মুসলমানের কুটীরে রমণীরা বংশ-পরম্পরা-প্রাপ্ত পল্লী-সম্পদ সেই রূপকথা এখনও ছাড়েন নাই। আমরা সমধিক পরিমাণে তাঁহাদের নিকটেই এই

প্রাচীন সম্পদের সন্ধান পাইতেছি। মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহের পরে যে-সকল উপাখ্যান হিন্দু মা ও দিদিমাদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, সেই সকল পৌরাণিক উপাখ্যান, যথা—ধ্রুব-চরিত্র, প্রহ্লাদ-চরিত্র, পঞ্চ-পাণ্ডবদের কীর্ত্তি মুসলমানগণ গ্রহণ করেন নাই। মুসলমানগণ পূর্ব্বযুগের কথা-সাহিত্য এখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, কারণ তাঁহারা জননীর অঙ্কে বসিয়া বহু শতাব্দী যাবৎ তাহা শুনিয়া আসিতেছেন। মৃত্যুকন্যা মালঞ্চমালা, কাজলরেখা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি বৌদ্ধ-যুগের রূপকথা এখন পর্য্যন্ত মুসলমান-পল্লীতেই প্রচলিত। দক্ষিণারঞ্জণের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' বাহির হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে ঐগুলি কতকটা পরিবর্ত্তিত আকারে মুসলমানী প্রেস্ হইতে ছাপা হইয়া আসিতেছে। এই বৃহৎ কথা-সাহিত্য এখন খুঁজিবার বিষয়। নব ব্রাহ্মণ্য-শাসিত রাঢ়দেশ অপেক্ষা বৌদ্ধাদর্শে গড়া পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গেই এই সকল রূপকথার সন্ধান বেশী মিলিতেছে।

জনসাধারণ অনাচরণীয়, তাহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ। তাহারা রাজদরবারে ঢুকিবে কিরূপে? খুব সম্ভব নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়া তাহারা সেন-রাজাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন বা বিশ্বরূপসেন সম্বন্ধে একটি ছড়াও নাই এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অপিচ এই নির্য্যাতিত জনসাধারণের চিত্তে যে, বিক্ষুব্ধ বারিধির ন্যায় বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা 'নিরঞ্জনের রুষ্যায়' স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কোন বিদেশী-শক্তি দেশের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার নিকট বহুকাল দাঁড়াইতে পারে না। বঙ্গে হিন্দু রাজত্বের অবসান হইল এবং ইস্‌লামের বিজয়-কেতন উড্ডীন হইল। কিন্তু একটিও স্মরণীয় যুদ্ধ হইল না। পরন্তু ইসলামকে জনসাধারণের একাংশ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিল। সেন-রাজত্বে তাঁহাদের অধিকৃত নব ব্রাহ্মণ্যে-দীক্ষিত

জনপদে বাঙ্গলা ভাষা সম্পূর্ণরূপে অনাদৃত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপেক্ষিত অবস্থায় ছিল।

সেনেরা সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন না, তাঁহাদের শাসন অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিসর গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কাণোজিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য ও বিধি-ব্যবস্থা সেন-রাজাদের রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেন-রাজাদের গণ্ডীর বাহিরে বঙ্গভাষার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সেন-রাজাদের সেনাপতি হীরাবন্ত খাঁ ত্রিপুরেশ্বরী সুন্দরীর হাতে লাঞ্ছিত ও পরাভূত হইয়া সেই পার্ব্বত্য-রাজ্য জয়ের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজদরবারে বাঙ্গলা ভাষায় তাম্রশাসন মুদ্রিত হইত এবং এখন পর্য্যন্ত সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। এই ভাষার নাম সেখানে ছিল 'সুভাষা'। কোচবিহারে ও আসামে রাজদরবারের ভাষা ছিল বাঙ্গলা। তথাকার রাজাদের সাহায্যে ও আদেশে বহু বাঙ্গলা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আরাকানের রাজাদের ও ত্রিপুরেশ্বর-গণের মধ্যে অধিকারের সীমানা লইয়া বহুকাল যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল। কিন্তু উভয় রাজ্যের লিখিত ভাষা ছিল বঙ্গভাষা। যদিও সেন-রাজাদের প্রশংসা-সূচক কোন গীতিকাই পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ত্রিপুর-রাজ ধন্যমাণিক্য ও তাঁহার রাজ্ঞী কমলা দেবীর (১৪৬৩—১৪১৫ খৃঃ) প্রশংসা-সূচক অনেক গীতি বিরচিত হইয়াছিল, 'রাজমালায়' তাহা উল্লিখিত আছে। এই সকল গীতি ছাগ-তন্তুর বাদ্যযন্ত্র সহকারে গীত হইত। ধন্যমাণিক্য ত্রিহুত হইতে গায়ক ও নর্ত্তক আনিয়া তাঁহার প্রজাদের মধ্যে এ সকল গীতি নাচিয়া গাহিবার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সেন-রাজত্বের অবসানে গৌড়ের পাঠান-রাজদরবারে বাঙ্গলা ভাষা ধীরে ধীরে স্বীয় প্রতিষ্ঠা পুনরায় স্থাপন করিতে সুবিধা পাইল। ইঁহাদের প্রায় সকলেই বঙ্গভাষার উৎসাহ-বর্দ্ধক ও অনুরাগী ছিলেন। কোন

পাঠান-গৌড়েশ্বরের সভায় গান গাহিবার জন্য চণ্ডীদাসের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। যশোরাজ খাঁ তদীয় বাঙ্গলা গীতিতে—'শাহ হুসেন জগত-ভূষণ' —বলিয়া সম্রাট্ হুসেন শাহের বন্দনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি—'প্রভু গায়সউদ্দিন সুলতান'—বলিয়া উক্ত সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন এবং—

"সে যে নাসিরা শাহ জানে, যারে হানিল মদন বাণে,
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর, বিদ্যাপতি ভণে।"

এই পদে নসিরা শাহের প্রতি প্রীতি নিবেদন করিয়াছেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর—'কলিকালে হরি হৈল কৃষ্ণ অবতার'—বলিয়া হুসেন শাহকে বর্ণনা করিয়াছেন এবং বিজয়গুপ্তও এই রাজাকে—'সনাতন হুসেন শাহ নৃপতি-তিলক'—বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠান-রাজ শামসুদ্দিন ইউসুফ্ ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুকে 'গুণরাজ' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন—

'অজ্ঞান অধম মুই নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজ খান॥"

হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের অনুজ্ঞাক্রমে একখানি বাঙ্গলা মহাভারত সঙ্কলিত হইয়াছিল। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত নায়ক সে-যে নসরত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিধান॥"

হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে দিয়া যে মহাভারত বাঙ্গলায় সঙ্কলিত করাইয়াছিলেন, তাহার কথা আপনারা অনেকেই জানেন। সাধারণতঃ এই মহাভারতখানি 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৌদ্ধ-রাজগণ বঙ্গভাষার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি-কথা তাঁহারা মাতৃ ভাষায় শুনিতে ভালবাসিতেন। বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ একসময় বৌদ্ধগণ অধ্যুষিত থাকায় ফলে তথায় বাঙ্গলা ভাষার অনেকগুলি প্রাচীনতম কাব্য প্রণীত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধগণ তাড়িত হইলে তাঁহাদের নেতৃগণের একদল তিব্বত ও নেপালের উপত্যকা ভূমিতে পলাইয়া যান, অপর দল চট্টগ্রামের পূর্ব্বে আরাকান ও ব্রহ্মদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই প্যাগোডা ও ফুঙ্গীর দেশে বঙ্গীয় বহু বৌদ্ধ আড্ডা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহারা বহু বিদ্যায় পারদর্শী ও কৃতী ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার আদর করিতেন ও তাহার চর্চ্চা জনসাধারণের মধ্যে বিষদভাবে প্রচলিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে একস্থানে লিখিত হইয়াছে—আরাকান রাজাদের অধিকার এক সময়ে ঢাকা হইতে পেগু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইঁহাদের অধিকারে চট্টগ্রামে এবং তদুপান্তে অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ ছিল। পরবর্ত্তী যুগে এই সকল প্রদেশে এক সুবৃহৎ সংখ্যক অধিবাসী ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। এইভাবে তথায় কতক লোক বৌদ্ধ রহিয়া গেল এবং অপরাংশ ইস্‌লাম গ্রহণ করিল। পূর্ব্ববঙ্গের সুদূরে চট্টগ্রাম সন্নিহিত আরাকান রাজ্যে বৌদ্ধ রাজদরবারের ভাষা ছিল বাঙ্গলা ভাষা। যাঁহারা বৌদ্ধ রহিলেন এবং যাঁহারা মুসলমান হইলেন, তাঁহাদের উভয় শ্রেণীরই মাতৃভাষা ছিল বাঙ্গলা ভাষা। চট্টগ্রামের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর, যিনি পরাগল খাঁর আদেশে বাঙ্গলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন, তিনিও বাঙ্গলাকে 'দেশী ভাষা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীকরণ নন্দী যিনি পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে—'জৈমুনি ভারত' রচনা করেন, তিনিও বাঙ্গলা ভাষাকে 'দেশী ভাষা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

'দেশী ভাষায় এই কাব্য রচহ পয়ার।
সঞ্চারউক কীর্ত্তি মোর জগৎ সংসার॥'

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আরাকানের মগরাজা এবং তাহাদের মুস্‌লিম অমাত্যগণ সকলেই এই বাঙ্গলা ভাষাকে 'দেশী ভাষা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে কি এই অনুমান হয় না যে, আরাকানের প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা যাহাই থাকুক না কেন, সে দেশের লিখিত ভাষা ছিল বাঙ্গলা। বৌদ্ধ মগ ও মুসলমান উভয়ই বাঙ্গলা ভাষাকে তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে অঞ্চলে বৌদ্ধ ও মুসলমানগণের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। বৌদ্ধ-রাজারা অনেক সময়েই গুণী মুসলমান পাইলে তাহাকে প্রধান সচিব-স্বরূপ নিযুক্ত করিতেন এবং বাঙ্গলা ভাষাকে মাতৃভাষা জ্ঞান করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের লোকই সমান আদরে তাহার চর্চ্চা করিতেন। আবদুল হাকিমের 'নূরনামা' কাব্যে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন মুসলমান উর্দ্দুকে প্রাধান্য দিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে উপেক্ষা করিত, অথবা ইহার বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে চেষ্টিত হইত, তবে কবিরা উত্তেজিতভাবে সেই মাতৃভাষা-বিদ্বেষীকে রূঢ় ভাষায় তিরস্কার করিতে ছাড়িতেন না। রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হইলে আরাকানী মগেরা পর্ত্তুগীজ হার্মাদদের সঙ্গে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গ লুঠ করিত। সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যাদের প্রতি তাহাদের লোলুপ-দৃষ্টি বেশী পড়িত এবং হতভাগিনীদিগকে সহস্র সহস্র সংখ্যায় লুণ্ঠন করিয়া নিজ দেশে লইয়া যাইত। ভদ্র এবং ইতর শ্রেণীর শত শত মহিলার আর্ত্তনাদে পূর্ব্ববঙ্গ এক সময়ে মুখরিত ছিল। তাহাদের বিলাপ ও স্বামীর উদ্দেশ্যে করুণ-নিবেদন-জ্ঞাপক বাঙ্গলা ছড়া আমরা অনেকগুলি পাইয়াছি। বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 'মগী ব্রাহ্মণ' বলিয়া এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। মগদের সংশ্রবে এবং তাহাদের মহিলাদের বিড়ম্বনায় সেই সকল ব্রাহ্মণ একরূপ জাতিচ্যুত হইয়া আছে। শুধু ব্রাহ্মণ নহে, অপরাপর শ্রেণীর মধ্যেও মগদোষ-দুষ্ট পরিবারের অভাব নাই। এই মহিলারা আরাকানে নীত হইলে তাহাদের সংশ্রবে মগদের বাঙ্গলা ভাষার জ্ঞান ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধগণের পাণ্ডিত্য সর্ব্বত্র বিদিত। তাঁহারা সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা মুসলমান হইলেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভাষাগুলির সঙ্গে আরবী-ফারসীতেও কৃতবিদ্য হইলেন। এই জন্যই দৌলত-কাজি ও আলোয়ালের পাণ্ডিত্য আমাদিগকে বিস্মিত করে। কোন হিন্দু কবির কাব্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে ব্যুৎপত্তির এতটা পরিচয় নাই, যাহা আমরা আলোয়ালের "পদ্মাবতী'তে পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন—মাগন ঠাকুরের "আজ্ঞা পাইয়া রচিলাম গ্রন্থ পদ্মাবতী। যতেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি॥" শুধু বুদ্ধির নহে, এই কাব্যখানিকে বিদ্যার বারিধি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। হিন্দুদের ঘরের প্রত্যেকটি উৎসব ও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি যে সকল বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হিন্দুসমাজের বাহিরের কোন লোক লিখিতে পারেন একথা বিশ্বাসযোগ্য হইত না—যদি না আমরা এই ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতাম। তিনি প্রাকৃত পিঙ্গলের যে সূক্ষ্ম বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা সেই ভাষার কোন সুপণ্ডিত বৈয়াকরণিকের যোগ্য। তিনি আয়ুর্ব্বেদে এতটা অভিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন যে, তাহা কোন সাধারণ ভিষগাচার্য্য পারেন কিনা সন্দেহ। সমস্ত অলঙ্কার-শাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি নায়িকা-দিগের রূপভেদ বর্ণনা করিয়াছেন এবং দুর্গাপূজার এত সুবিস্তৃত উপকরণ ও অনুষ্ঠান-রীতির বিবরণ দিয়াছেন যে, আমরা ত দূরের কথা— কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্র না ঘাঁটিয়া তাহা বলিতে পারিবেন না। প্রশস্তি-বন্দনার ও অপরাপর উৎসবের অঙ্গীয় অনুষ্ঠানের ও জ্যোতির্বিদ্যার বিবৃতি বিস্ময়জনক। ইহাছাড়া তিনি ব্যায়াম, পলোখেলা, অশ্বারোহণের নানা কায়দার কৌতূহলপ্রদ বিবৃতি দিয়া কাব্যখানিকে পাণ্ডিত্যের বিজয়স্তম্ভ স্বরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে তিনি জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'-এর সুললিত পদগুলি ধ্বন্যাত্মক মাধুর্য্য অবিকৃত রাখিয়া বঙ্গানুবাদে পরিণত

করিয়াছেন এবং সংস্কৃতছন্দগুলি এরূপ নিপুণতায় সহিত বাঙ্গলা-ভাষায় গ্রহন করিয়াছেন যে—'আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য'—এই কথা বলিয়া আমাদের সমালোচনায় প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে হয়। মাঝে মাঝে সংস্কৃত-শ্লোক দিয়া নূতন অধ্যায়ের মুখবন্ধ করিয়াছেন, যথা—

"মূর্খস্য প্রতিমা দেবাঃ বিপ্র দেব হুতাশনঃ।
যোগিনাং প্রমথঃ দেবঃ দেব দেব নিরঞ্জনঃ॥"

আলোয়াল আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষায়ও অসাধারণরূপ প্রাজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু তিনি অকারণে বিদেশীয় ভাষার শব্দ দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার শ্রী নষ্ট করেন নাই। এই কাব্যে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু উহাতে অধ্যবসায়শীল পাণ্ডিত্য যতটা, কবিত্ব ততটা নাই।

এই কাব্যের সংস্কৃতাত্মক পদসমূহের নমুনা কিছু কিছু এখানে দিতেছি—

—১—

"আসিল শরৎ ঋতু নির্ম্মল আকাশে।
দোলায় চামর কেশ কুসুমবিকাশে॥
নবীন খঞ্জন দেখি বড় হি কৌতুক।
উপজিত দামিনী দম্পতি মনে সুখ॥
সুগন্ধী চন্দনে লেপিয়া কলেবর।
কুসমিত শ্বেতশয্যা অতি মনোহর॥"

—২—

"যুবজন-হৃদয়, আনন্দে পরিপূরিত,
রজনীলা মল্লিকা-মালতী-মালে।
মধু সেনাপতি সঙ্গে, মদন মেদিনী-পতি,
বাহিনী কোরক নব পল্লব-পূর্ণিত।
নবদন্ত কেশর, চামরিণী সৌরভে
ভুবনবিজয়ী চিত্ত, যুবক শাসিত॥"

"কুটিল করবী কুসুম-মাঝ।
তারকা-মণ্ডলে জলদ-সাজ॥
সুর-শশী দোঁহে সিন্দুর ভালে।
বেড়ি' বিধুন্তুদ অলকা-জালে॥
সুন্দরী কামিনী কাম-বিমোহে।
খঞ্জন গঞ্জন নয়নে চাহে॥
মদন ধনুক ভুরু বিভঙ্গে।
অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে বাণ তরঙ্গে॥
সুরঙ্গ অধর বান্ধুলী ফুল।
নাসা খগপতি নহে সমতুল॥
দশন মুকুতা, বিজলী হাসি।
অমিয়া বরষে আঁধার নাশি॥
উরস কঠিন হেম-কটোর।
হেরি মুনিজন-মনবিভোর॥
হরি করিকুম্ভ কটি-নিতম্ব।
রাজহংসী জিনি গতি বিলম্ব॥"

—৪—

"প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রত ঝঙ্কৃত, হুঙ্কৃত,
পরভৃত, কুঞ্জেরত বাসে।
মলয়-সমীর, সুসৌরভ,
বিলোলিত পতি, অতি রস-ভাসে॥
প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমাল
মুকুলিতা চূতলতা, কোরক-জালে

পাণ্ডিত্যের নমুনা এইরূপ—

৫—

"পিঙ্গলের মধ্যে অষ্টমহাগুণ-মূল।
তাহাতে মাগন আছে বুঝ কবিকুল॥
নিধি স্থির কল্প-প্রাপ্তি মগন ভিতর।
মগন মাগন এক আকার অন্তর॥
আকার-সংযোগে নাম হইল মাগন।
অনেক মঙ্গল-ফল পাইতে কারণ॥"

—৬—

"শুক্র, রবি, পঞ্চমীতে গমন কঠিন।
গুরুবারে সিদ্ধ নহে গমন দক্ষিণ॥
সোম, শনি পূর্ব্বে না যাইও কদাচন।
উত্তর মঙ্গল, বুধে অশুভ লক্ষণ॥"

* *

"ত্রিশ অষ্ট দিনে যোগিনী ফিরে বারে বার॥
এক, নব, ষড়দশ, চতুর্ব্বিংশ দিন।
পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে যোগিনীর চিন্॥
অষ্টাদশ, শত বিংশ, তিন, একাদশে।
সুনিশ্চিত যোগিনী দক্ষিণ দিকে বৈসে॥
দশ, পঞ্চবিংশ, সপ্তদশ দিনে।
যোগিনী দক্ষিণে থাকে পশ্চিমের কোণে॥
বার, উনবিংশ আর সাতাইশ চারি।
যোগিনী পশ্চিমে থাকে বুঝিবা বিচারি।
বিংশতি দিবস আর ত্রয়োবিংশ, বাণ।

উত্তর-পশ্চিম কোণে যোগিনীর স্থান।
পঞ্চদশ, ত্রয়োবিংশ, ষষ্ঠ আর ত্রিশে।
নিশ্চয় যোগিনী থাকে উত্তর দিকেতে॥
চতুর্দ্দশ, বিংশ, সপ্ত, উনত্রিশেতে।
যোগিনী পূর্ব্বেতে থাকে জানিও নিশ্চিতে॥"

এখানে কথা হইতেছে যে, ১৬৫২ খৃঃ অঃ হইতে ২৮৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা এই পুস্তক পড়িয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নহে, চট্টগ্রামে এখন 'পদ্মাবতী' গান করিবার দল আছে। তাহাদের আসর অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বেশ জমিয়া উঠে। পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছিল আরাকানে এবং তথাকার রাজ-দরবারে ইহা ব্যাপকভাবে গীত হইত। 'দেশীভাষা'য় লিখিত হওয়ায় উহা মগ, বৌদ্ধ ও মুসলমান জনসাধারণের তুল্যরূপ উপভোগ্য হইয়াছিল। এতদ্বারা কি ইহা বুঝা যায় না যে, যে-দেশের জনসাধারণ এই কাব্যখানির এতটা রস-বোদ্ধা ছিল, তাহারা এরূপ একখানি সংস্কৃতাত্মক কাব্য বুঝিতে পারিত। শ্রোতারা নিরক্ষর হইলেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু বংশপরম্পরা যদি কোনরূপ শিক্ষা দেশময় প্রচলিত থাকে, তবে সর্ব্বসাধারণ মোটামুটি পণ্ডিতী-লেখা বুঝিতে পারে। এই দেশে পূর্ব্বে যাত্রার গানে যেরূপ সমাস-বহুল পদ সাধারণ লোক বুঝিতে পারিত, তাহা বিস্ময়কর। কাশী-দাসী মহাভারত বুঝিতে না পারে, এমন হিন্দু নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও বিরল। অথচ ইহাতে—"অগ্নি অংশু যেন প্রাংশু আচ্ছাদিল মেঘে", "ভুজযুগ নিন্দি নাগে আজানু লম্বিত", "চলৎ চপলারূপে কিবা বর কায়া!", "দ্বিকর কমল, কমলাংঘ্রিতল" "নিষ্কলঙ্ক ইন্দুজ্যোতি, পীনঘনস্তনী"—প্রভৃতিরূপ লেখার ছড়াছড়ি।

দৌলত কাজি ও আলোয়াল প্রভৃতি কবির পুস্তকগুলির আরাকান ও

চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বহুল প্রচলন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা এই দুই ভাষাই এককালে পূর্ব্ব-ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এককালে গৌড় দেশ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল। গৌড়ের পাল-নৃপতিরা বাঙ্গালী ছিলেন। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা অক্ষর পূর্ব্ব-ভারতীয় উপদ্বীপসমূহ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। শ্যাম দেশে বাঙ্গলা রূপ-কথাগুলি যাইয়া সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। (Dr. Bijanraj Chatterji's 'Indian influence on Cambodia.')

আলোয়াল 'পদ্মাবতী' কাব্য ১৬৪৫—৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচনা করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়দাতা ছিলেন কোরায়সী মাগন; ইনি আরাকানের বৌদ্ধ-রাজা থডোমিণ্টারের প্রধান সচিব ছিলেন এবং নিজে ছিলেন মুসলমান। এই পুস্তকে সম্রাট আলাউদ্দিন ও পদ্মাবতী-ঘটিত কাহিনীটি অনেকটা রূপান্তরিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে (বাং ৯২৭ সালে) মালিক মহম্মদ জয়সী হিন্দী ভাষায় 'পদ্মাবৎ' কাব্য রচনা করেন। বাঙ্গলা-কাব্যখানি মূল হিন্দী-কাব্যের অবলম্বনে রচিত হয়। কিন্তু আলোয়ালের কাব্য ঠিক অনুবাদ নহে। ইহা কতকটা রূপকচ্ছলে রচিত হইয়াছে। তিনি উত্তর-পশ্চিমের দৃশ্য-পটটি যেন বাঙ্গলা দেশে আনিয়া নূতন করিয়া আঁকিয়াছেন এবং বাঙ্গালী-সুলভ বিষয়-বস্তু ও ভাব এই কাব্যে অজস্র আমদানী করিয়াছেন। কবি—শুজা বাদশাহের দলে ছিলেন, এইরূপ একটা মিথ্যা অপবাদের সৃষ্টি করিয়া মুজা নামক এক ব্যক্তি আরাকান রাজদরবারে অভিযোগ আনয়ন করে। তাহার ফলে কবি কিছুকালের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্ত হইয়া তিনি 'পদ্মাবতী'র শেষাংশ রচনা করেন (১৬৫১ খৃঃ অঃ)। তৎপর তিনি দৌলত কাজির 'সতী ময়না'র উত্তরাংশ (১৬৫৮ খৃঃ) এবং 'সয়ফুলমুলুক-বদীউজ্জমাল'-এর প্রথম খণ্ড (১৬৫৯ খৃঃ) এবং শেষাংশ সৈয়দ মুসার

আদেশে ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে রচনা করেন। ইহা ছাড়া তিনি 'হপ্তপয়কর' 'তোহ্‌ফা' (তত্ত্বোপদেশ) ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে এবং সর্ব্বশেষ "সেকেন্দর-নামা" রচনা করেন ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে। চট্টগ্রাম জেলায় জোব্‌রা গ্রামে এখনও কবির বাসভূমি আছে। সেই পল্লীতে তাঁহার বংশধরেরা এখনও বাস করিতেছেন ; তথায় কবির কবর ও দীঘি এখনও বর্ত্তমান।

কবি আলোয়ালের 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে কবি দৌলত কাজি চট্টগ্রাম রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর নিবাসী আরাকানের সমর-সচিব কাজি আশ্‌রাফ্‌ খাঁর আদেশে 'লোর চন্দ্রানী' নামক কাব্য রচনা করেন। লোর নামক কোন প্রণয়ী রাজকুমার—বামন নামক বলদর্পিত, নপুংসক, বৌদ্ধরাজের রাজ্ঞী চন্দ্রানীর প্রেমে পড়িয়া যান। চন্দ্রানীও তাঁহার স্বামীর অপরাপর গুণ থাকা সত্ত্বেও পুরুষত্বের শক্তি না থাকাতে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতেন। এই প্রেম-ব্যাপার-প্রসঙ্গে 'লোর-চন্দ্রানীর' বিষয়-বস্তু কবিত্বময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার রচনার নমুনা এইরূপ—

"কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ॥
কাঞ্চন-কমল-মুখে পূর্ণশশী নিন্দে।
অপমানে জলেত প্রবেশে অরবিন্দে॥
চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে।
মৃগাঙ্কশরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে॥
মদন-মঞ্জরী ভুরু কিবা শরাসন।
লুকি' গেল পুষ্প ধনু লজ্জার কারণ॥
পুষ্পশর জিনি নাশা শোভে বিদ্যমান।
লজ্জায় রহন্ত লুকি' যত কামবান॥

অধর বাঁধুলী-রুচি, কত মধু ভাষে
সুকুন্দ দশন পাঁতি মুকুতা প্রকাশে ॥
ঘনচয়-রুচি কেশ শিরেত শোভন।
প্রভা ছাড়ি ভানু যেন তিমির বরণ ॥
সুবর্ণ কণিকা কর্ণে মাণিক্য নূপুরে।
দোসর অরুণ দোলে চন্দ্রমার কোরে ॥
নির্ম্মল-রাতুল অঙ্গ কেতকী-সমান।
ভরমে ভ্রমর-পাঁতি ধরএ যোগান ॥"

দৌলত কাজি মহাভারতকার কাশীরাম দাসের প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু কাশীরাম দাস অপেক্ষাও কাজি সংস্কৃতাত্মক ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন। আরাকান রাজদরবারের আশ্রিত মুসলমান কবিরাই যে বঙ্গভাষার সংস্কৃতাত্মক রচনার যুগ-প্রবর্ত্তন করেন, তাহা এই সকল দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন হইতেছে। দৌলত কাজি ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'সতী ময়না' রচনা করেন। সম্ভবতঃ অল্পবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি রাজা সুধর্ম্মার রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

কবি আলোয়াল তাঁহার আশ্রয়দাতা মাগন ঠাকুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"আরবী, ফারসী আর মঘী, হিন্দুস্থানী।
নানা গুণ-পারগ, সংগীত-জ্ঞাতা গুণী ॥
কাব্য-অলঙ্কার জ্ঞাত হস্তেক নাটিকা।
শিল্প-গুণ, মহৌষধি নানাবিধ শিক্ষা ॥"

মাগন ঠাকুর নিজেও একজন তৎকাল-প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত 'চন্দ্রাবতী' একখানি উল্লেখযোগ্য বাঙ্গলা কাব্য। কবি আরাকানের বৌদ্ধরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার (১৬৫২—১৬৮৪ খৃঃ অঃ) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইহার মুসলমানী নামটি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ইহার পিতা

মাতা বহু সাধনায় ঈশ্বরের নিকট মাগিয়া ইহাকে পাইয়াছিলেন। এইজন্যই মাগন নামে ইহার পরিচয়। মাগন অর্থ—ভিক্ষা।—ডক্টর এনামুল হক্ বলিয়াছেন—"রোসাঙ্গের রাজসভার কবিরা বাঙ্গলা কবিতাকে শুধু বাঙ্গলার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া ইহাকে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাদেশিকত্ব দূর করিয়া হিন্দুস্তানের সকল দেশের ভাষার সঙ্গে সংযোগ-সূত্রে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন।" *

'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য' ৭২—৭৩ পৃঃ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলা ভাষার সার্ব্বভৌমকত্ব ও পল্লী-সাহিত্যের ভাব-গভীরতা

কবি আলোয়াল হিন্দুস্থানী ভাষা হইতে 'পদ্মাবতী' অনুবাদ করিয়াছিলেন। দৌলত কাজি ১৬২২ হইতে ১৬৩৮ খৃঃ মধ্যে গোহারী দেশের 'ঠেঠ হিন্দী ভাষায়' সাধন নামক কবি-রচিত একখানি কাব্যের অনুবাদ প্রণয়ন করেন, ইহাই তাঁহার 'সতী ময়না'। দৌলত কাজির আশ্রয়দাতা আশ্‌রাফ খাঁ কবিকে আদেশ করিয়া বলিলেন—

"ঠেঠা চৌপাইয়া দোহা কহিল সাধনে।
না বোঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে বুঝিয়া যেন পড়এ সানন্দে॥"

মাগন ঠাকুরও এই যুক্তি দেখাইয়া আলোয়ালকে হিন্দী ভাষা হইতে 'পদ্মাবৎ' দেশী ভাষায় তর্জ্জমা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরাকান রাজসভার এই সকল কবিরা আরবী, ফারসী হইতে বহু গ্রন্থ বাঙ্গলা পয়ারে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা একথাটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও আসাম, ত্রিপুরা, কোচবিহার, মণিপুর হইতে নাফ্ নদীর তীরবর্ত্তী আরাকান প্রদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বাঙ্গলা ভাষা 'দেশী ভাষা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরাকানের বৌদ্ধ-রাজারা এই ভাষায় নানা ভাষা হইতে কাব্যাদির অনুবাদ করাইয়া ভারতবর্ষের ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গলা ভাষাকে সার্ব্বভৌমিকত্ব দিতে প্রয়াসী

হইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বতীর্থের জল দিয়া এই ভাষা-লক্ষ্মীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। আরাকানের রাজদরবার বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান বিরচিত বাঙ্গলা কাব্যের অন্যতম মুখ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, কি পূর্ব্ববঙ্গে, কি পশ্চিম রাঢ় দেশে, প্রাচ্য বঙ্গের সীমান্তে আরাকানে বা চাক্‌মা রাজ্যে, ভাগীরথী, পদ্মা ও কর্ণফুলীর তীরে, এক কথায় পেগু হইতে আসাম পর্য্যন্ত একটি বৃহৎ জনপদ বঙ্গীয় লেখকগণের তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। আত্মপরিচয়, ইতিহাস ও ভূগোলের নাম নির্দ্দেশক স্থানগুলি বাদ দিলে এই বিশাল সাহিত্য একই লক্ষণাক্রান্ত। না বলিয়া দিলে গ্রন্থকার হিন্দু, মুসলমান, কি বৌদ্ধ তাহা চেনা যাইবে না,—ইহাই আমাদের সাহিত্যের এক জাতীয়ত্ব। 'জৈমুনী ভারত'-এর অনুবাদক শ্রীকরণ নন্দী চট্টগ্রাম হইতে আশ্রয়দাতা ছুটি খান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয়॥
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিলাস-হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র-গমন॥
চতুঃষষ্ঠী কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবী-বিখ্যাত সে-যে নির্ম্মাইল বিধি॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, গাম্ভীর্য্যের নাহিক উপমা।"

'পদ্মাবতী' কাব্যে কবি আলোয়াল তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"দুর্ব্বাদল-শ্যাম তনু, মুখ পূর্ণচন্দ্র।
দেখিয়া সুহৃদজন হৃদয় আনন্দ॥

সুন্দর মগধ-পাগ মস্তকে শোভিত।
নব-মেঘ জিনি জেন চন্দ্রমা উদিত॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি ললাট শ্রীখণ্ড।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ভুরু কামের কোদণ্ড॥
গৃধিনী নিন্দিত চারু শ্রবণ যুগল।
শুক-চঞ্চু জিনি ভাল নাসিকা কোমল॥
মৃদু মন্দ মধুর সুন্দর মুখে হাসি।
সুধারস-মিশ্রিত চপলা সুপ্রকাশি॥
দশন মুকুতা-পাঁতি অধর বাঁধুলী।
মধুর সুস্বর ভাষে কোকিল-কাকলী॥
কম্বুবর জিনিয়া কণ্ঠের পরিপাটী।
নির্ম্মল সুচারু বক্ষ সিংহ জিনি কটি॥
চন্দনের কুন্দে যেন কুন্দিল কন্দর্পে।
শত্রুবর্গ নাশ হয় ভুজযুগ দর্পে॥
সুকোমল করতল পদ্ম—নাল তুল।
চম্পককলিকা জিনি সুন্দর আঙ্গুল॥"

এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণে বীরবাহুর যে যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে কবি চন্দ্রশঙ্করের লেখা। তিনি আলোয়ালের প্রায় সমসাময়িক কবি। তিনি বীরভূমে বসিয়া রামের রূপ-বর্ণনা এইভাবের করিয়াছিলেন—

"গজপৃষ্ঠ হৈতে বীর নেহালে শ্রীরাম।
কপটে মনুষ্যদেহ দুর্ব্বাদল শ্যাম॥
চাঁচর চিকুর শোভে, চৌরস কপাল।
প্রসন্ন শরীর রাম পরম দয়াল॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর।
ভুবন মোহন রূপ শ্যামল সুন্দর॥
রামের হাতের ধনু বিচিত্র গঠন।
সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ॥”

কাশীরাম দাস বর্দ্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে বসিয়া অর্জ্জুন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

“দেখ দ্বিজ, মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্ম-পত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ-রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।
ভুজযুগ নিন্দি নাগে আজানু-লম্বিত।
করিবর জিনি দুই বাহু সুবলিত॥
কিবা চারু যুগ্ম-ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥”

সুতরাং মনে হইবে—এই বিরাট্ বাঙ্গলা সাহিত্য-এক পরিবারভুক্ত, ভাষা ও ভাবে নাফ্ নদীর তীর ও ভাগীরথী-কূল একই জাতিত্বের চিহ্ন বহন করে। এই সকল কাব্য যে সর্ব্বদাই হিন্দু-নায়ক সম্পর্কিত, তাহা নহে। মুসলমানী বিষয়, যথা—মোহর্‌রম, হাসান-হুসেন প্রভৃতি লইয়াও বহু কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। বিদেশী ভাষায় যথেষ্ট অধিকার সত্ত্বেও কবিরা বাঙ্গলা ভাষার বিশুদ্ধতা ও বিশেষ রীতিটির খেই হারান নাই। ‘বৌদ্ধ-রঞ্জিকা’ নামক বাঙ্গলা পয়ারে লিখিত প্রাচীন বুদ্ধ-জীবনীও সেই একই ভাবে লিখিত। মোল্লা ও উৎকট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উর্দ্দু ও সংস্কৃতের আবর্জ্জনা আনিয়া বাঙ্গলা ভাষার যে দুর্গতি করিয়াছিলেন—হিন্দু-পণ্ডিতের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার তাঁহার ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’য় যে গদ্যের নমুনা দিয়াছেন

এবং একজন মৌলবী তাঁহার তথাকথিত বাঙ্গলা রচনায় আমাদের ভাষার যে দুর্গতি করিয়াছেন, তাহার নিম্নলিখিত দুইটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে আপনারা বুঝিবেন যে, অতিশয় পাণ্ডিত্যে মানুষের বুদ্ধিলোপ পায়। মৃত্যুঞ্জয় লিখিয়াছেন—"অনভিব্যক্ত বর্ণাধ্বনি মাত্র রাজা পরানাম্নী ভাষা প্রথমা যেমন কুমারদেব ভাষা। তদনন্তর বর্ণমাত্রা পশুন্তী নামক যেমন প্রাপ্ত কিঞ্চিদ্বয়স্ক বালক-বাণী। তৎপর পদমাত্রাত্মক মধ্যমবিধা ভাষা যেমন পূর্ব্বোক্ত বালকাধিক কিঞ্চিদ্বয়স্ক শিশুভাষা। তৎপর বৈখরী নামধেয়া সকল শাস্ত্র-স্বরূপা বিবিধ জ্ঞান-প্রকাশিকা সর্ব্বব্যবহার প্রদর্শিকা চতুর্থী ভাষা যেমন লৌকিক শাস্ত্রীয় ভাষা। ঈদৃশরূপে জাতমাত্র বালকের উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধি-ক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্দ্ধমানত্ব রূপে যগুপি প্রতীয় মানা হউন তথাপি পূর্ব্বোক্ত পরা পশুন্তী মধ্যমা বৈখরী রূপ চতুর্ব্যূহরূপে বর্ত্তমান আছেন।"

মুসলমানী-বাঙ্গলা বলিয়া এক প্রকার উৎকট বস্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের এক কোণে একটা বিরাট পাথরের স্তূপের মত পড়িয়া আছে। তাহার ভাবার্থ মৌলবীরা বুঝিবেন। বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান তাঁহাদের মাতার মুখে যে ভাষা শুনিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছেন, এ ভাষা তাহা নহে। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি—"সাহাজাদি সখি সোনা সোনার মধ্য হইতে পয়দা হইবার বিবরণ, উজির নন্দনের মানিক পয়দা হইবার বয়ান, বাদসাহ ও উজির ফরজন্দের মুখ দেখিয়া খুসির মজলেছ করে এবং পীরের দোয়ায় মাণিক জিন্দা হয় ও দোবারা মালিনীর হাতে আফ্‌তে গিরিবার বয়ান।" *

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে অথবা তৎসন্নিহিত কোন বৎসর রাণী কালিন্দী চক্‌মা-রাজ ধরম বক্‌স্‌-এর সঙ্গে পরিণীতা হন, এই ধরম বক্‌স হিন্দুধর্ম্মের

* মোহাম্মদ কোরবান আলী কৃত—'সখী সোনা'।

প্রতি বিশেষ অনুরক্ত থাকিলেও ইহারা পুরুষপরম্পরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইহাদের অনেক অনুশাসন ও খোদিত-লিপি পাওয়া গিয়াছে, সমস্তই বাঙ্গলা। রাণী কালিন্দী একটি বৌদ্ধ-মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার প্রস্তর-লিপি বাঙ্গলা ভাষায় রচিত, রাণী কালিন্দীর বাঙ্গলা অক্ষর মুক্তার ন্যায় সুন্দর। চক্‌মা রাজ-পরিবারের ভূমি-দান-পত্র ও অপরাপর দলিল দেখিলে বুঝা যায়—এই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য চক্‌মা রাজ্যটি হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ত্রিবেণী-সঙ্গম স্বরূপ ছিল, বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্ব-প্রান্তে বৌদ্ধ ও মুসলমান কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশি করিতেন। পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের ভাবে রাজ্যটি যেন ভরপুর ছিল।—ইহাদের দলিল গুলিতে কিছু উর্দ্দুর প্রভাব আছে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গলা ভাষা ততটা দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিসাবে মোল্লা, বামুন-পণ্ডিত ও ফুঙ্গীরা সাহিত্য ও ভাষাকে যেরূপ ভাবেই খণ্ড খণ্ড ও বিকৃত করুন না কেন, এদেশে যাঁহারা এক নীলাম্বর তলে একই কোকিলের ডাক শুনিয়া, একই নির্ঝরের জল পান করিয়া, একই কথায় মনোভাব জ্ঞাপন পূর্ব্বক মানুষ হইয়াছেন, তাঁহাদের দেশ এক, ভাষা এক,জাতি এক—সেই ভাষার নাম বঙ্গভাষা, সেই দেশের নাম বাঙ্গালা দেশ এবং সেই জাতীর নাম বাঙ্গালী। ইহাদের কেহ কেহ মূরদেশ কি আরব হইতে আসুন, কিংবা কাঞ্চী, দ্রাবিড় ও কনোজ হইতে আসুন এবং তাঁহাদের মস্তিষ্কের পরীক্ষা করিলে তাহাতে টিবেটো, বার্ম্মন, দ্রাবিড় বা মোঙ্গলিয়ান উপাদান ধরা পড়ুক না কেন, তাঁহারা বহুকালের জল-মাটীর গুণে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অন্য কিছু বলা চলে না। বিলাতী আমড়া ও বিলাতী আলুতে এখন বিলাতের গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। বরঞ্চ নানাশ্রেণীর পরদেশী জাতির মিশ্রণে যদি বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে বিবিধ শ্রেণীর লোকের গুণ আমাদের জাতিতে ফলপ্রসূ হইয়া বাঙ্গালী চরিত্রের

অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়াছে—যাহাতে আমরা অনেক বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দিতা লাভ করিয়াছি।

আমরা দেখিতে পাইতেছি. মুসলমানী-বাঙ্গলায় লিখিত বটতলার শত শত পুস্তক বাদ দিলেও বঙ্গসাহিত্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় লিখিত মুসলমান কবিদের কাব্যের সংখ্যা অল্প নহে,—আরাকানের এই মগের মুলুকেও চৈতন্ত দেবের খোল-করতালের ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলীর সুরটি যেখানে বঙ্গভাষা-ভাষী লোক ছিল, সেখানেই লোকের কানে বাজিয়া তাহাদিগকে আবিষ্ট করিয়াছিল। ব্রজবুলির কোমল-কান্ত পদাবলী প্রেমবর্ণনার সময় বাঙ্গালী কবিদের সকলকে আকর্ষণ করিয়াছে। অনেক কবি আরাকান রাজ-সভায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে পদ-রচনা করিয়াছিলেন। আলোয়ালের উক্তরূপ পদ আমরা পাইয়াছি।* কবি দৌলত কাজি 'লোর-চন্দ্রানী' কাব্যে নায়ক-নায়িকা সম্পর্কিত কাহিনীতে ব্রজবুলির সুরটি লাগাইয়া কাব্যের মিষ্টত্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন। দৌলত কাজির 'সতী ময়না'য় ব্রজবুলিতে লিখিত অনেক পদ আছে। তাহার একটি স্থান এইরূপ—

"শাওন গগনে সঘনে ঝরে নীর।
তড়িঞ আছুন জুরাএ এ তাপ শরীর॥
মালিনী কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনু বাসহি বিহি ভেল মোর।
মদন আসক জিনি বিজুরীর রেহ।
থরকায় রজনী কম্পএ দেহ।
ন বোল ন বোল ধাই অনুচিত বোল।
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল॥

* 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ষষ্ঠ সংস্করণ।

লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ।
কোথায় গোময়-কীট, কোথায় মধুপ ॥*

বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরীর চরণের রুনুঝুনু এইভাবে কর্ণফুলির উপান্তভাগে মগের-রাজ্যে শুনিয়া আমাদের মনে অনাবিল একটা আনন্দ হয় যে, যে-সকল মুখ্য-প্রভাবে বাঙ্গলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে—সুদূর পূর্ব্বের বঙ্গসাহিত্যও তাহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। 'ইউসুফ ও জোলেখা' নামক কাব্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রাচীনতমখানি ১৭৩২ খৃঃ অব্দে লিখিত। ইহাতে মগী সন ১০৯৪ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বইখানি যে আরাকান রাজ্যের প্রভাবান্বিত তাহা অনুমান করা যায়। কবি শাহ্ মোহাম্মদ সগীরের লেখায় চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'-এর প্রভাব স্পষ্ট। তাঁহার—"প্রথম বরিখ স্বপ্ন দেখাইল ছল।"—প্রভৃতি স্বপ্ন-বৃত্তান্তের ভাব ও ভাষা চণ্ডীদাসের—"দেখিলোঁ প্রথম নিশি, স্বপন শুনতে বসি।" প্রভৃতি পদের অনুরূপ। "শুন শুন সখি, যার তরে হইলুঁ দুখী, প্রাণের সখি ল।"—প্রভৃতি পদটি 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'কে স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং বৈষ্ণব কবিগণের পদ-লহরী যে আরাকান-সীমায় বহুলরূপ পঠিত হইত, তাহার নিদর্শন আছে।

বাঙ্গালী যে যে-যেখানে যাইয়া তাহার মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে, আমরা তাহার প্রতি প্রীতি নিবেদন করিতেছি। বৌদ্ধ পাল-রাজাদের রাজত্ব-কালে বাঙ্গলা ভাষার প্রভাব দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং বাঙ্গলার চিত্র-কলা ও ভাস্কর্য্য যাভা, বালি প্রম্বনম্ ও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ডক্টর সিলভ্যাঁ লেভির পুস্তকের ক্যাটালগে' একখানি চিত্র-বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকে গ্রন্থকার তাঁহার বাঙ্গালী গুরুকে বন্দনা করিয়া পুস্তকখানির মুখবন্ধ করিয়াছিলেন।

এবার আমরা বঙ্গসাহিত্যে অবদানের যে তালিকা দিলাম, তাহা অল্প নহে এবং তাহা গুণগরিষ্ঠও বটে। আমরা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে দৌলত কাজি ও আলোয়াল কবির কাব্যের কথা মাত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু ডক্টর এনামুল হক্ সাহেবের গবেষণার ফলে আরও অনেকগুলি কবির সন্ধান মিলিয়াছে – সংস্কৃত সুললিত শব্দ বঙ্গসাহিত্যে আমদানী করিবার কৃতিত্ব প্রধানতঃ আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিদের। এই ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের বাহাদুরীই সর্ব্বজন স্বীকৃত, কিন্তু উক্ত কবির 'বিদ্যাসুন্দর'-এর—ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে (১৭৫২খৃঃ) আলোয়ালের 'পদ্মাবতী' (১৬৫২খৃঃ) ভগীরথের ন্যায় খাদ কাটিয়া সেই শ্রুতিমধুর ধারাটি বহাইয়া দেয়। সুতরাং তিনিই সংস্কৃত শব্দ-বহুল কাব্যরচনার ক্ষেত্রে অগ্রদূত, তাঁহার পূর্ব্বে কাশীদাসের 'মহাভারত'-এ ও মানিক রায়ের 'ধর্ম্মমঙ্গল'-এ এইরূপ সংস্কৃত শব্দাবলীর একটা সুর শোনা গিয়াছিল, কিন্তু আলোয়াল ওস্তাদ গায়কের ন্যায় সংস্কৃত আভিধানিক-বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া যে উচ্চ মধুবর্ষী সুর-লহরীর সৃষ্টি করিলেন, তাহা পরবর্ত্তীকালে সমস্ত বঙ্গসাহিত্যকে তরঙ্গায়িত করিয়া ফেলিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—মুসলমান কবিরাই এক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়াছিলেন।

এপর্য্যন্ত সৈয়দ মর্ত্তুজা, শেখ কমরালী, নসির মাহ্মুদ, ফকির হবিব, শেখ ফতর্ণ, শেখ জালাল, শেখ ভিকন, শেখ লাল, সালেহ্বেগ প্রমুখ কয়েকজন মুসলমান কবির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী আমরা আবিষ্কার করিয়াছিলাম। পূর্ব্বোক্ত কবিগণ ছাড়াও অন্যান্য মুসলমান কবিদের সেইরূপ পদ পাইয়াছি, কিন্তু ডক্টর এনামুল হক্ ষাট-সত্তর-জন মুলসমান পদকর্ত্তার সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন,—কারবালার যুদ্ধ-ক্ষেত্রের করুণ কাহিনী, লায়লী মজনু, জ্ঞান-প্রদীপ প্রভৃতি যোগশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় কতকগুলি পুঁথি আমরা পাইয়াছি। ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ

বিজয়'এ- যোগ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি কথা আছে. গোরক্ষনাথ—গুরু মীন নাথকে যে একত্রিশটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে যোগের অনেক গূহ্য কথার ইঙ্গিত আছে. আমরা তদ্দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরাও অজপা প্রভৃতি হঠযোগের পারিভাষিক শব্দের অর্থ জানিত। এই সমস্ত কঠিন প্রশ্ন সমাধানকালে তাহারা যে উচ্চ-চিন্তার পরিচয় দিয়াছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য—"প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে জ্যোতি কোথায় চলিয়া যায় ? শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্র উহার ধ্বনি কোন মহাসমুদ্রে লীন হইয়া যায় ?" এইরূপ প্রশ্ন বঙ্গীয় কৃষকগণের মনে জাগিত. ইহা কম বিস্ময়ের বিষয় নহে। কৃষক জিজ্ঞাসা করিতেছে—

"কোন্ খানেতে আছে আমার বিনা ধানের খই।
কোন্ খানেতে আছে আমার বিনা দুধের দই ॥
কোন্ খানেতে আছে আমার বিনা পাটের দড়ি।
কোন্ খানেতে আছে আমার বিনা বাঁশের নড়ি ॥
আছমান যবে নাহি ছিল কোথা ছিল চন্দ।
পুষ্প যবে নাহি ছিল কোথা ছিল গন্ধ ॥
বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি,
তার মধ্যে কোন্ জন বৈসা করে কেলি ॥"

এই ভাবের গূঢ় রহস্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক চিন্তা যাহার প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যে হঠযোগের প্রতিপাদ্য সমস্যা-সমাধান আছে, তাহা আর কোন্ দেশের কৃষক করিতে পারে ? 'বার বুরুজ' আর 'তের কামান'ই বা কি এবং 'বায়ান্ন বাজার' ও 'তেপ্পান্ন গলি'ই বা কি—তাহা হঠযোগীর তপস্যালব্ধ দেহ-তত্ত্বের জ্ঞান এবং এদেশের হিন্দু-মুসলমান চাষারা পর্য্যন্ত তাহা জানিত। ইহাই বাঙ্গালা দেশের বিশেষত্ব এবং এই জন্যই বাঙ্গালী আমার নিকট শ্রদ্ধেয় এবং জনসাধারণ শুধু আমার অন্তরঙ্গ ও প্রিয় নহে, গৌরবের পাত্র।

মৃজা হুসেন আলি * ও গোলমাহ্‌মুদ প্রভৃতি মুসলমান কবিরা অনেক শাক্ত-সঙ্গীত প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বেহুলার ভাসানের গায়ক ও কবি মুসলমানদের মধ্যে অনেক ছিলেন। শত শত বাউল ও মুরশিদা গানে বঙ্গের পল্লীগুলি মুখরিত, তাহাদের অধ্যাত্ম-সম্পদ বঙ্গসাহিত্যের গৌরবেরর বস্তু। মাণিক পীর, কালু-গাজি ও চম্পা—সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের দেবতার সঙ্গে কালু-গাজির যুদ্ধ, এই সমস্ত নানা কাব্য ও গানে পল্লী-সাহিত্য সমৃদ্ধ। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের প্রচুর অবদান উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহাদের ইতিহাস বাদ দিলে ভাবী বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস একান্তভাবে পঙ্গু হইয়া পড়িবে।

ডক্টর এনামুল হক্ লিখিয়াছেন—"পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থান হইতে বিশেষতঃ চট্টগ্রামের সর্ব্বত্র আরাকান রাজ-সভাকবিদের পুস্তকের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হওয়াতে প্রমাণিত হইতেছে যে—পূর্ব্ববঙ্গে আরাকান রাজ-সভাকবিদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই যুগের কোন কোন কাব্যের পাণ্ডুলিপি হিন্দু লিপিকারের দ্বারা লিখিত। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যগুলি হিন্দুদের নিকটও সমাদর লাভ করিয়াছিল।" *

রোসাঙ্গের অপরাপর কবিদের কথা এখানে সংক্ষেপে বলিয়া যাইতেছি, আপনারা এনামুল হকের পুস্তকে তাঁহাদের বিস্তৃত পরিচয় পাইবেন।

(১) **কবি মর্দ্দন**—ইনি দৌলত কাজির সমসাময়িক এবং রাজা সুধর্ম্মার সময় (১৬২২-৩৮ খৃঃ) বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার রচিত পুস্তকের নাম সম্ভবতঃ 'নছির নামা।' আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই সকল কাব্যে আমরা সুপরিচিত হিন্দু-কবিদের সুরটি মাঝে মাঝে পাইতেছি। 'নছির নামা' মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী'র ন্যায় একটা প্রাচীন পল্লী-কাহিনী ভাঙ্গিয়া রচিত।

* 'কহে মৃজা হুসেন আলী, যা করেন মা জয়কালী'

* 'আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গলা সাহিত্য' ৬৮—৬৯ পৃ;

(২) **শমসের আলি**—কাব্যের নাম 'রিজওয়ান শাহ'। ইনিও দৌলত কাজির সমকালবর্ত্তী। দৌলত কাজির মৃত্যুর পরে ইনি রোসাঙ্গে আসিয়া কবি-যশঃ লাভ করিবার প্রত্যাশায় তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। 'রিজওয়ান শাহ' কাব্যও একটা প্রাচীন পল্লী-গীতিকার পুনরাবৃত্তি। বাঙ্গালী কবি বিদেশী বিষয়ের অনেক স্থানেই বাঙ্গালা-সুলভ নর-নারীর প্রকৃতি, এমন কি কয়েকটি বাঙ্গালী নায়ক-নায়িকার কথাও যোগ করিয়াছেন।

(৩) **মোহাম্মদ খান**—ইনি বহু কাব্য প্রণেতা, যথা—'মকতুল হোসেন'. 'কাসেমের লড়াই,' 'দজ্জালের বয়ান', 'হানিফার পত্র পাঠ', 'কেয়ামত নামা' ইত্যাদি। 'কেয়ামত নামা' ১৩৪৬ খৃঃ অব্দে লিখিত। ইনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। এনামুল হক্ লিখিয়াছেন—"মকতুল হোসেন' এক সময়ে চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে মোহররমের সময় সুর করিয়া দল বাঁধিয়া পড়া হইত।" * এই পুস্তকের ভূমিকায় কবি মুসলমান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের একটি প্রাচীন কাহিনী দিয়াছেন।

(৪) **আবদুল নবী**—ইনি ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে ফারসীতে লিখিত—"দাস্তানে আমির হামজা" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিরাট আশীপর্ব্বে সম্পূর্ণ 'আমির হামজা' কাব্য রচনা করিয়াছেন। পরের জিনিষ যে অবস্থায় থাকে, ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করা বাঙ্গালী কবিদের ধর্ম্ম নহে। তাঁহারা অন্যস্থান হইতে কাব্য-কথা কুড়াইয়া আনিলেও তাহাতে স্বীয়-বৈশিষ্ট্যের রাজকীয়-ছাপ মারিয়া তাহা একবারে নিজস্ব করিয়া প্রচার করেন। এই কাব্যেও বাঙ্গালী কবির সুরটি ফারসীর বিষয়-বস্তুর বর্ণনা ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তাহা যেমনই করুণ, তেমনই বাঙ্গালীত্বময়।

* 'আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গলা সাহিত্য' ৭৩ পৃঃ

(৫) **সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর**—জন্ম ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দ। এনামুল হক্ লিখিয়াছেন—"মোহাম্মদ আকবর রচিত 'জেবল মুলুক শামারোখ' কাব্য বটতলায় ছাপা হইয়া বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে ঘরে সমাদৃত হইতেছে। এই সুবৃহৎ কাব্য একটি পল্লী-কথা বিষয়ক।" সেই চিরশ্রুত, সনাতন কাল হইতে যাহা কবিরা আশ্রয় করিয়াছেন—প্রেম। ছাপার পুঁথিতে ইহার পত্র সংখ্যা ১৬৮. কবি তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

(৬) **মোহাম্মদ রাজা**—ইহার দুইখানি কাব্য 'মিছরি জামাল' ও 'তমিম গোলাল'—দুইটিই প্রেম-কাহিনী। শেষোক্ত পুস্তক বটতলা হইতে ছাপা হইয়াছে। স্থানে স্থানে বর্ণনার আতিশয্যে আরব্য উপন্যাসের রাজ্যকেও ছাপাইয়া যায়। কোন ক্রুদ্ধা রাজ্ঞীর বর্ণনা এইরূপ—

"রাণীর আকৃতি দেখি বিদরে পরাণ,
নাকের সোয়াস যেন বৈশাখী তুফান।
চরণ ঝাপটে মাটি উঠে উর্দ্ধ মুখে।
দশ মোণ সোনার নথ সে নারীর নাকে।
আশী গজ শাড়ী রাণী কোমরে পিন্ধিয়া,
বিশ মোণ রূপার হাসলি গলে দিয়া।"

এই বর্ণনা পড়িয়া পাঠকের হৃদয়ে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে না। এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের বীরসিংহ রাজার রাজ্ঞীর ক্রোধাভিনয় মনে পড়ে—

"কোপে রাণী ধায় রড়ে, আঁচল ধরায় পড়ে,
আলু থালু কবরী বন্ধন
চক্ষু ঘোরে যেন পাক, হাত নাড়া ঘন ডাক
চমকে সকলে পুরজন!

শয়ন মন্দিরে রায়, বৈকালিক নিদ্রা যায়,
সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী আইসে ক্রোধ মনে, নূপুরের ঝন ঝনে
উঠে বৈসে বীরসিংহ রায়।”

এ-যেন দেও-দৈত্যের সমাজ হইতে মনুষ্য-লোকে অবতরণ।

(৭) **মোহাম্মদ রফীউদ্দিন**—ইহার রচিত ‘জেবল মুলুক শামারোখ’—পল্লী-কথা লইয়া প্রেম কাব্য। ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে মোহাম্মদ আকবর যে কাব্য লিখিয়াছিলেন, সেই বিষয় লইয়া ইনিও কাব্য রচনা করেন, কিন্তু তাঁহার রচনার কোন তারিখ পাওয়া যায় নাই; সুতরাং কে আগে কে পরে লিখিয়াছেন—তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

(৮) **শের রাজ**—ইহার দুইখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে—একখানির নাম ‘মল্লিকার হাজার সওয়াল’—ফারসী ‘ফক্কর নামা’ অবলম্বনে লিখিত এবং অপরখানি ‘কাসেমের লড়াই’—অবশ্য কারবালার ব্যাপার লইয়া লিখিত।

(৯) **সেখ সাদী**—ইহার ‘গদা মল্লিকার পুঁথি’—সেই ‘ফক্কর নামা’ অবলম্বনে লিখিত। ইহা শের রাজের কাব্যের মতই আর একখানি পুঁথি।

(১০) **আবদুল আলীম**—ইহার ‘হানিফার লড়াই’—সেই এজিদ, সেই ইমাম হুসেন, সেই কারবালা—এই প্রসঙ্গ পুরাতন হইয়া নিত্য নূতন অশ্রুর অর্ঘ্য পাইয়া চিরজীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

(১১) **আবদুল হাকীম**—ইহার রচিত ‘লালমতী সয়ফুল মুলুক’ বটতলা হইতে ছাপা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ‘ইউসুফ জোলেখা’ ও ‘নূর নামা’ তিনি প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রকাশিত কাব্যখানি

মুসলমান পাঠকদের কাছে আদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু তিনি যদি আর কিছু না লিখিতেন—মাতৃভাষা-বিদ্বেষীদের প্রতি তিনি যে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন এবং আমি যাহা এই বক্তৃতার সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছি - সেই কয়েকটি শ্লেষাত্মক-চরণের জন্য আমরা আজ তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতাম, যদিও তাঁহার কঠোর ভাষা আমরা কখনই অনুমোদন করি না।

রোসাঙ্গের সংশ্লিষ্ট এই সকল কবি ছাড়াও বহু মুসলমান কবি বাঙ্গলা ভাষায় কাব্য লিখিয়াছেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা ফারসী সাহিত্যের মোহিনীতে মশ্‌গুল ছিলেন, তাঁহারা সেই সকল বিদেশী ভাণ্ডার হইতে অপর্য্যাপ্তভাবে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার মর্য্যাদা হানি করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় উর্দ্দু শব্দ দ্বারা মাতৃ-ভাষা কণ্টকিত করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও কবিত্ব থাকিলেও কবিতা কাননের সেই সকল পদ্ম-কাঁটার ভয়ে কেহ কুড়াইতে পারিতেছেন না। সেই বিকৃত-সাহিত্য বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া পঞ্জিকার জরাসুরের মূর্ত্তির মত এক স্বতন্ত্র স্থানে থাকিবে, তাহা বাঙ্গালার সর্ব্বসাধারণ গ্রহণ করিবেন না।

বটতলার বিস্তব কাহিনীমূলক মুসলমান কৃত কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে কয়েক খানির মাত্র নাম এখানে উল্লেখ করিব—

১। 'চন্দ্রাবলীর পুঁথি'—মুন্সী মোহাম্মদ আবেদ বিরচিত, ১৫৫নং দরজিপাড়া মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। 'মধুমালার কেচ্ছা,'—খোন্দকার জাবেদ আলি রচিত, ১৫৫নং দরজিপাড়া মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। 'মালঞ্চ কন্যার কেচ্ছা'—মুন্সী আয়জুদ্দিন রচিত, ৩৭৭নং চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

৪। 'জরাসুরের পুঁথি'—মুন্সী এনায়েতুল্লা সরকার রচিত, ১৫৫নং মসজিদ বাড়ী, কলিকাতা।

৬। 'সত্য বিবির কেচ্ছা'—মুন্সী আয়জুদ্দিন রচিত, ৩৩৭নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

৬। 'মালতী কুসুম মালা'—মোহাম্মদ মুন্সী রচিত, ১৫৫নং মসজিদ বাড়ী, কলিকাতা।

৭। 'কাঞ্চন মালার কেচ্ছা'— ঐ ঐ

৮। 'সখী সোনা'—মোহাম্মদ কোরবান আলী রচিত, ১৩৮নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯। 'যামিনী ভান'—মোহাম্মদ খাতের মরহুম রচিত, ১৫৫।১নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০। 'ইন্দ্র সভা'—মুন্সী আমানত মরহুম রচিত, ৩৩৭নং চিৎপুর।

১১। 'শীত বসন্তের পুঁথি'—মুন্সী গোলাম কাদের রচিত, ১৫৫।১নং মসজিদ বাড়ী।

১২। 'সাপের মন্তর'—মীর খোররাম আলী ঐ

ইহা ছাড়া ফারসীর অনুবাদ ও মুসলমান-ধর্ম্মবীরগণ লইয়া যে কত বাঙ্গলা কাব্য লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের উল্লেখ করা একরূপ অসাধ্য। দুঃখের বিষয়, হিন্দুরা বাঙ্গলা সাহিত্যকে যেরূপ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন, আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানেরা তাহা করেন নাই। আমি কিছু পরেই মুসলমানদের বঙ্গসাহিত্যে একটা বিরাট আবদানের কথা বর্ণনা করিব, সেই অবদান বিস্ময়কর। আমার বক্তৃতার শেষাংশ শুনিবার পর যদি আপনারা কেহ বলিতে চাহেন, যে এই বাঙ্গলা সাহিত্য—হিন্দু-সাহিত্য, ইহাতে মুসলমানের কোন স্বার্থ নাই—তবে তাঁহাদের ভুল ধারণা নিশ্চয়ই দূর হইবে।

কিন্তু আগেই আমি 'thundering in the index' করিব না। বাঙ্গলা সাহিত্য—বাঙ্গালীর সাহিত্য, যে-কেহ এই ভাষা তাঁহার মায়ের মুখে শুনিয়া শিখিয়াছেন, তিনিই স্যায়তঃ আইনতঃ ইহার ভাগীদার। আপনারা কি আপনাদের শত শত কবি ও গ্রন্থকার, যাঁহারা কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় অসাধারণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিবেন? সে অসম্ভব চেষ্টা করিবেন না, সে চেষ্টা করিলেও সফল হইবেন না। মাতৃভাষা মায়ের স্নেহের মত সমস্ত মনপ্রাণে ছড়াইয়া আছে, পাষাণ চাপা দিলেও তাহার পুনঃপুনঃ অঙ্কুরোদগম হইবে।

যাঁহারা আরবী, ফারসী অথবা উর্দ্দুর বিষয়বস্তু লইয়া খাঁটি বাঙ্গলায় কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অবদান তুচ্ছ করিবার বিষয় নহে। আমি বলিয়াছি—কারবালার যুদ্ধ, এজিদের কথা প্রভৃতি যে-সকল বিষয় দূর দেশাগত, তাহা মুসলমান-কবিরা বিদেশাগত অতিথির স্যায় গৃহের বাহিরের একখানা একচালায় স্থান দিয়া তৃপ্ত হন নাই, তাঁহারা এমন ভাবে সেই সকল অতিথিকে গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের রূপ বদলাইয়া তাঁহারা বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন--তাঁহাদের ঢিলা পায়জামা ও বিদেশী কোর্ত্তা আর নাই, লুঙ্গী কিংবা ধুতি পরিয়া সেই অভ্যাগতগণ একেবারে বাঙ্গালী সাজিয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রাণ কত বড়, তাহা বাঙ্গলা কাব্য পড়িলে বুঝা যাইবে, পরকে আপন করিবার যে যাদুমন্ত্র, তাহা তাঁহারা জানেন।

তাঁহারা পরের কথা আপনার করিয়া লইয়াছেন। বিদেশী গান গাহিতে যাইয়া যেরূপ সুকণ্ঠ-গায়ক নিজের মধুবর্ষী-স্বরের মূর্চ্ছনা দিয়া তাহা আলাপ করেন, বঙ্গীয় মুসলমান ফারসী বা উর্দ্দুর অনুবাদ সেইরূপ মূলের দোহাই দিয়াও সেই সকল কাব্যকে দেশী-শ্রীতে মণ্ডিত করিয়াছেন, ইহাই বাঙ্গালীর চিরন্তন প্রতিভা। বাঙ্গালী কখনই কোন প্রিয়-জিনিষকে দূর হইতে দূরবীণ দিয়া দেখিয়া তৃপ্ত হন না, তিনি তাঁহার

স্নেহের জিনিষকে সজোরে নিজের বুকের কাছে টানিয়া পরিচর্য্যা শুধু নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ করেন না, তাহাকে স্বীয় হৃদ্‌পঞ্জরের হাড়-মাংসে পরিণত করিয়া একেবারে আপন করিয়া তুলেন। আপনারা 'হাসেন-হুসেন' কাব্যে ফাতেমার বিলাপ পড়ুন, উহা আরব দেশের জননীর কান্না নহে, উহা একেবারে বাঙ্গালার মায়ের কান্না; উহাতে পদ্মার গভীরতা ও শীতলক্ষার বিশালতা আছে। জগতে কত লোকই না কাঁদিয়াছে—লায়লী—মজনুর জন্য কাঁদিয়াছে, শিরী—ফর্‌হাদের জন্য কাঁদিয়াছে, কৌশল্যা—রামের জন্য কাঁদিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত কান্না একত্র হইলে যে করুণ-রস প্রকাশ পায়, বাঙ্গালী কবির সেই বুক-ফাটা কান্নার সুর 'ফাতেমা-বিলাপ'-এ প্রকাশ পাইয়াছে। 'হপ্ত পয়কর' 'ছয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল' প্রভৃতি পুস্তক এইভাবে অনূদিত হইলেও তাহা ঋতুভেদে বঙ্গীয়-প্রকৃতির সমস্ত আভরণ ধারণ করিয়া কাব্য-লক্ষ্মীর স্বরূপ দেখাইতেছে। এই সকল অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথা বলা চলে, যে পুস্তকগুলি যত বেশী পরিমাণে দেশজ উপাদান আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেগুলি ততটা বেশী মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী ও বাঙ্গালার নিজস্ব হইয়াছে।

মুসলমানী কেচ্ছাগুলি যাহা উর্দ্দু-প্রধান ভাষায় ছাপা হইয়াছে, তাহা সময়ে সময়ে এত উৎকট যে, তাহা একরূপ পাঠের অযোগ্য হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা কম নহে, কিন্তু এই নাতি-ক্ষুদ্র সংখ্যক সাহিত্যকে আমরা একরূপ পণ্ডশ্রম মনে করি। ইহাদের আর একটা দোষ এই যে, যদিও ইহারা পল্লী-প্রচলিত গীতিকা ও রূপকথা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, ইহাদের লেখকেরা প্রাচীন কবিতার প্রাণ একেবারে গলা টিপিয়া মারিয়া যেন শববাহী একটা শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছেন। আমাদের দেশের অত্যল্প-শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু-মুসলমান প্রাচীন ভাব-সম্পদের ও কবিত্বের সন্ধান জানেন না। মহানদীর তীরে বসিয়া

তাঁহারা কূপ কাটিতে লাগিয়া যান। সেই সকল প্রাচীন কাহিনীর ভাষা অমার্জ্জিত বলিয়া বর্জ্জন করেন এবং তৎস্থলে সংস্কৃত কি উর্দ্দু-শব্দবহুল একটা খিচুড়ি ভাষা সৃষ্টি করেন। যে-সকল পল্লী-পণ্ডিত পাঠশালায় পড়িয়াই বিদ্যার আঙ্গিনা ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভারতচন্দ্রী 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি বাঙ্গলা কাব্যের ভাষাটা খুব বড় বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আদি-রসটা এই সকল গীতিকায় পয়ঃপ্রণালীর মত বহিয়া যায়; তারপর পণ্ডিতী-বাঙ্গলার ও ফারসীর রূপ বর্ণনাগুলি তাঁহাদিগকে পাইয়া বসে। সাবেকী গল্প-মাধুর্য্যের সুধা-ভাণ্ড সম্মুখে পাইয়াও এই ভারতচন্দ্রী-তাড়ির আস্বাদ তাঁহারা পছন্দ করেন, এই সকল তথাকথিত পণ্ডিত কবিদের অনুকরণ করিয়া বাহাদুরী দেখাইতে ব্যস্ত হন। সেই সুদীর্ঘ রূপবর্ণনা ও কেশ-সূক্ষ্ম উপমার বহর দেখিয়া সহজ-রসের বোদ্ধা—শিশুর ন্যায় সরল পল্লীবাসীরা ভড়কিয়া যায় এবং সেই ধারাপাতগত বিদ্যার বিদ্বান্‌দিগের লেখা সম্বন্ধে এমন একটা উচ্চ ধারণা থাকে যে, তাহার উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা প্রকাশের সাহস পায় না; যতই উৎকট, দুর্ব্বোধ্য ও বুদ্ধির অগম্য হউক না কেন, তাহার তারিফ্ না করাটা তাহারা মূর্খতার লক্ষণ বলিয়া মনে করে। এইভাবে এই বিকৃত বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত কতকগুলি পুঁথি বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে কাট্‌তি হয়। পল্লীর গীতিকাগুলি যখন কি হিন্দু কি মুসলমান অর্দ্ধশিক্ষিত ও অল্পবিদ্যা-ভয়ঙ্কর লেখকদের হাতে পড়িয়া রূপায়িত হয়, তখন তাহাদের স্বরূপটি আর চেনা যায় না। তাহাদের এমনধারা পরিবর্ত্তন হয় যে—যেন মনে হয়, পল্লীর অনাবিল হাওয়ায় প্রস্ফুটিত পদ্মটি একটি সজনে ফুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই সকল কেচ্ছার মূলগুলি এখনও পাড়াগাঁয়ে একেবারে দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। অন্ধ যেমন—'দুধ কেমন' জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল—'দুধ বকের মত'। সেই পল্লী-গাথাসমূহের পরিচয় আধুনিক কেচ্ছাগুলি সেইরূপই দিয়া থাকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুসলমান কবিদের শ্রেষ্ঠ অবদান পল্লী-গাথা

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মুসলমানদের দান কখনই উপেক্ষণীয় নহে, তাহা সেই সাহিত্যের একটা সুবৃহৎ অংশ জুড়িয়া আছে, কিন্তু তথাপি যে-সকল কাব্যের উল্লেখ করিলাম, সেগুলি পড়িয়া একথা বলিতে ইচ্ছা হয় না যে, এই অবদান প্রথম শ্রেণীর। 'পদ্মাবৎ' কাব্য অশেষ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও মুকুন্দরামের 'চণ্ডী' অথবা ভারত চন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর মত শ্রেষ্ঠ আসনের দাবী করিতে পারে না, বড়জোর বংশীদাস, নারায়ণ দেব অথবা বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ'-এর মত একটা স্থান পাইলেও পাইতে পারে। সুতরাং এই কাব্যের প্রতিষ্ঠা গজ-দন্তে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মত নহে। লোর চন্দ্রানী', 'সতীময়না' কাব্যের যশঃ আমরা মুরব্বিয়ানা করিয়া প্রচার করিতে পারি—উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য, কিন্তু যদিও মাঝে মাঝে সেই সকল কাব্যের কবিত্ব হঠাৎ বিদ্যুৎস্ফুরণের মত চোখ ধাঁধিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তারপরই আঁধার ও বাস্তবতার নীরস ক্ষেত্রে পীড়াদায়ক অলঙ্কার-শাস্ত্রের অত্যুক্তি। এই লেখকদের কাহাকেও মহাকবি বলিয়া আমরা জয়ন্তী গাহিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারি না,—কাব্যগুলিতে অনেক ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্যের ইঙ্গিত আছে, যার জন্য কোন গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখিবার সময় তাহারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। তাহাদের স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্য অতি উচ্চ, ঘাড় বাঁকাইয়া উর্দ্ধে চাহিয়া সেই পাণ্ডিত্যের উচ্চ-শৃঙ্গ দেখিতে হয়, কিন্তু সে কৌতূহলই বা কতক্ষণ থাকে? সৈয়দ মর্ত্তুজা বা আলোয়ালের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ লইয়া, সরলভাবে বড়াই করিবার বিশেষ

কোন কারণ নাই। মুসলমান কবিরা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ লিখিয়াছেন, অপরূপ মনে করিয়া এই অদ্ভুতত্বের জন্য সেই সকল পদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যতটা আকৃষ্ট হইয়াছে— প্রকৃত কবিত্ব গুণে ততটা হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে সত্য সত্যই কি কেহ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস কি গোবিন্দ দাসের সমকক্ষতা করিতে পারেন? তাঁহাদের কেহ রায়শেখর, বলরাম দাস, শশীশেখর ও যদুনন্দন দাসের সঙ্গেও এক পংক্তিতে স্থান পাইতে পারেন না।

আপনারা যদি আশা করিয়া থাকেন যে, আমি বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীন পুঁথিশালা ঘাঁটিয়া এইরূপ আর কয়েকটি মুসলমান কবির লেখা আপনাদের কাছে আনিব এবং তাহাই লইয়া আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ করিব, তবে সে ধারণা একান্ত ভুল।

বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে মুসলমানগণের ইহা অপেক্ষা শতগুণ বড় অবদান আছে, তাঁহারা ঐ বিরাট্ সাহিত্যের শুধু পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা এবং লেখক নহেন, তাঁহারা ইহার রক্ষক; এই মহাভাণ্ডারের সংবাদ আমি অতি আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি। 'পদ্মাবতী' কাব্যের কবিত্ব আছে, কিন্তু তাহার পাণ্ডিত্যই সমধিক, তাহা কাব্য হিসাবে মুকুন্দরামের 'চণ্ডী' হইতে নীচে, কিন্তু পাণ্ডিত্য হিসাবে খুব বড়।

বঙ্গের একটা অতি বৃহৎ পল্লী-সাহিত্য বৌদ্ধাধিকার হইতে এই দেশের আম্রকুঞ্জ ঘেরা কুটীরে 'কোয়েল' ও 'বউ-কথা-কও' পাখীর গানের সঙ্গে উদ্ভূত হইয়াছিল; সেই সাহিত্যের কতকটা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা এত বিরাট এবং তৎসম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা এতটা উদাসীন যে, কবে ইহা শিক্ষিত ও ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাহা জানি না। এই বিরাট্ পল্লী-সাহিত্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সমধিক পরিমাণে আহৃত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে মৌলিক এবং বঙ্গপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক।

এই পল্লী-কাব্য গুলির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এত বড় বড় কবি আছেন, যাঁহাদের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারেন, এরূপ কবি তথা-কথিত ভদ্র সাহিত্যেও বিরল। এই কাব্যগুলির রচকদের অনেকেই নিরক্ষর, কিন্তু ইহাদের দৃষ্টি এত সূক্ষ্ম যে, স্বীয় সমাজ ও দেশের যে চিত্র ইহারা দিয়াছেন, তাহা একেবারে নিখুঁত। যে-সময়ে ভারতচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজসভা ও দরবারের কুরুচির স্রোতে এদেশ ভাসিয়া যাইতেছিল, সে-সময়ে এই নিরক্ষর কবিরা নৈতিক-জীবনের যে সতর্কতা দেখাইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। প্রেম-প্রসঙ্গে ইহারা মনস্তত্বের সূক্ষ্মতম সন্ধান রাখেন এবং এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানসিক ভাবের বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ যে, অনেক স্থলেই তাঁহারা বৈষ্ণব কবিদের সমকক্ষ। ইহারা সকলেই খাঁটি বাঙ্গালী। মৌলবী বা পুরোহিতের খপ্পরে তাঁহারা পড়েন নাই, সংস্কৃত বা আরবী দ্বারা অভিভূত হন নাই, একেবারে পাণ্ডিত্য-বর্জ্জিত, অথচ প্রকৃতির স্বীয় সন্তান, ভারতীর প্রিয় সেবক এই সকল কবি বঙ্গ সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এই বিরাট্ সাহিত্যের সূচনা আমি যে দিন পাইয়াছিলাম, সেদিন আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। আমি সেদিন দেশ-মাতৃকার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আমাদের বাঙ্গলা ভাষার শক্তি ও প্রসার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং হিন্দু ও মুসলমানের যে যুগলরূপ দেখিয়াছিলাম—তাহাতে চক্ষু জুড়াইয়া গিয়াছিল। হিন্দু, খৃষ্টান, মুস্লিম প্রভৃতি প্রভেদাত্মক নাম সেদিন আমি ভুলিয়া গেলাম, এই দেশবাসীর এক অভিন্ন, অতিশয় প্রিয় নাম পাইলাম—তাহা বাঙ্গালী। তাহা যুগ-যুগান্তরের নাম ; সমস্ত বাহ্য-বৈষম্যের উপর সেই নাম সাম্যবাচক, সৌহার্দ্দ্য-জ্ঞাপক ও জ্ঞাতিত্বের পরিচায়ক।

দুঃখের বিষয়, কয়েকজন বিশিষ্ট নিরপেক্ষ সমালোচক ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের এই রত্নখনির জহুরী মিলিতেছে না। যে বিরাট্ প্রতিভাশালী পুরুষবরের

বক্ষে সহানুভূতি ছিল সাগরোপম, যাঁহার চক্ষু ছিল ব্যোম-বিহারী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তীক্ষ্ণ ও জ্যোতিষ্মান্, সেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আদর করিয়া ইহাদের মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং আমাদের শত-নিন্দিত ইংরেজ রাজ-পুরুষেরাই এই মুদ্রাঙ্কনের আংশিক ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

আজ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৪টি পল্লী-গীতিকা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রায় ৫০০ রয়েল সাইজের পাতায় এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এইভাবে চারিখণ্ডে মূল এবং আর চারিখণ্ডে সম্পাদক-কৃত ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে। মোট রয়েল সাইজের ১৬৪৩ পৃষ্ঠা বাঙ্গলা এবং ১৯৭৮ পৃষ্ঠা ইংরেজী, একুনে ৩৬২১ পৃষ্ঠায় আট খণ্ডে পল্লী-গীতিকাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা মার্কুইস্ অব্ জেট্ল্যাণ্ড লিখিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু এই সংগ্রহে পল্লী-সাহিত্য শেষ হইয়া যায় নাই, যতটা দেখিতেছি এইগুলির শেষ ধারণা করিতে পারিতেছি না। এই সাহিত্য এত বিরাট্ যে, ইহাদের উদ্ধার করা কেবল ব্যয়সাপেক্ষ নহে, বহু প্রকৃত দরদী লোকের সহায়তাসাপেক্ষ; আজ এই সম্বন্ধে যাহা লিখিব—তাহা শুধু প্রকাশিত ৫৪টি কাব্য লইয়া নহে, এই ক্ষেত্রে যে আরও বহু উপকরণ আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও এই সন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে। এই বিপুল সাহিত্যের অধিকাংশই আমি পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কি কারণে এই সকল গাথা ঐ প্রদেশে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার একটু আলোচনা করিব। আমি যে-সময়ের কথা বলিব, তখনকার বাঙ্গালীরা পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান হিন্দু ও মুসলমানদের পূর্ব্বপুরুষ। এই সাহিত্যের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা এতৎসংশ্লিষ্ট ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

গুপ্ত সম্রাটেরা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর জয় করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দেশের দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসীরা পাল-রাজত্বে তাহাদের অধীনতার পাশ ছেদন করিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহারা নামেমাত্র পাল-রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করা হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে পারিল না।

সেনদের সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরবাসীরা নানা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়—রাজবংশী কোচ, মেচ, চকমা প্রভৃতি শ্রেণীর নেতাগণ পূর্ব্ব ময়মনসিংহের নানা দুর্গম স্থানে বাস স্থাপন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিবাসীরা বাঙ্গালাদেশে সাধারণতঃ কিরাত ও রাজবংশী নামে পরিচিত ছিল। তাহারা আর্য্য-সমাজের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। জঙ্গলবাড়ী, বোকাইনগর, গড়-জরিপা, কালিয়াজুরী, মদনপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-স্বামীরা এতটা শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রবল হইয়াছিলেন যে, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। সেনদের লোলুপ-দৃষ্টি এই পাহাড়িয়া দেশটার উপর ছিল। বঙ্গদেশের উপান্ত-ভাগে উত্তর-পূর্ব্ব একটা ক্ষুদ্র দেশ তাঁহাদের সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হইয়া বিদ্রোহী থাকিবে এবং তাঁহাদের শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র-কেন্দ্রের সৃষ্টি করিবে, ইহা তাঁহারা ইচ্ছা করিতেন না। তাহা ছাড়া, বল্লালসেন যে সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশের উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যেও তাঁহার অনেক শত্রু হইয়াছিল। এই সকল শত্রুরা সেনদের অধিকৃত বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া গিয়া পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। ১১৩৯ খৃঃ অব্দে বল্লালের অত্যাচারে ভীত বিরোধী-দলের অন্যতম নেতা অনন্ত দত্ত পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত কাস্তল গ্রামে শ্রীকণ্ঠ নামক গুরুকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বাস স্থাপন করেন—

"চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনি সংখ্যশাকে, বল্লাল ভীত খলু দত্তরাজঃ
শ্রীকণ্ঠ নাম্না গুরুণা দ্বিজেন। শ্রীমাননন্তো বিজহী চ বঙ্গম্।"

বল্লালের পরে লক্ষ্মণসেন এই দেশটা জয় করিবার চেষ্টা করিয়া বারংবার পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। গ্রীষ্মকালে রাজবাহিনী কংশ, ফুলেশ্বরী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব-পাহাড়ে শিবির স্থাপন করিত। রাজবংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা প্রতি যুদ্ধেই পরাস্ত হইয়া নিভৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে লুকাইয়া থাকিতেন, কিন্তু বর্ষাকালে প্রচণ্ড বন্যার মত পর্ব্বতের নানাদিক্ হইতে রাজসৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিত। সেই অনধিগম্য পাহাড়িয়া দেশে বর্ষাকালেও তাহারা বন্য-মার্জ্জারের মত অনায়াসে চলাফেরা করিত। কিন্তু আনুগঙ্গ প্রদেশের সমতলবাসী রাজকীয়-সৈন্যগণ খাদ্যাভাবে ও অপরিচিত দেশের দুর্গমতায় সম্পূর্ণ রূপ অসমর্থ হইয়া একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। রাজবংশীয়দের অতর্কিত আক্রমণে তাহাদের ছাউনি ভাঙ্গিয়া যাইত এবং তাহাদের অধিকাংশেরই শত্রুর খড়্গাঘাতে জীবন-লীলা অবসান হইত। বারংবার অকৃতকার্য্য হইয়া লক্ষ্মণসেন এদেশ অধিকারের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং সেনদের প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্য বহুদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে প্রবেশ করিতে পায় নাই। গুপ্ত যুগের হিন্দু ধর্ম্ম এবং পালরাজাদের বৌদ্ধ-প্রভাবের মিশ্রণে তাহাদের সমাজ গঠিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদের কৌলিন্য সে-দেশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল না, এখনও সেখানে চক্রবর্ত্তী-ব্রাহ্মণদের পদ প্রতিষ্ঠা বাড়ুয্যে, চাটুয্যে, মুখুয্যাদের মতই সম্মানিত; কায়স্থের মধ্যে দত্তরা—মিত্র, বসু, গুহ ও ঘোষদের ন্যায়ই সামাজিক সম্মানে প্রধান। বহুকাল পর্য্যন্ত সেখানে গৌরীদানাদি প্রথা ছিল না, কুমারীরা প্রাপ্ত-বয়স্কা হইয়া পরিণীতা হইত এবং অনেক সময় তাহারা স্বীয় বর নিজেরা মনোনীত করিত। বহুকাল পর্য্যন্ত সে-দেশে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হয়

নাই। তাহারা দেবতার প্রতি ভক্তিতে বিগলিত হইত না, কর্ম্মবাদের উপরই তাহারা জোর দিত এবং দেবতার কৃপার উপর নিরুপায়ভাবে নির্ভর না করিয়া আপদে-বিপদে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইত। এই সেনাধিকার বহির্ভূত বাঙ্গালার পল্লী-সাহিত্য এবং ব্রাহ্মণ্য-শাসিত বাঙ্গলা সাহিত্য, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি সুস্পষ্টভাবে এই সকল গাথায় সূচিত হইতেছে। এই পল্লী-সাহিত্যের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, বিবাহের পূর্ব্বে কুমারীরা স্বেচ্ছায় বর মনোনয়ন করিত এবং অভিভাবকগণ প্রতিকূল হইলে উদ্দাম নদী-স্রোতের ন্যায় তাহারা গৃহের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া যাইত। বস্তুতঃ—শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র, কাদম্বরী প্রভৃতি কাব্যের যে আদর্শ. এই পল্লী-সাহিত্যের আদর্শও তাহাই। এই সাহিত্যে দেখা যায়, বণিকেরাই সমাজে সম্মানিত; তাহাদের পুত্রেরা রাজপুত্রদের সঙ্গী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু, ব্রাহ্মণের ও ঠাকুর দেবতার তাদৃশ প্রভাব এই সাহিত্যে লক্ষিত হয় না। এই পল্লী-সাহিত্যে দেখা যায়, বাঙ্গালী-প্রতিভা কত দুর্দ্দমনীয় ও উজ্জ্বল। শিক্ষা-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ওটেন সাহেব ও আমেরিকান্ সমালোচক এলেন লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালী যদি এই প্রাচীন আদর্শের অনুসরণ করিয়া এই পল্লী-কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারে, তবেই বুঝিব পৃথিবীর অগ্রগামী জাতিদের সঙ্গে তাহারা তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে।"

এই পল্লী-সাহিত্যের সহিত মুসলমানদের কি সংস্রব, এখন আমরা তাহা দেখাইব। গুপ্ত ও পাল রাজত্ব হইতে সেন-রাজাদের যুগ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও উত্তর ময়মনসিংহ সেই প্রাচীন বৌদ্ধ-ভাব মিশ্রিত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিল। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে রাজবংশী বৈশুগাড়ো নামক রাজার সুসঙ্গ দুর্গাপুররাজ্য সোমেশ্বর সিংহ নামক এক পশ্চিমাগত ব্রাহ্মণ যোদ্ধা কাড়িয়া লইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই সমাজ পূর্ব্বতন আদর্শ রক্ষা করিয়াছিল।

১৪৯১ খৃষ্টাব্দে সেরপুর গড়জরিপার দিলীপ সামন্তকে নিহত করিয়া ফিরোজ শাহের সেনাপতি মজ্‌লিস হুমায়ুন উক্ত গড় অধিকার করেন। 'গড় জরিপা' শব্দ 'গড় দিলীপ' শব্দের অপভ্রংশ। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলি জঙ্গলবাড়ীর লক্ষ্মণ হাজরাকে জয় করিয়া তথায় সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অতর্কিত নৈশ আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া লক্ষ্মণ-হাজরা ও তাঁহার ভ্রাতা রাম-হাজরা নিদ্রা ভঙ্গের পরে গুপ্ত দ্বার দিয়া পলাইয়া অদৃশ্য হ'ন।

এই সকল দেশের লোক বাঙ্গালার অজেয় পল্লী-গীতিকা, রূপকথা ও গীতিকথা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বঙ্গের অপরাপর প্রদেশেও বৌদ্ধাধিকারে এই বিরাট্ সাহিত্যের প্রচলন ছিল, কিন্তু সমাজগুরুগণ জনসাধারণের স্বাধীন রুচি, ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী প্রথা এবং কথিত ভাষা অগ্রাহ্য করিয়া তৎস্থলে পৌরাণিক বিষয় ও সংস্কৃতাত্মক কথকতা ও কীর্ত্তন প্রচলন করেন। তজ্জন্য বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ-শাসিত অন্যান্য স্থানে তাহা একরূপ লোপ পাইয়াছে। যে-সকল স্থান নব-ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডির বাহিরে ছিল, সেই সেই দেশের লোকেরা এই প্রাচীন সম্পদ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এখন ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের সেই যুগ-সাহিত্যের ধারা ক্রমশঃ শুকাইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে পূর্ব্বোক্ত কারণে পল্লী-গীতিকা বেশী পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু বহু পূর্ব্বেই সেই দেশ হইতে এই পল্লী-সাহিত্যের ধারা একেবারে বিলুপ্ত হইত, যদি না মুসলমানগণ ইহাকে রক্ষা করিত। এক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে নব-ব্রাহ্মণ্য ধীরে ধীরে ভৈরব নদ পার হইয়া কংশ, ধনু ও ফুলেশ্বরীর তীরদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া যে সাহিত্যের রসাস্বাদ করিয়াছে, তাহা তাহাদের মনঃপূত হয় নাই। এই গাথা-সংগ্রাহকগণ আমাকে জানাইয়াছেন—"এই সকল গীতিকথা ও

পালা-গান উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা অনুমোদন করেন না ; তাঁহারা তাঁহাদের বাড়ীতে এ সকল গান গাহিতে দেন না। ইহাতে প্রাপ্ত-বয়স্কা কুমারীগণের স্বেচ্ছবর গ্রহণের কথা আছে, ব্রাহ্মণ ও ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তির কথা নাই, ইহাতে ইতর-জাতির নায়কদের প্রসঙ্গ আছে এবং জাতি-নির্বিশেষে নির্ব্বিচার বিবাহ-প্রথার কথা আছে।"

একজন বিশিষ্ট সংগ্রাহক আমাকে জানাইয়াছেন,—"শ্রেষ্ঠ পল্লীগাথা-গুলি উদ্ধার করা এখনও কত বড় শক্ত কাজ, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে কেহ বুঝিতে পারিবে না। এই সকল গান লিখিত হইত না, গায়কদের মুখে মুখে প্রচারিত হইত। যে পর্য্যন্ত ইহাদের প্রচলন বেশী ছিল, সে পর্য্যন্ত অনেক গায়েনেরই তাহা কণ্ঠস্থ থাকিত। কিন্তু প্রচলনের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়েনদের স্মৃতি মলিন হইয়া গিয়াছে। একটি পালাগান বা পল্লীগীতিকা সংগ্রহ করিতে হইলে দুর-দুরান্তরবাসী বহু গায়েনের শরণাপন্ন হইতে হয়। কাহারও নিকট একাংশ এবং অপরদের কাছে ভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করিয়া অবশিষ্ট অংশগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। কিছুদিন পরে আর তাহাও সম্ভবপর হইবে না।"

অধিকাংশ স্থানে হিন্দু-মুসলমান নিরক্ষর কৃষকেরাই এই সকল কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার রস-বোদ্ধা ও শ্রোতা। কিন্তু হিন্দুদের যে ব্রাহ্মণ্য-অনুশাসন তাহা মুসলমানদের নাই, সুতরাং বংশ-পরম্পরা তাহারা যে উৎসবের পরম প্রসাদ বিলাইয়া আসিয়াছে, সে-রসের অমৃত-আস্বাদ ভুলিবার নহে, তাহা তাহারা ছাড়ে নাই। শুনিয়াছি, শরিয়ৎবাদী মৌলবীরা সঙ্গীতের প্রতি কতকটা বিদ্বিষ্ট। তাহাতে মনের দৃঢ়তা কমে এবং হৃদয়ের বল ক্ষীণ করে—এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ এই গীতিকা-গুলির উপর নিষেধ-বিধি জারি করিতেছেন। আনন্দই জনসাধারণের শক্তির উৎস, আনন্দই তাহাদের সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমজনিত

অবসাদ ও ক্লান্তির মহৌষধ! স্বাভাবিকভাবে বন্য-বীথির নীচে বসিয়া কৃষক নীলাকাশে যখন কোকিলের কুহুধ্বনি শুনিতে থাকে, তখন হৃদয় ছাপিয়া আনন্দোচ্ছ্বাস বহিতে থাকে। তাহারা পাণ্ডিত্যের আস্বাদ পায় নাই। কেতাবী এলেম তাহাদের নাই। তাহারা যে আনন্দ নিজেদের গৃহে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে, হয়ত বা তাড়ির দোকানে ঢুকিবে।

হিন্দুগৃহ হইতে তাড়িত হইয়াও এই পল্লী-সাহিত্য এতকাল প্রধানতঃ মুসলমানেরা জীয়াইয়া রাখিয়াছেন; আজ সেই পল্লী-বাহিনী সুরধুনী ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। এই পল্লী-সাহিত্যের বিস্তারিত সংবাদ দিতে হইলে আমাকে ওয়েবষ্টারের অভিধানের মত সুবৃহৎ বহুখণ্ড পুস্তক লিখিতে হয়। এই সাহিত্যের নানাদিক্ হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তাহা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের অতীব উপভোগ্য। শুধু তাহাই নহে, এই নিরক্ষর চাষাদের সাহিত্য এত বড় যে, তাহার চূড়া বড় বড় শিক্ষিত কবিদের মাথা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। আমি লিখিয়াছি, পশ্চিম-বঙ্গের লোকদের মধ্যে অনেকেই এই সাহিত্যের গুণে ও অপরাজেয় কাব্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জন্য, কেহ কেহ বা পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি বিরূপতার দরুণ এই সাহিত্যকে তাদৃশ আদর করেন নাই। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গীতি-সাহিত্যের ভাষা তাঁহাদের নিকট কতকটা দুর্ব্বোধ ও শ্রুতিকঠোর। তজ্জন্য তাঁহারা সকলে ইহার রসাস্বাদের অধিকারী হইতে পারেন নাই। কিন্তু সাহেবেরা এই গাথাগুলির ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়াছেন; তাঁহারা এই সাহিত্যের যতটা পক্ষপাতী হইয়াছেন তাহা আমাদের অতীব গৌরবের বিষয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুসলমানদের সমধিক যত্নেই এই সাহিত্য রক্ষিত হইয়াছে। কবিগণের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক আছেন, কিন্তু গায়েন অধিকাংশই মুসলমান। কতকগুলি গীতিকার প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বোঝা যাইবে -

(১) "মাঞ্জুর মা" নামক উৎকৃষ্ট কাব্যখানি মুসলমানদের রচিত ; ইহা নগেন্দ্র নাথ দে এক মুসলমান গায়েনের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। (২) "কাঞ্চন চোরা" পালাটিও একটি অতীব কৌতূহলপ্রদ, ঐতিহাসিক রহস্যপূর্ণ, কাব্য-শ্রীমণ্ডিত গীতিকা ; ইহার রচক মুসলমান। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এই গানটি চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত হাইদগা-নিবাসী সেকেন্দর গায়েন, বোয়ালখালী থানার খেলেরা নিবাসী আলিয়র রহমান এবং কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত চরচকৃতাই গ্রাম নিবাসী গুজু পাগলা এই তিন জন মুসলমান গায়েনের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। পল্লী-গীতিকার কৌস্তভ স্বরূপ (৩) "মহুয়া" পালাটি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে নেত্রকোণার অন্তর্গত মস্কগ্রাম নিবাসী ৮০ বৎসর বয়স্ক সেখ আসকআলি ও মন্দিকোণার নিকটবর্ত্তী বোরালি গ্রামবাসী নসু সেখের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (৪) "চাঁদ বিনোদের পালা" বা "মলুয়া গীতিকা" চন্দ্রকুমার অপরাপর কয়েকজন গায়কের মধ্যে ময়মনসিংহের বাজীতপুর-নিবাসী কাঁছ সেখ এবং মঙ্গল-সিদ্ধি গ্রামবাসী নিদান ফকিরের নিকট আংশিক ভাবে পাইয়াছিলেন। (৫) "দেওয়ান মদিনা" গীতিকা জালাল গায়েনের আবৃত্তি হইতে প্রাপ্ত। (৬) "ভারাইয়া রাজার কাহিনী" চন্দ্রকুমার দে মূলতঃ দুইজন গায়েনের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন — ময়মনসিংহের অন্তর্গত মুক্তাগাছাবাসী নাজির ফকির এবং সেই গ্রামবাসী আর একটি ফকির,—চন্দ্রকুমার তাহার নাম লেখেন নাই। (৭) 'বীর নারায়ণ"-এর পালাটি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র দে মুক্তাগাছাবাসী সেখ পানা-

উল্লার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (৮) "**মহীপালের গান**"-এর একটি ক্ষুদ্র অংশ মৌলবী মনসুরউদ্দিনের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। (৯) শুজা বাদশাহের পত্নী পরীবানু সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পালাটির নাম "**পরীবানুর হাঁহলা**", ইহা আশুতোষ চৌধুরী কর্ত্তৃক চট্টগ্রামের ডবলমুরির অন্তর্গত আনারাবাদ নিবাসী খলিলুর রহমান ও উজানটেয়াবাসী মনসুর আলির নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। (১০) "**সোনাবিবির পালা**"টি প্রধানতঃ শ্রীহট্টের কাটিয়ালী গ্রামবাসী রহমান সেখের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। (১১) "**মহিষাল বন্ধু**" নামক কবিত্বপূর্ণ গীতিকাটি চন্দ্রকুমার দে কর্ত্তৃক প্রধানতঃ ভাওয়াল পরগণার উজি গ্রামবাসী মাঝিয়া সেখ এবং কাটঘরা গ্রামের গাছুনি সেখের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। (১২) মুসলমান কবি জামায়েৎউল্লা প্রণীত অত্যুৎকৃষ্ট "**মাণিকতারা**" বা "ডাকাতের পালা"টি স্বর্গীয় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী কাহার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে তিনি আমাকে জানাইবার অবসর পান নাই। এই সংবাদটি না জানাতে বঙ্গ-সাহিত্যের একটি গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। এই কবিত্বের খনি গ্রাম্য প্রাচীন সমাজের নিখুঁত চিত্রপট, যুবকের উদ্যম ও দুষ্কর অভিযানের জীবন্ত ছবি এবং মহীয়সী পল্লী-বালিকার বীরত্ব ও স্বামী-প্রেম-ব্যঞ্জক অত্যদ্ভুত পালাটির এক তৃতীয়াংশ মাত্র বিহারী চক্রবর্ত্তী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বাকিটা সংগৃহীত হইতে পারে নাই। আমি বহু চেষ্টা করিয়া এই পালাটির ক্ষুদ্র আর একটু অংশ আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা এখনও ছাপা হয় নাই। (১৩) '**নিজাম ডাকাতের পালা**'টি আশুতোষ চৌধুরী চট্টগ্রামের বোয়ালখালির অন্তর্গত অলাগ্রাম নিবাসী সেখ সদর আলি এবং মতিয়র রহমান নামক এক ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট পাইয়াছিলেন। (১৪) "**ঈশাখাঁ দেওয়ানের পালা**" ও (১৫) "**দেওয়ান ফিরোজখাঁর পালা**" চন্দ্রকুমার দে বাজীতপুর নিবাসী

সহর আলি গায়েন, চন্দ্রতলার সদীর গায়েন হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (১৬) **"সুরুত জামাল ও আধুয়া সুন্দরী"** পালাটির লেখক অন্ধকবি ফৈজু; এই পালাটিও চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করিয়াছেন। (১৭) **"দেওয়ান ভাবনা"** চন্দ্রকুমার দে কেন্দুয়ার নিকটবর্ত্তী মাঝিদের মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করেন। (১৮) **"নছর মালুম"** পালাটি আশুবাবু চট্টগ্রামের কাঁটালভাঙ্গা পল্লীর নূর হোসেন গায়েন, মহিষমারা গ্রামের শুক্কু মিঞা ও কর্ণফুলীর মোহনার নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীবাসী রহমান সাম্পেনের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। (১৯) **"নূরন্নেহা কবরের কথা"**—চট্টগ্রামের পেসকারের হাট পল্লীর হয়বৎ আলি, কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত চরবকতাইবাসী হাকিম খাঁ ও বোয়ালিয়ার অন্তর্গত পূবদিয়া গ্রামবাসী শুপা মিঞার নিকট হইতে আশুবাবু এই পালাটি সংগ্রহ করেন। (২০) **"মুকুটরায়"**—এই কাব্যের লেখক মুসলমান, বিষয় হিন্দুসংক্রান্ত, কিন্তু ইহাতে ইস্‌লামের জয় ঘোষিত হইয়াছে।

এই 'মুকুটরায়'-এর গীতিকায়—সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত দেশে তরুণ মুকুটরায়, শকুন্তলা বা মিরেণ্ডার সংস্কারবর্জ্জিতা এক বনের কন্যা দেখিলেন। প্রথম দর্শণেই কন্যা যুবরাজের রূপে মুগ্ধ হইল। কবি বলিতেছেন—

> **"কাঁদিয়া কাটিয়া কন্যা ফেলায় ধনুক-ছিলা।**
> **কেমন পীরিতির জ্বালা বুঝিল বনেলা॥"**

যে কখনও তাহার পর্ণ-কুটীরের বাহিরে পা দেয় নাই, যে কোন প্রেম-কাহিনী শুনে নাই, সে হঠাৎ রাজকুমারকে দেখিবামাত্র পাগল হইল কেমন করিয়া? কবি কৃষক, কিন্তু তাঁহার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের চেষ্টা দার্শনিকের মত। পালাটি সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই। ইহাতে ইস্‌লামের প্রতি অনুরাগে কবি ভরপুর।

(২১) "রতন ঠাকুর":—এই পালাটি চন্দ্রকুমার বাবু ময়মনসিংহের কাঠঘর নিবাসী গাছিম সেখের নিকট পাইয়াছিলেন। (২২) "ছাতি খেদার গান"— মুসলমান কবি-রচিত, চন্দ্রকুমার দে-সংগৃহীত। (২৩) "আয়না বিবি"—মুসলমান কবি-বিরচিত, চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করেন।

ইহা ছাড়া আরও অনেক কাব্য আমরা আরও বহু মুসলমানের নিকট হইতে পাইয়াছি। হিন্দুদের নিকট হইতেও কতকটা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণই মূলত ইহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই এই সাহিত্যের চৌদ্দ আনি রক্ষক। অনেক গাথার নকল আমার কাছে আছে। তৎসম্বন্ধে কোনই আলোচনা হয় নাই, প্রকাশিত হওয়া ত দূরের কথা। তদ্ব্যতীত পল্লীর বাগানে যেরূপ যূঁই, কুন্দ, রজনীগন্ধা ও অপরাজিতার অন্ত নাই, পল্লীর বকুল, শিউলী, ও অতসীর দান যেরূপ অজস্র, তেমনই শত শত গীতিকা, পালাগান—ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নব-ব্রাহ্মণ্য যে সকল স্থানে সেন-রাজত্বে প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেইখানেই ইহাদের প্রাচুর্য্য, যেহেতু এই সকল পল্লী-গীতিকা সেই সকল স্থানে বহুদিন রাজত্ব করিয়াছে। এই প্রকারের গান ছাড়া রূপকথাও এই সকল পল্লী অঞ্চলে সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহার কিয়দংশ লালবিহারী দে, কতক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং কিছু আমি সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু এই রূপ-কথা সাহিত্য এত বিরাট যে, ইহার সামান্য অংশই এপর্য্যন্ত সংগৃহীত বা প্রকাশিত হইয়াছে।

রূপকথার অধিকাংশই গদ্যে, মাঝে মাঝে কয়েক পংক্তি কবিতা আছে; গল্প বলিবার সময় আলাপিনীরা তাহা গান করিত। এই রূপকথা-সমুদ্রের কয়েকটি লহরী নানা পথে য়ুরোপ প্রভৃতি সুদূর পশ্চিমে ও কাম্বোডিয়া, শ্যাম, যাভা, এমন কি বলী দ্বীপে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

আমাদের স্থান অল্প, সুতরাং ফকির ও বাউলদের সমৃদ্ধ গীতি-সাহিত্য, জারি ও মুর্শিদাগান প্রভৃতি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিতে পারিব না। ইহা ছাড়া, মুসলমানী মুদ্রাযন্ত্র হইতে কেচ্ছা-নামধেয় অসংখ্য দেশীয় গল্প দিনের পর দিন প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল কেচ্ছার বিষয়-বস্তু অনেক স্থানেই মুসলমানী এবং ইহাদের ভাষাও ন্যূনাধিক পরিমাণে ফারসী ও উর্দ্দু শব্দ-বহুল; তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে বিদেশীয় শব্দ এত অধিক যে, বাঙ্গালী হিন্দুদের তো কথাই নাই, এদেশের মুসলমানগণেরও অনেকের নিকট সেগুলি দুর্ব্বোধ।

যে অপ্রকাশিত গীতি-কবিতা ও রূপকথার বিরাট্ ভাণ্ডার সম্বন্ধে আমি এতক্ষণ ধরিয়া লিখিলাম, তাহাদের ভাষা প্রাদেশিক বাঙ্গলা, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের খাঁটিভাষা,—তাহা হিন্দু ও মুসলমান যাঁহারাই রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বাড়াবাড়ি মাত্র নাই; উহা পল্লীবাসীদের সহজ সুন্দর মনোভাব জ্ঞাপক সরলভাষা যে ভাষায় পল্লীবাসীরা কথা কহিয়া থাকে, ইহা সেই ভাষা। নিরক্ষর ও একান্তরূপে পাণ্ডিত্য-বর্জ্জিত জনসাধারণ তাহা কোন-রূপ কাব্যালঙ্কার দিয়া সাজাইবার চেষ্টা করে নাই, তাহারা এলেমদার নহে, ফারসী বা সংস্কৃতের অলঙ্কারশাস্ত্র তাহাদের জানা নাই। তাহারা আকাশে পাখীদের সুমিষ্ট গান শুনিয়াছে, তাহারা নীল-কৃষ্ণনীরা সরসীর বক্ষে পদ্ম ও কুমুদ ফুটিতে দেখিয়াছে, আম্রকুঞ্জ-পরিশীলন চঞ্চল বায়ু তাহাদিগকে সুরভি দান করিয়া শরীর জুড়াইয়া দিয়াছে,—এই দৃশ্যপটের পরিবেষ্টনীর মধ্যে আশে-পাশের মানুষগুলি তাহারা যেমন দেখিয়াছে, তেমনই আঁকিয়াছে। তাহার হৃদয়কুঞ্জ চির কুসুম-গন্ধী, সেই সরল পবিত্র উৎস হইতে তাহারা যে প্রেমের প্রেরণা পাইয়াছে, তাহাদের সাহিত্য সেই প্রেরণায় ভরপুর। তাহাদের আঁকা রূপসীরা কলসী-কাঁখে জল আনিতে যায়, কিন্তু নিতম্বের গুরুত্ব দেখিয়া মেদিনী মাটী হইয়া যায় না, তাহাদের নাভি-কূপে কামদেব

পলাইবার পথে শম্ভু সদৃশ উন্নত স্তনদ্বয় প্রেমদেবতার কুন্তল-স্বরূপ লোমাবলী ধরিয়া টানাটানি করে না, তাহাদের গতি গজরাজের গতির ন্যায় নহে এবং তাহাদের কাদম্বিনী নিন্দিত কুন্তলের লহর ভুজঙ্গিনীসম বেণী রচনা করে না। তাহাদের শ্রুতি গৃধ্রের কর্ণের ন্যায় নহে এবং নাসা খগরাজের দর্প ভগ্ন করে না,—তাহাদের ভ্রুর ভঙ্গিমা কামানের ন্যায় বা কন্দর্পের ফুলশরের সম নহে এবং তাহাদের পদের মঞ্জীরধ্বনি শিখিবার জন্য গুঞ্জনশীল ভ্রমর পদে পদে ঘুরিয়া বেড়ায় না,—এক কথায়, পণ্ডিত কবিরা অলঙ্কার-শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে সুদীর্ঘরূপ বর্ণনা দ্বারা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যকে ভারাক্রান্ত ও অর্থশূন্য গুরুশব্দ ও উপমা দ্বারা বিড়ম্বিত করিয়াছেন, এই সকল পল্লী-সাহিত্যে একেবারেই তদ্রূপ চেষ্টা বর্জ্জিত। সরল, অনাড়ম্বর, স্বভাব-শিশুর ন্যায় পল্লী-কবিরা এই পরকিয়া-ভাণ্ডার পাইবে কোথায়? তাহারা এবং যে-সকল গায়েন এই সকল পালাগান গায়, তাহারা পল্লীর আনন্দে মশ্‌গুল; তাহাদের শ্রোতারা হাসি-কান্নার রোলে পল্লীর আসরকে জমাইয়া তোলে। কিন্তু তাহারা জানে, তাহারা নিরক্ষর, যতই আনন্দ তাহারা এই সকল কাব্যে পা'ক না কেন তাহারা জানে, সেই আনন্দ তাহাদের নিজস্ব, শিক্ষিত-সমাজ সেই সকল গানের আদর করিবেন, এরূপ দুরাশা তাহারা কখনই রাখে না। মৌলবী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দূর দূর করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন, তাঁহারা যেখানে সভা করিয়া ফারসী-বয়াৎ ও সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সদর্পে ঘাড় নাড়িতে থাকেন, সে-পথে হাঁটিবার স্পর্দ্ধা তাহারা রাখে না,—তাহারা জানে না, অনুভূতির গাঢ়তাই প্রকৃত কাব্যের জন্মস্থান, তাহারা জানে না যে, অলঙ্কার-শাস্ত্রের কৃত্রিম চক্ষু যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহারা প্রাকৃতিক সুষমার সেরূপ পরিচয় পান না; নগ্ন, নির্ম্মল চক্ষে যাহারা প্রকৃতি দেখিয়া তাহা উপভোগ করিতে জানে, তাহারা স্বভাব সৌন্দর্য্যকে সেরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তাহারা জানে, তাহারা উচ্চ

সমাজের অপাংক্তেয় ; তাহাদের কাব্য ও গীতি তাহাদের লাঙ্গলের মতই জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য অথচ তাহা সেই লাঙ্গলের মতই ভদ্র সমাজে ত্যাজ্য। এই জন্য যখন চন্দ্রকুমার দে 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'র সোনালি-বাঁধাই, নানা চিত্র-শোভিত, সুদৃশ্য কাগজে ছাপা একখানি বই লইয়া গায়েনদের কাছে গেলেন এবং পড়িয়া বুঝাইলেন—এই মনোহর, সমৃদ্ধ আবরণের মধ্যে তাহাদের দেওয়া গান স্থান পাইয়াছে, তখন তাহারা বিস্ময়ে বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিল। তাহাদের অক্ষর-পরিচয় নাই, সুতরাং বইখানি পড়িতে পারিল না, কিন্তু সারমেয় যেরূপ প্রবাসাগত গৃহস্বামীকে দেখিয়া তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না, মনের আনন্দ-জ্ঞাপনের ভাষা নাই, এজন্য লেজ নাড়িয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া, বারংবার তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অসহ্য হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে—ইহারাও সেইরূপ কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের আতিশয্যে পুস্তকখানি কখনও মাথায় রাখিয়া, কখনও তাহার উপর হাত বুলাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া গেল। তাহারা জানে না যে, তাহারা অতি সংক্ষেপে নর-জীবনের কতকগুলি সার কথা বলিয়াছে, যাহা দার্শনিকগণ বুঝাইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া যান ; তাহারা কবিত্বের এমন মর্ম্মস্পর্শী রূপ দেখাইয়াছে, যাহা পাণ্ডিত্যের ধার না ধারিলেও জগৎকে মুগ্ধ করিবার শক্তি রাখে।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহাদের ভাষা প্রাদেশিক হইলেও তাহা খাঁটি বাঙ্গলা। মুসলমানগণ এই সকল পালাগানের অনেকগুলি রচনা করিয়াছেন এবং এখন তাঁহারাই ইহাদের প্রধান গায়েন ও শ্রোতা বলিয়া এই সকল গীতিকার ভাষা মুসলমানী বাঙ্গলা নহে, অর্থাৎ মৌলবীরা বহু উর্দ্দূ ও আরবীশব্দ-কণ্টকিত যে অস্বাভাবিক বাঙ্গলা অনুমোদন ও প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহা সে বাঙ্গলা নহে। ইহাতে উর্দ্দূ ও ফারসী শব্দ আছে, কিন্তু স্বাভাবিক ক্রমে সেই সকল ভাষার যে শব্দগুলি আমাদের

ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই ইহারা ব্যবহার করিয়াছে। বর্ত্তমানকালে গোড়া হিন্দুরা দিবারাত্র যে-সকল উর্দ্দু কি ফারসী শব্দ জিহ্বাগ্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন, লেখনী-মুখে তাহা বদলাইয়া তৎস্থলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন, এইরূপে—'হজম' স্থলে 'পরিপাক' বা 'জীর্ণ', 'খাজনা' স্থলে 'রাজস্ব',' 'ইজ্জৎ' স্থলে 'সম্মান', 'কবর' স্থলে 'সমাধি' 'কবুল' স্থলে 'স্বীকার', 'আমদানি স্থলে 'আনয়ন' বা 'সংগ্রহ করিয়া আনা', 'খেসারৎ' স্থলে 'ক্ষতি পূরণ', 'জমিন্' স্থলে 'ভূমি', 'খান্দান' স্থলে পদ-প্রতিষ্ঠা', ইত্যাদি কথার প্রয়োগ করেন। একটু কাগজ লইয়া টুকিয়া দেখিবেন, বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ বিদেশী শব্দ কত প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমাদের ভাষার জাতি যায় নাই। পরের জিনিষ আত্মসাৎ করিবার শক্তি সতেজ জীবনের লক্ষণ। শব্দগুলি বাদ-সাদ দিয়া ভাষা শুদ্ধ করিয়া ইহাকে তুলসীতলা করিয়া রাখিলে হিন্দু-মুসলমানের উভয়ের মাতৃভাষাকে আমরা খণ্ডিত ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিব। মানুষ পরদেশী ভাষা হইতে শব্দ চয়ন করে কখন? যখন স্বীয় ভাষার কথাগুলি অপেক্ষা বিদেশী ভাষার শব্দ বেশী জোরের ও ভাব-প্রকাশের বেশী উপযোগী হয়; জনসাধারণ যখন দেখে তাহাদের ভাষায় সেইরূপ বলীয়ান্ ও ভাবজ্ঞাপক-শব্দের অভাব, তখন তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ নির্ব্বাচনী-শক্তি ও অশিক্ষিত পটুত্ব গুণে সেই সকল শব্দের আমদানী করিয়া নিজের ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। এখানে পণ্ডিতের কাঁচি চালাইবার অবকাশ নাই। এই সকল শব্দ ভাষার পুষ্টি-সহায়ক, ইহাদিগকে বাদ দিয়া গণ্ডীটা সঙ্কীর্ণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার ভাষা রাঢ়-দেশীয় লোকের কানে একটু বাধিবে, তাঁহারা ইহার রসাস্বাদ ততটা করিতে পারিবেন না, যতটা আমরা পারিব। ইহা প্রাদেশিকতার জন্য। কিন্তু ইহাতে যে স্বল্প সংখ্যক বিদেশী শব্দ আছে, তাহা স্বাভাবিক ক্রমে আমাদের ভাষার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য এই গীতিকাগুলি কখনই পরিহার্য্য বা বিরক্তিকর হয় নাই।

পল্লী-গীতিকা সংগ্রহার্থ যখন আমাকে ডিরেক্টার ওটেন সাহেব চারটি লোক দিতে চাহিয়াছিলেন, প্রত্যেকের বেতন ৭০৲ টাকা, তখন তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ৭০৲ টাকা বেতনে ভাল গ্র্যাজুয়েট পাওয়া কঠিন হইবে না। আমি তদুত্তরে বলিয়াছিলাম যে—"আমি গ্র্যাজুয়েট চাই না, যাহারা চাষার কুটিরে পা দিতে সহজে স্বীকৃত হইবে না এবং তাহাদের কথিত গানগুলি শুদ্ধ না করিয়া লিখিতে পারিবে না, নিম্নশ্রেণীর কাছে আসিলে যাহাদের গা ঘিন্‌ঘিন্ করিবে, এমন লোক আমি চাহিনা; যাহারা দরদ দিয়া তাহাদের আনন্দে যোগ দিতে পারিবে এবং তাহাদের কথিত গানের একটি মাত্র বর্ণ না বদ্‌লাইয়া ঠিক তাহারা যেভাবে বলিবে, সেইভাবে টুকিয়া লইতে পারিবে, সেইরূপ লোক আমি চাই; গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে এরূপ লোক সহজে মিলিবে না।" এইভাবে আমি সেই সম্মানিত শ্রেণীর লোকদের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া প্রকৃত দরদী লোক কয়েকটি নিযুক্ত করিয়াছিলাম। আমি বহু বৎসরের চেষ্টায় যে কয়েকটি লোককে একার্য্যের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলাম, এখন তাহারা কাণ্ডারী-বিহীন মাঝির ন্যায় সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে, এই সকল গুণী এখন কোনখানেই আশ্রয় পাইতেছে না।

এইভাবে পল্লী-সাহিত্যের বিরাটত্ব সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি। কত শত বাউল ও ফকির যে এই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। বাউল গান, মুরশিদা গান, জারি গান, পল্লী-গাথা পল্লীর ভক্ত ও প্রেমিকদের মুখ হইতে শিঁউলি-ফুলের ন্যায় অজস্র ফুটিতেছে ও ঝরিয়া পড়িতেছে। এই অবজ্ঞাত সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা উপেক্ষিত। আমরা জনকতক শিক্ষাভিমানী লোক ইংরেজীর শিক্ষানবিশী করিয়া গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে যে একটি অর্দ্ধ-পক্ক সাহিত্যের সৃষ্টি পূর্ব্বক তাহারই স্পর্দ্ধায় গগন-মেদিনী

কাঁপাইতেছি, তাহাতেই বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগ ও মধ্যযুগ পরিকল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি, অথচ এই সাহিত্যকে কেহ কেহ ফিরিঙ্গিয়ানা-দুষ্ট বিকৃত সাহিত্য মনে করিয়াছেন। সেই সকল উগ্র সমালোচকের কথায় সায় না দিয়াও একথা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, এই অভিযোগ একবারে অমূলক নহে ; কোন কোন সম্প্রদায় বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যকে আবার অতিরিক্ত মাত্রায় হিন্দু-ভাবাপন্ন বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সাহিত্যের কল-কোলাহল হইতে দূরে আসুন—আমরা আমাদের ভাষার বিরাট রূপের সান্নিধ্যে যাইয়া দেখি—সেখানে বিশাল পল্লী-সাহিত্য-সমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে—তাহা কি ভাবে, কি সংখ্যায়, কি কবিত্ব মর্য্যাদায়, অতি বিপুলকায়, ইহার সমস্তই বাঙ্গালী জাতির অবদান—এই রত্ন-বোঝাই জাহাজ আমরা অবহেলার অতল গর্ভে ডুবাইয়া দিয়া কয়েকখানি রঙ্গীন নূতন তৈরী জেলে-ডিঙ্গী লইয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছি।

মুসলমানেরা যে-সকল পুঁথি ছাপাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ও করুণ-রস আছে, আমাদের বাঙ্গলা রামায়ণ ও মহাভারত অনেকস্থলে মূলসংস্কৃতের গণ্ডী ছাপাইয়া গিয়া দেশী-উপাদানে কাব্য কথা সাজাইয়াছে—তাহাতে তাহাদের শ্রী কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। বহু মুসলমান কবি সেইরূপ হাসেন-হুসেনের কথা, সখিনার প্রেম, কারাবালার যুদ্ধ-ক্ষেত্রের কথা বিদেশের মাল-মসলা হইতে সংগ্রহ করিয়াও তাহা বাঙ্গালার নিজস্ব উপাদান দিয়া গড়িয়াছেন। যেখানে করুণ-রসের কথা সেখানে পরদেশী মূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের কবিত্বের অনুভূতি ও ভাষা।

আমরা এখানে সংক্ষেপে এই পল্লী-সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করিব এবং প্রমান করিতে চেষ্টা পাইব যে, এই বিরাট সাহিত্যে হিন্দুর অপেক্ষা

মুসলমানের দান কম নহে – বরং বেশী এবং ইহাও বুঝাইব যে, এই সাহিত্য প্রধানতঃ মুসলমানেরাই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও গুণগরিষ্ঠ-শাখা বাদ দিয়া এই সাহিত্যকে দাঁড় করাইবার চেষ্টায় আমরা যে মূর্ত্তি গড়িতেছি, তাহা আমার নিকট কবন্ধের মত মনে হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোঁড়া সামাজিকগণের নিকট তাড়া খাইয়া পল্লীর হিন্দু-গায়েন-সম্প্রদায় তাহাদের মূল-কর্ম্মক্ষেত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে, উহা এখন পর্য্যন্ত মুসলমানেরাই দখল করিয়া আছে। হিন্দুরা ছাড়িয়া দিলেও পৌরাণিক ধর্ম্ম-আদর্শের সম্পূর্ণ বাহিরে মুসলমানের কুটীরে জননীরা এই সকল রূপকথা ছাড়েন নাই। সুতরাং সমধিক পরিমাণে আমরা তাঁহাদের নিকটই উপরোক্ত এই প্রাচীন সম্পদের সন্ধান পাইতেছি। এই বৃহৎ কথা-সাহিত্যে এখন খুঁজিবার বহু বিষয় আছে। নব-ব্রাহ্মণ্য-শাসিত রাঢ় দেশ অপেক্ষা বৌদ্ধাদর্শে গড়া পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গেই এই সকল রূপ-কথার সন্ধান বেশী মিলিবে। সুতরাং আপনাদিগকে আমি এই বিষয়টি অবহিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করিতেছি। এখনও মুসলমানের জননারা স্বীয় শিশুর মুখে স্তন্য দেওয়ার সময় স্বীয় দেশের সেই সকল প্রাচীন রূপকথা বলিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করেন, মাতৃস্তন্যের ন্যায়ই তাহারা মাতৃভাষার ক্ষেত্রে পরম হিতকর খাদ্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই রূপকথা ও পল্লী-গীতিকা সংখ্যা লঘিষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু ইহারা গুণ-গরিষ্ঠ হইল কি প্রকারে? তাহা যদি না হইবে, তবে অসংখ্য কচুবনের মত, বিশাল বাঁশ-ঝাড়ের মত, বঙ্গমাতার পল্লীর প্রান্তরময় শ্যামল দূর্ব্বা-ঘাসের মত—যদি ইহারা অন্তঃসার শূন্য হয় তবে এত সিংহনাদ করিয়া সুবৃহৎ ভস্ম-স্তূপ আবিষ্কার করিয়া কি লাভ? সুতরাং আমাদের গুণের বিচার করিতে হইবে। আমি নিজ অন্তরের

অন্তরে বিশ্বাস করি যে, ঢাকার মস্‌লিনের মতই এই পল্লী-সাহিত্য গুণগরিষ্ঠ এবং ইহাদের মধ্যে মুসলমান কবিদের যে অবদান, তাহারও কবিত্ব-সম্পদের তুলনা নাই। তাহার বৈশিষ্ট্য ও গুণপনা অনেকস্থলে হিন্দু-কবিদের দানের মহিমা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এখানে মুসলমান দীন বেশে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষুদ্র কোণে জায়গা পাইলেই কৃতার্থ হইবেন না, এখানে তাঁহারা সিংহ-বিক্রমে সিংহাসন দখল করিয়া লইয়াছেন। যদি এই সাহিত্য কচুরী-পানার ন্যায় শুধু বাহুল্যের প্রভাবে নিজকে বড় বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিত, তবে ইহার মূল-উচ্ছেদ করিতে পরামর্শ দিতাম, কিন্তু এই দামী-সাহিত্যের আমি একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত। আর বেশী বাগাড়ম্বর না করিয়া এই সাহিত্যে শুধু মুসলমানগণের অজস্র দানের মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিব। আমি রাষ্ট্রনীতির খাতিরে মুসলমানদিগকে কংগ্রেসে ভিড়াইবার জন্য ফন্দী আঁটিতেছি না আমি দুই সম্প্রদায়কে এক করিয়া রাজনৈতিক-মিলনের উদ্দেশ্যবাদী নহি, আমি বুঝিয়াছি—যাহাকে আপনারা দুই মনে করিয়াছেন, তাহা এক, তাহা কোনকালেই দুই ছিল না এবং সেই একের মহিমা ও বৈশিষ্ট্য এত বড় যে, তাহার গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি—এই কথাটি বুঝাইতে পারিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কয়েকটি পল্লী-গীতিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অমি এই অধ্যায়ে কয়েকটি পল্লী-গীতিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনাদিগকে দিব। আমি দেখাইয়াছি, গীতিকাগুলির রচয়িতা হিন্দুই হউন্ বা মুসলমানই হউন্—অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের গায়েন শুধু মুসলমান। তাঁহারাই প্রধাণতঃ ইহাদের সংরক্ষক। আমি আপাততঃ যে-সকল গীতিকার কথা আলোচনা করিব, তাহার সকলগুলিই মুসলমান কবিদের রচিত।

১। প্রথমতঃ 'মাণিকতারা' বা 'ডাকাইতের গান'টি সম্বন্ধে লিখিব। কবি জামায়েতুল্লা লিখিয়াছেন,--তিনি বৃদ্ধবয়সে এই গান রচনা করিয়াছেন. আমীর নামে আর একটি লোকের ভণিতা গানটির একটি স্থলে পাওয়া যায়, কিন্তু আমার মনে হয়, এই আমীর গায়েন ছিলেন, কবি ছিলেন না। পালাটি ৮০০ ছত্রে সম্পূর্ণ, কিন্তু এই গীতিকাটি খণ্ডিত। বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার এক তৃতীয়াংশ মাত্র সংগ্রহ করিয়া পরলোকগমন করেন, বাকি দুই তৃতীয়াংশ উদ্ধার হয় নাই। চন্দ্রকুমার দে মাত্র আর একটি পৃষ্ঠা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সেই প্রাপ্ত-অংশ ২০।২৫ ছত্র, ৮০০ ছত্র একতৃতীয়াংশ হইলে সম্পূর্ণ পালাটি হয়ত আনুমানিক ২৪০০ পংক্তি হইত।

এই গীতিকাটিতে যে খুব উচ্চ-দরের কবিত্ব আছে তাহা নহে। মাঝে মাঝে মেঘান্তরিত রৌদ্র এবং ঘন-বিন্যস্ত ঘটনারাশির মধ্যে মধ্যে কাব্য-লক্ষ্মী উঁকি মারিয়া যান মাত্র। কিন্তু কাব্যটি আগন্ত গূঢ় নাট্যশিল্পে গ্রথিত। লেখা একেবারে বাহুল্য-বর্জ্জিত ও সরল পাড়াগেঁয়ে ভাষায় এই গীতিকা লিখিত হইয়াছে। বিষয়টি সংক্ষেপে এই—

"বিশু-নাপিত অতি দরিদ্র ছিল, তাহার পাঁচটি পুত্র ছিল। সে স্ত্রী ও সন্তানগণ লইয়া কুটীরে বাস করিত এবং ভিক্ষা করিয়া খাইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার চারিটি পুত্রই অকালে মৃত্যুমুখে পড়িল। নিদারুণ শোকগ্রস্ত বিশু নদীর ভাঙ্গন-পাড়ে বসিয়া বিলাপ করিতেছিল, হঠাৎ পাড় ভাঙ্গিয়া নদীর জলে পড়িয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল। একমাত্র অবশিষ্ট শিশু-পুত্র বাসু ও তাহার বিধবা-মাতা গৃহে রহিল। বাসুর মাতাও গলায় ফাঁসি লাগাইয়া মরিবার জন্য বনেরদিকে ছুটিল, কিন্তু বাসুর মুখ দেখিয়া সে মৃত্যুর সঙ্কল্প ত্যাগ করিল।

"পাড়ায় তাহাদের আত্মীয়-স্বজন কেহই ছিল না। কিন্তু কোচ জাতীয় কানুর মাতা এই দুর্দ্দশাপন্ন মাতা-পুত্রের সহায় হইল। ক্রমে বাসু বড় হইল এবং তদপেক্ষা তিন বৎসরের বড় কোচ কানুর সঙ্গে বন্ধুত্ব-পাশে আবদ্ধ হইল। কোচ কানু—বাসুকে ডাকাতি করিতে শিখাইল। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাহার স্ত্রীকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া কানু ও বাসু বিস্তর ধন-দৌলত পাইল। এই সংবাদ শুনিয়া বাসুর মা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং মনস্তাপে জ্বরগ্রস্ত হইয়া কয়েকদিনের মধ্যে মারা গেল। ইহার পর সামান্য কিছুকাল অনুতপ্তভাবে দিন কাটাইয়া বাসু আবার কানুর সঙ্গে ডাকাতি করিতে লাগিল। এই সময় শিমুলতলা গ্রামবাসী সাধু শীলের কন্যা মাণিকতারার সঙ্গে বাসুর বিবাহ হইয়া গেল। কানু ও বাসুর প্রধান শত্রু ছিল কালু ডাকাত; সে একদা একটি খুব লাভের স্থলে ডাকাতি করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। ইতিমধ্যে কানু ও বাসু পূর্ব্বেই টের পাইয়া সেই স্থানে ডাকাতি করিয়া সমস্ত অর্থ-সম্পদ দখল করিল। কালু-সর্দ্দারের মুখের গ্রাস এইভাবে লুণ্ঠিত হওয়ায় সে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কানুর দলকে অনুসরণ করিল এবং যদিও বাসু নাপিত টাকাকড়ি লইয়া পূর্ব্বেই পলাইয়া গিয়াছিল, কালু-সর্দ্দার—কানু-কোচকে ধরিয়া

ফেলিল এবং পরদিন তাহাকে হত্যা করিবে এই স্থির করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিল।

"ইতিমধ্যে বাসু তাহার স্ত্রী মাণিকতারার কাছে সকল কথা বলিলে—সে তাহার পিসি পাখু নাম্নী অল্প বয়স্কা বিধবা ও কয়েকটি তরুণ পুরুষকে নর্ত্তকীর সাজে সাজাইয়া এবং নিজেও অলঙ্কার পরিয়া একটা সৌখীন ডিঙ্গিতে নদীপথে রওনা হইল। তাহারা নাচ ও গানের আসর জমাইয়া জৌলস করিতে করিতে চলিয়াছিল। সেই রাত্রে কালু-সর্দ্দারের পুত্র দলু মিয়ার বাড়ীর নিকট দিয়া ঐ নৌকা যাইতেছিল। দলুকে মাণিকতার' প্রলোভন দেখাইয়া নৌকায় লইয়া আসিল এবং পাঁচজন ছদ্মবেশী নর্ত্তকী তাহার হাত-পা বাঁধিয়া নিজেদের বাড়ীরদিকে লইয়া চলিল। তাহাদের সঙ্কল্প—কালু-সর্দ্দার যদি কাসু-কোচের কোন অনিষ্ট করে, তবে কালুর একমাত্র পুত্র দলুকে তাহারা হত্যা করিবে।"

এই খণ্ডিত পালাটি এইখানেই শেষ হইয়াছে। প্রথমেই ব্রহ্মপুত্র নদের বর্ণনা—

"এদেশের উত্তর মাথালে আছে নদী বরাবর।
নদী নয়রে সাত সমুদ্র দেখতে ভয়ঙ্কর॥
দেশের লোকে ডাকে তারে ব্রহ্মপুত্র কয়।
আওয়াজ করে ব্রহ্মদৈত্য পানির তলে রয়॥
হায়রে গাঙের কি বাহার॥
ওরে তার এপার আছে, ওপার নাইকো,
চোখে মালুম হয় না তার।
ওরে তার পানির তলে পাক পইড়াছে,
দেখ্‌তে লাগে চমৎকার॥

বাও চালালে তুফান ছোটে, নাও ছাড়েনা কর্ণধার।
চালি সমান গড়ান ভাঙ্গে, ফ্যানা উঠে মুখে তার॥
কত শিশু ঘইরাল বাসা ছাড়ে, চক্ষে ত্বাহে অন্ধকার।
গাছ-বৃক্ষি চুবন খাইয়া ভাইসা যায়রে পুব পাহাড়॥
হায়রে গাঙ্গের কি বাহার॥"

কিন্তু আকাশে যখন বাতাস বহে না, ঝড়-বৃষ্টি নাই—তখন এই ব্রহ্মপুত্র—

'মাটীর মতন পইড়া থাকে, মুখে নাইরে রা।

*　　　*　　　*

ভাতের থালি যেমন ভাইরে সোমান থাকে তলি।
এম্নি মোতন থাকে নদী বাও-বাতাস না পাইলি॥"

গঞ্জের হাটের কাছে ব্রহ্মপুত্রের খেয়া আছে। শত শত জেলে-ডিঙ্গি ও খেয়া-নৌকা—

"বৃষ্টি বাতাস বাও মানে না তুফান মাইজ চলে।
নছিব মন্দ হইলে রে ভাই, তলায় পানির তলে॥"

এই নদী পাড়ি দিতে দশ কাহন কড়ি লাগিত—

"চারি কুড়ি কড়ি গুইনা লইলে হয় রে এক পোণ।
ষোল পোণ কড়ি হইলে হয় এক কাহোন॥
বরমপুত্র পাড়ি দিয়া দশ কাহোন দিছে কড়ি।
মাটী পাইয়া লোকে কইত আল্লা-রছুল-হরি॥
দশ কাহোন পাড়ির মাশুল পাইয়া সেরপুর গিরাম।
সেই জন্মে হইয়াছে ভাইরে, দশ কাহনিয়া নাম॥"

এই নদ তখন ডাকাতির একটা প্রধান আড্ডা ছিল—

"কেউ বলে ভাল, কেউ বলে মন্দ থাকত নায়ের মাঝি।
দিন দুপুরে মারত ছুরি হায় রে এমন পাজি॥

সুইটা নিত, কাইড়া নিত জহরপাতি যত।
ঐরান জঙ্গলে নিয়া নেংটা ছাইড়া দিত॥
কেউ বান মাথায় কুড়াল মারে, কেউ বান কাটে গলা।
হস্তপদ বন্ধন কইরা দেয়রে পানির তলা॥
খুইলা নিত জহরপাতি ও যা অঙ্গে পইরাছে।
ঝাঁপি টোপলা খুইলা নিজে দিত ওস্তাদের কাছে॥"

এই ওস্তাদ অর্থ—দস্যুদের সর্দ্দার। পাঠক দেখিবেন, ভাষা ও ছন্দ পাড়াগাঁয়ের খালের মত ক্রীড়াশীল ও সহজ গতিতে চলিয়াছে, তাহা দুরূহ পাণ্ডিত্যের বাঁধ-দ্বারা রুদ্ধগতি বা ভারাক্রান্ত হয় নাই। কবি যাহা বলিয়া যাইতেছেন তাহার ভাষা শিশুর কথার মত অবাধে তাঁহার মুখে ছুটিতেছে, তাহাতে কোন চেষ্টা নাই, কোন কৃত্রিমতা নাই।

এই গঞ্জের ঘাটে বিশু-নাপিত চারি পুত্র হারাইয়া বিলাপ করিতেছে; একমাত্র অতি শিশু বাসু অবশিষ্ট। কিন্তু মাথায় করাঘাত করিয়া বলিতেছে—

"এক বাসু পেটি তেল কাইত হলেই সব গেল
মা বাপের অঞ্চলের নড়িরে।"

পতির মৃত্যুতে বাসুর মা আত্মহত্যা করিতে বনে যাইতেছে,—

"এই কথা না বলিয়া নারী মরিবারে যায়।
পাছে থনে মা-মা বলি' বাসু ডাকে মায়॥
ফিরা চাইয়া বাসুর মা দেখল সোনার মুখ।
সোন্তানের মোমতা আইসা ছাইয়া নিল বুক॥
ভুইলা গেল পতির কথা, আর পেটের জ্বালা।
আমির কয় আর মরবা ক্যানে চক্ষু মুইছা ফ্যালা॥"

বহু কষ্টে বাসুর মা তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ের অনাথা মেয়েদের এমন নিখুঁত ও খাঁটি দুরবস্থা আর কোন প্রাচীন কবি দিতে পারেন নাই, কবি কঙ্কন স্বয়ংও নহেন। বাসুর মা এতটা সহিয়া ছিলেন এই আশায় যে, বাসু বড় হইয়া স্বীয় জাতি-ব্যবসায় করিয়া সুখে সংসার করিবে। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়িল, বাসুকে কানু-কোচ ডাকাতি শিখাইল।

ব্রহ্মপুত্র-গর্ভে বুড়া বামুন ও বামুনীকে যে ইহারা কি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল, তাহার এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে, যাহাতে মনে হয় - যেন চলচ্চিত্রের মত কবি হুবহু ছবি দেখাইতেছেন। সেই অমানুষিক নিষ্ঠুরতা করিয়া বাসু বহু সম্পদ লইয়া বাড়ী আসিয়া তাহার মাতাকে ঝাঁপি দেখাইল—

"কথা শুইনা বাসুর মা টোপলা যে খুলিল।
আন্ধার ঘর আলো কইরা চক্ষু ভইরা গেল॥
বেশর আছে, ঝুম্‌কা আছে, আছে নাইরকল-ফুল।
চিক আছে, সীতিআছে, আর কন্ন ফুল॥
সোনার মাথা বাজু আছে, আছে বুকের পাটা।
সোনার হাঁসলী গাঁথা আছে কান-খোঁচানী কাঁটা॥
নত্তে আছে চুনি-মণি আর মুক্ত ঝুলমুল।
গোঙা বাইশেক তাবিজ আছে, আর যে বক-ফুল॥
চন্দ্রহার, সুরুজ হার, রূপার বাঁক্ খাড়ু।
চরণ-পদ্মে বান্ধা রইছে গুজরী দুই গাছ সরু॥
সুলতানী মোহর আছে বাদশাহের টাকা।
আর আছে ছোট বড় সোনা-রূপার চাকা॥
খইড়কা মুষ্টি আর আছিল আগুন পাটের শাড়ী।
সোনার বাটী, আভের কাঁকুই, সোনার আজুরী॥"

কিন্তু যখন ধর্ম্মভীরু এই দরিদ্রা রমনী শুনিল, ব্রহ্মহত্যা করিয়া তাহার পুত্র এই সকল সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, তখন সে যে পুত্রের জন্ম ঢেঁকি পাড়িয়া, চরকা চালাইয়া, প্রাণপণে খাটিয়াছে, যাহার চাঁদপনা মুখ দেখিয়া সে সকল জ্বালা ভুলিয়াছে এবং আত্মহত্যা করিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই পুত্রের মুখ সে আর দেখিতে চাহিল না এবং "জন্মিয়াই কেন না মরিল"—এই কথা দুইটি বলিয়া সে মুখ ফিরাইল। তাহার তখন ভয়ানক জ্বর হইল। এইখানে কবি তিনকড়ি কবিরাজের অবতারণা করিয়াছেন। অতি সংক্ষেপে কবি যে-সকল ছবি আঁকেন, তাহা এখনকার ফেনানো, বাক্য-পল্লব-স্ফীত বর্ণনাগুলি হইতে কত পৃথক তাহা কবি জামায়েতুল্লা-প্রদত্ত এই কবিরাজের মূর্ত্তি দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন—

"পহর তিন হাইটা বাসু যায় ত্বরা-ত্বরি।
তিনকড়ি যে মস্ত বৈদ্য পাইল তার বাড়ী॥
হাঁক ছাড়িয়া ডাকে বাসু কবিরাজ ম'শায়।
আমার মা যে য়্যাহন্-তহন তোমার যাতি হয়॥"

* * *

"তিনকড়ি কবিরাজ শুনি ধুতি-চান্দর লইল
চান্দরের খুঁটের মধ্যে সব দাওয়াই বাইন্ধা লইল॥
হাতে নৈল বাঘা নাঠি, কাঁধে নৈল ছাতি।
তুলসী তলায় যাইয়া বৈদ্য ঠেকাইল তার মাথি॥
কিষ্টবন্ন শরীরখানি, ত্যাল-ত্যালা তার গাও।
খাটা-খুটা নাকা-গোফা ফাটা-ফাটা গাও॥
কুত-কুতিয়া চায় কবিরাজ, গুড়-গুড়িয়া যায়।
পাছে পাছে বাসু নাই উপ্তা-উছট্ খায়॥

বাসুর বাড়ী যাইয়া বলে বৈদ্য তিনকড়ি।
তোমার মা যে ভাল হবে খাইয়া তিন বড়ি ॥
আইজ দিবা বনের ছাল, আর নিমপাতার ঝোল ॥
কাইলকা দিবা গরম কইরা সজ-ভিজাইনা জল ॥
পশু´ দিবা লাল বড়িটা কাঞ্জী দিয়া গুইলা।
তশু্য দিবা নীল বড়িটা কুঁয়ার পানি তুইলা ॥
শেষাশেষি দিবা বাসু এই না ধলা বড়ি।
আরাম হইবে তোমার মা থাক্‌বে না জ্বর-জারি ॥
চাকুইল ধানের ভাত খিলাইও, শরীরে ঢাইল জল।
ধলা বড়ি খাওয়াইলে দিও তেঁতুলের অম্বল।”

*　　　*　　　*

“কবিরাজের কথা শুইনা বাসু নিল বড়ি।
বিদায় হবার সময় হয় যে কৈল তিনকড়ি ॥
এক কুলা চাইল দিল, ডাইল এক কুলা।
গাছের থনে তুইলা দিল বাগুন-মরিচ-কলা ॥
হলদি দিল, লবণ দিল পেটী বইরা তেল।
বিদায় পাইয়া কবিরাজ হাস্‌তে হাস্‌তে গেল ॥
সইন্ধ্যা বেলা বাসুরা মা যে চক্ষু মেইলা চাইল।
জন্মের মত বাসুকে ফেইলা সগ্‌গে চইলা গেল ॥”

এইদিকে বাসু ও কানুর দস্যু-বৃত্তি, মানুষের জীবন লইয়া নিষ্ঠুর খেলা, নৃশংস-বৃত্তি, অপরদিকে—অতি দরিদ্রা, অতি স্নেহাতুরা আদর্শ সতী আদর্শ মাতা বাসু-জননীর ধর্ম্ম-ভীরুতা ও অসহ্য পরিতাপ ও শোকাবহ মৃত্যুর ছবি—বাঙ্গালার কুটীরের এই চিরন্তন সম্পদ!

ইহার পর বাস্থ স্বয়ং উপযাচক হইয়া শিমুলতলাবাসী সাধু-শীলের নিকট তাহার কন্যা মাণিকতারাকে যাচ্ঞা করিতেছে। সাধু-শীলের গৃহের পারিবারিক দৃশ্য—রন্ধন গৃহে তাহার পুত্রগণের বীরত্বের অভিনয়, বউএর ডাল ফুটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা ও পর পর নানা খাদ্যের আয়োজন, তাহাদের আতিথেয়তা ও কুসংস্কার, বাস্থর পাত হইতে তাহার লোলুপ-দৃষ্টি বঞ্চিত করিয়া উৎকৃষ্ট ভাজা খাদ্যগুলি তুলিয়া লওয়া প্রভৃতি লইয়া যে বাস্তব-চিত্র অবতারিত হইয়াছে, তাহা সরল অথচ সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক, সত্য ও রহস্য-প্রিয়তা-মণ্ডিত—সে বর্ণনার তুলনা নাই। বাস্থ প্রথম গঞ্জের হাটে তাহাদের নিজ বাড়ীতে একদিন সেই মাণিকতারাকে দেখিয়াছিল। সে তখন ছোট, এখন পূর্ণযৌবনে বাস্থর মায়ের সেই স্নিগ্ধ আদর-আপ্যায়ন মাণিকতারার মনে ছিল। সে বাস্থকে বলিতেছে—

"বাপ-মায়ের সাথে আমি যাইয়া অন্দরে।
পথ চলিতে দেইখা আইলাম রইচ তুমি ঘরে॥
ফুল-বাতাসা দিয়া খাইলাম বিন্নি-ধানের খই।
তোমার মা যে আইনা দিল গামছা-বাঁধা দই॥
তোমার মা কৈল হাইসা আমাকে কোলে নিয়া।
আমার ঘরে আইস মা ঘরের লক্ষ্মী হইয়া॥"

মাণিকতারার অনুরাগ সেই শৈশব হইতে অঙ্কুরিত, আজ "বাইলা খালির" জলে উভয়ে উভয়কে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। বাস্থ ভাবিল—এই নদীর তীর উজ্জ্বল করিয়া "বালিয়া খালির" স্রোত এই রূপসীর আঁচল ধরিয়া টানিতেছে—

"বাইলা খালির টলটলা জল আঁচল ধইরা টানে॥
ধন্য হৈল শিমুলতলা, বাঁইচা থাক তুমি।
ধান-দূর্ব্বা আর মইলকা (মল্লিকা) দিয়া পূজা করমু আমি।"

"দেইখাছি গোঞ্জের ঘাটে, আজ দেখলাম খালে।
আমার দেবতা আইছে আজ আমার কপালে॥"

রূপসী মাণিকতারাকে বিবাহ করিয়া বাসু সোয়াস্তি পাইতেছে না। সে-যে ডাকাতি করিয়া খায়, ইহা শুনিলে যদি পত্নী বিরক্ত হ'ন! অথচ সে এতটা অগ্রসর হইয়া দল বাঁধিয়াছে যে, সে এই বৃত্তি আর এখন ছাড়িতে পারে না। সে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ হইয়া আনমনা হইয়া থাকে, মাণিকতারার চক্ষে এইভাব এড়ায় না, সে একদিন স্বামীকে ধরিয়া পড়িল এবং তাহার হৃদয়ের গুপ্ত-ব্যথা প্রকাশ করিতে জেদ করিয়া বসিল। তখন বাসু ধীরে ধীরে তাহার দুষ্কৃতির কথা জানাইল এবং গৃহে মাটীর নীচে সঞ্চিত অজস্র অর্থ দেখাইল। মাণিকতারার নৈতিক-আদর্শ প্রশংসনীয় না হইলেও সে ছিল আদর্শ সতী। সে বলিল—"স্বামীর যে গতি, আমারও সেই গতি। তুমি ধরা পড়িয়া জেলে যাইবে কিংবা ফাঁসিতে ঝুলিবে আমি কি তাহা নীরবে দেখিব? আমি প্রাণ দিয়া তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি যদি ডাকাত হও, আমাকে তোমার ডাকইনী বলিয়া জানিবে।"

"পতির ভালবাসা পাইলে জুড়ায় নারীর বুক।
পতির কাছে আদর পাইলে নারীর সেরা সুখ॥
পতি যেমন আঁধার ঘরে প্রদীপ হৈয়া জ্বলে।
সাপের মাথায় মাণিক পতি সতীর কপালে॥"

এইবার বাসু সোয়াস্তি পাইল। তাহার হারিকেল-পাখীর মাংস খাইবার সাধ হইল। মাণিকতারা বাপের বাড়ী হইতে তাহার তীর-ধনু আনাইয়া দুইটা হারিকেল-পাখী একবারে শিকার করিল; বাসু তাহার এ-বিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইল। মাণিকতারা বলিল—"দারু আর সুমারু কোচ থাকত রাজার বাড়ী।" তাহাদের কাছে ছোট বেলায় সে তীর-ধনুকের অদ্ভুত শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

সে বাঈ সাজিয়া যেভাবে দারু খাইয়া নিভৃতে প্রেমের খেলা খেলিবার লোভ প্রদর্শণ পূর্ব্বক কালু-সর্দ্দারের ছেলে দলু মিয়াকে বন্দী করিয়াছিল, তাহা দুর্গেশনন্দিনীর বিমলার চাতুর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু মাণিকতারার ছদ্মবেশে নৌকায় অভিনয়ের ভিতর এরূপ বাস্তবতাপূর্ণ গ্রাম্য-চিত্রণ আছে, যাহা বঙ্কিম বাবু দেখাইতে পারেন নাই।

কবি জামায়েতুল্লার রহস্য-প্রিয়তার পরিচয় অনেক ছত্রেই আছে। আমরা তাঁহার আখ্যান-বর্ণনার মধ্যে একটা উজ্জ্বল সকৌতুক দৃষ্টির সন্ধান পাই, যাহাতে সমস্ত আখ্যায়িকাটি রহস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ত্বরান্বিত তুলিকার দ্রুতগতির মধ্যে মধ্যে দুই-একটি ছত্রে এক-একটি জীবন্ত-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শৈশব অতিক্রম করিয়া বাসু যৌবনে পা দিয়াছে—'বিশ বচ্ছুরা যুয়ান' বাসু 'পাড়ায় পাড়ায় ঝোঁপ-জঙ্গলে লাফায় জানি ঘোড়া'। আবার—

"সাকুরেদ্ হৈল বাসু নাই, ওস্তাদ কানু-কোচ।
মানুষ, গরু কেউ মানে না, ফুলাইয়া ফিরে মোচ॥"

অনেক স্থানে কবির ভাষার সময়-অসময় জ্ঞান থাকে না। যেখানে বৃদ্ধ বামুন ও বামুণীকে কানু ও বাসু নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতেছে, সেখানেও কবির এই অসাময়িক ব্যঙ্গ-প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কানু বুড়া বামুনের মৃত্যুকালীন অবস্থা-প্রসঙ্গে বলিতেছে,—"দাইড়া ঠাকুর দাড়ি নাড়চে ছাগল যেমন নাড়ে।" রসুইঘরে রান্নার বিলম্বে ছেলেরা বৌ-ঝিদের উপর খাপ্পা হইয়া গালি দিতেছে, ক্ষুধার জ্বালায় এক পুত্র তাহার স্ত্রীকে প্রহার পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইল—

"সোয়ামী আইল রাগ করিয়া ধল্ল চুলের মুঠি।"

অন্যত্র—

"ভাসুর করে কিচির-মিচির, দেওরে করে রাগ।
ফোঁটা-তিলক কাইটা হউর সাইজা রইছে বাঘ॥"

কখনও কখনও জামায়েতুল্লা হিন্দুদের আচার-ব্যবহারের উপর একটু বিদ্রূপের শর হানিয়াছেন, কিন্তু এই কটাক্ষকে শর বলিতে আপত্তি নাই; ইহা ফুলশর—ইহাতে তীব্রতা বা খোঁচা নাই। স্ত্রী-আচার অনুসারে বঙ্গের কোন কোন পল্লীতে ইন্দুরের মাটী দিয়া মাতৃ-ঋণ শোধ করিতে হয়। এই উপলক্ষে কবি বলিতেছেন—

> "সেখ বয়াতি জামায়েতুল্লা হাইসা হাইসা কয়।
> কথা শুইন্যা দুঃখে মরি এইবা কি আর অয়॥
> মায়ের বুকের এক ফোঁটা দুধ হয় মা ঋণ।
> দুনিয়ার কেহ নারে শুঝ্‌বার সেই ঋণ॥
> হেন্দুর শাস্ত্র, মহা শাস্ত্র, এই কথা কি খাঁটি।
> বেবাক্ ঋণ শুইঝা গেল দিয়া এন্দুর মাটী॥"

আমরা এই পালাটি সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখিব না ইহা অসম্পূর্ণ হইলেও যে-সকল দৃশ্যপটের মধ্যে দ্রুতগতি ছবিগুলি চোখে ধাঁধা দিয়া চলিয়া যায়—ইহার নর-নারীর চরিত্র ও ঘটনাগুলি সেইরূপ ক্ষণেকের জন্য মনের উপর দাগ রাখিয়া চলিয়া যায়। দৃশ্যগুলি অতি স্পষ্ট, তাহাদের পরিকল্পনা কোনরূপ আয়াস-সম্ভূত নহে। এ-যেন রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশের নীচে—যে আলো ও ছায়ার বাস্তব খেলা চলিয়াছে, তাহা আলো-চিত্রে রূপায়িত করিয়া অতি সহজে কেহ ধরিয়া রাখিয়াছেন। এই অসম্পূর্ণ কাব্য বাঙ্গালার পল্লী-জীবনের যে ছন্দ দেখাইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার সর্ব্বংসহা, স্নেহাতুরা, ধর্ম্মপ্রাণা মাতার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। রূপসীর চোখে ধাঁধা দেওয়া সৌন্দর্য্য, তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি, উপস্থিত বুদ্ধি ও দোষ-গুণের বিচার-রহিত দাম্পত্য-প্রেম এবং অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বনে প্রস্তুত নারী-প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে। বাহ্য-প্রকৃতির নদ-নদী-সঙ্কুল অরণ্য ও গিরিপথ এবং পল্লী-

সমাজের লোক-চরিত্র এমনভাবে চক্ষের সম্মুখীন হইয়াছে—যেন আমরা আমাদের হারানো-পল্লীকে এই কাব্যে এমন করিয়া পাইয়াছি, যেরূপ শত পণ্ডিত-কবি্ আমাদিগকে দিতে পারিতেন না। এই পালা গানটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; এ বিষয় আমরা 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছি।

২। 'মাঞ্জুর মা' গীতিকাটি এক মুসলমান কবির লিখিত। ইহাতে মণির নামক এক সাপের ওঝার কথা বর্ণিত হইয়াছে। পালাটির ভাষা দেখিয়া মনে হয়, ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা। ইহার বিষয়-বস্তু সামান্য এবং ইহা গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রান্ত।

"মণির ছিল সাপের ওঝাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সে স্ত্রীলোক বিদ্বেষী ছিল। কোনখানে যাত্রাকালে স্ত্রীলোকের মুখ দেখিলে সে দুর্লক্ষণ মনে করিয়া ফিরিয়া আসিত। তাহার বাড়ীর সংলগ্ন মসজিদে পর্য্যন্ত সে কোন স্ত্রীলোককে ঢুকিতে দিত না। সে মনে করিত—তাহারা সকলেই নষ্টা, অবিশ্বাসিনী ও দুষ্ট-প্রকৃতির। এদিকে ওঝা-হিসাবে সে এতবড় ছিল যে, যে সাপে-কাটা রোগী মরিয়া একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, তাহাকে সে গারুড়-মন্ত্র বলে নবজীবন দিত। দেশ-দেশান্তর হইতে সর্পদষ্ট-রোগীর লোকেরা তাহার দুয়ারে ভিড় করিত।

"জামাল ফকির নামে এক অতি দরিদ্র ব্যক্তি তাহার অপোগণ্ড একটা কন্যা লইয়া নদীর পাড়ে বাস করিত। তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছিল এবং সংসারে আর কেহ ছিল না। জামাল ফকিরকে সাপে কামড়াইল। বহু ওঝার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সে মৃতপ্রায় হইল, পাঁচজন ওঝা তাহাদের প্রধান মণিরকে ডাকিয়া আনিল। কিন্তু দৈবক্রমে এতবড় ওঝার প্রতিপত্তি এবার রহিল না, জামাল ফকিরকে মণির বাঁচাইতে পারিল না। সেই

শবের পার্শ্বে তাহার অনাশ্রয়া, ফুটফুটে সুন্দরী শিশু-কন্যাটি মাটীতে পড়িয়াছিল, তাহাকে একান্তরূপে সহায়-বর্জ্জিতা দেখিয়া মণির ওঝা তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিয়া লালন-পালন করিতে লাগিল। মণির চির কুমার, সামাজিক কোন সংস্কারের আকর্ষণেই সে এ পর্য্যন্ত ধরা দেয় নাই। এবার শিশুটির নির্ম্মল হাস্য ও সৌন্দর্য্য তাহাকে ভুলাইল। সে দিন-রাত মেয়েটিকে কোলে-কাঁখে করিয়া ফিরিত।

"এদিকে মেয়েটি যৌবনে পদার্পণ করিয়া অপরূপ রূপবতী হইয়া উঠিল, তখন মণির পৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে পৌঁছিয়াছে। মণির ভাবিল—"এই যুঁই ফুলের মত নির্ম্মল ও সুন্দরী কুমারীকে কার হাতে দিব? কোন্ পাষণ্ড ইহাকে উৎপীড়ন করিয়া আমার পালিত-কুসুমটিকে পদতলে দলিত করিবে?" অনেক চিন্তার পর সে ঠিক করিল—ইহাকে তাহাব নিজেরই বিবাহ করা উচিত। সে কামের-বশীভূত হইয়া এই সঙ্কল্প করে নাই, তাহার চিত্তে রূপজ-মোহও কিছু ছিল না। তাহার এত যত্নের মাঞ্জুর মাকে পাছে কেহ কষ্ট দেয়, এই পবিত্র ফুলের কুঁড়িটি পাছে কোন পাপিষ্ঠের স্পর্শে মলিন হয়; এই আশঙ্কাই তাহার সিদ্ধান্তের মূলে ছিল। হয়ত বৃদ্ধ বয়সে সে সেই সেবাপরায়ণা সুন্দরীর হাতের যত্ন ও শুশ্রূষা পাইয়া সেই সেবার প্রতি তাহার একটা লোভ হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কোন স্বার্থ-চিন্তা, কামুকতা ত নহেই, এই অসম-বিবাহের ইচ্ছার মধ্যে ছিল না। চারিদিকে অনেক বৃদ্ধ হিন্দু-মুসলমান অল্প-বয়সের রমণীদিগকে বিবাহ করিত, এই সকল দৃষ্টান্ত তাহার চোখের উপর ছিল। সুতরাং তাহার দিক হইতে এই কার্য্য খুব গর্হিত বলিয়া তাহার মনে হয় নাই এবং সে এই মেয়েটির প্রতি শুভেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই এই কার্য্য করিতেছে—এই ভাবিয়া সে নিজেকে অপরাধী মনে করিতে পারে নাই। কিন্তু গ্রাম্য

কবির তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিতে বিবাহটি অতি অশোভন মনে হইয়াছিল, তিনি লিখিলেন—

"লাল পরী যেন পিশাচের হাতে পড়িল।
পদ্মের কলি যেন গোময়ে ডুবিল॥"

"এক জুমাবারে বিবাহ হইয়া গেল। মাঞ্জুর মা বাল্যকালে তাহার প্রায়-সমবয়স্ক হাসান নামক এক বালকের সঙ্গে খেলা করিত এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যেই অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, মণির তাহাদিগকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিবে। মণির অতর্কিতে স্বয়ং বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলে এই প্রণয়ী-যুগলের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল।

"বৃদ্ধ মণির অনেক চিন্তা করিয়া সুন্দরী ষোড়শীকে বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু সে যুবতীদের প্রাণের ক্ষুধার কোন খবর রাখে নাই। তাহা যে ধন-মান, অবস্থার আরাম প্রভৃতি সকল কথার উর্দ্ধে—মনের মত স্বামী লাভ করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করে, এই তত্ত্ব বৃদ্ধ মণির বুঝিতে পারে নাই। এই দিকদিয়া তাহার ঠিকে ভুল হইয়াছিল। বিবাহের পরে গোপনে মাঞ্জুর মা'র সহিত হাসানের মিলন হইত—কত অশ্রু. কত সোহাগের লীলায় এই গুপ্ত-প্রেম মঞ্জুরিত হইয়া উঠিত। শেষে রোগী দেখিতে মণির ওঝা তিন দিনের জন্য গৃহ ছাড়িয়া গেলে যুবক-যুবতী উধাও হইয়া গেল। মণির তিন দিন পরে বাড়ীতে ফিরিয়া মাঞ্জুর মা'কে না পাইয়া উন্মত্তবৎ তাহাকে কয়েক দিন খুঁজিয়া বেড়াইল এবং শেষে নদীতে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিল।"

গল্পটি এইরূপ। কৃষক-কবির ইহাতে আশ্চর্য্য কৃতিত্ব আছে। মণির ও মাঞ্জুর মা এই উভয় চরিত্রকে তিনি হৃদয়ের দরদ দিয়া গড়িয়াছেন। কলঙ্কিনী ও গৃহ-ত্যাগিনী মাঞ্জুর মা'র প্রতিও তাঁহার অপার করুণা। এই

তরুণ-বয়স্ক প্রণয়ী-যুগলের চিত্র অতি স্বাভাবিক হইয়াছে। মাঞ্জুর মায়ের মনের দুঃখ তিনি নিজের অন্তর দিয়া বুঝিয়াছেন। এস্থলে—এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে কোন হিন্দু-কবি পতিতা রমণীর চিত্র এরূপ উজ্জ্বল ও হৃদয়-গ্রাহী করিয়া গড়িতে পারিতেন না; সাধারণ সংস্কারে সে নষ্টা ও কুলত্যাগিণী। হিন্দু-কবি সেকালে এইরূপ প্রসঙ্গে নিন্দা ও অভিসম্পাতের ভাষায় মাঞ্জুর মা'র চরিত্রের অপরদিকটার প্রতি তীব্র মন্তব্য করিতেন। কিন্তু স্বভাব-কবি ইহাদের কোন কামকলা বা শ্লীলতা-হীনতার চিত্র চিত্রিত করেন নাই, আশা-ভঙ্গে ও মনোভঙ্গে কাতর প্রণয়ী-যুগলের মিলনেচ্ছা ও পরস্পরের জন্য উৎকণ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সহস্র সংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও মানবের হৃদয়-শতদলে যখন প্রেম অঙ্কুরিত হয়, তাহা কবি ও দরদীর চক্ষে সুন্দর লাগিবেই। এই নর-নারার প্রেম যখন যৌবনকালে অতৃপ্ত বাসনা লইয়া তাহাদের দুয়ারে অতিথি-বেশে দেখা দেয়, তখন স্বভাবের বশে সেই দৃশ্য মনোরম হয়। কবি সেই চক্ষে এই প্রেম-ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়াছেন। মণিরের প্রতি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও 'পিশাচ', 'রাহু', 'গোময়' প্রভৃতি উপমায় তিনি তাহার বিবাহের প্রতি মন্তব্য করিয়াছেন। সুতরাং সামাজিক জীবনের উর্দ্ধে যে প্রেমের এক মন্দাকিনী আছে, তাহার সরসতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। যদি এই প্রেম শুধু দেহের লালসা-মূলক হইত, তবে কবি এমনভাবে এই প্রণয়ী-যুগলের চিত্র অঙ্কন করিতে পারিতেন না।

মাঞ্জুর মা গৃহত্যাগ করিলে মণিরের যে চিত্র ফুটিয়াছে, তাহাও অপরূপ। মণির তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া স্ত্রীকে ভালবাসিত, সেই অনাবিল ভালোবাসায় লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সে মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতে পারে নাই যে, তাহার এত সাধের মাঞ্জুর মা কোন গুপ্ত-প্রণয়ীর সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছে। সে বৃদ্ধ হইলে কি হয়—

তাহার মন শিশুর মত সরল ও বিশ্বাসপরায়ণ ছিল। সে কত কি ভাবিয়াছে,—মাঞ্জুর মাকে হয়ত দস্যুরা জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে। হয়ত বা বাঘে ধরিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে, এইরূপ কত কি! কিন্তু সে একবারও ভাবিতে পারে নাই যে, তাহার মাঞ্জুর মা বিশ্বাস-ঘাতিনী। সে উন্মত্তবৎ জঙ্গলের পর জঙ্গলে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং কেন তাহার নবণীতে-গড়া প্রেম-প্রতিমাকে লুণ্ঠিত হওয়ার জন্য, অথবা পশুর খাদ্য হওয়ার জন্য গৃহে একাকী ফেলিয়া গিয়াছিল। এই অনুতাপে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অপরাধী মনে করিয়া, জল-স্থল খুঁজিয়া যেমন করিয়া হউক, তাহাকে বাহির করিবে—বারংবার এই শপথ করিয়া পথ হাঁটিতেছে, সে পথের অন্ত নাই।

একদিকে মাঞ্জুর মা ও অপরদিকে মণির ওঝা, এই উভয়ের প্রতিই কবি সুবিচার করিয়াছেন। শত অপরাধে অপরাধিনী মাঞ্জুর মার প্রতি কবি তাঁহার সহানুভূতি হারান নাই; স্ত্রীলোক বলিয়া মানবতার মহাশাস্ত্রের বিধান তাহার প্রতি কঠোর করেন নাই। অপরদিকে শত অপরাধে অপরাধী বৃদ্ধ মনিরের ভালোবাসার দেব-ভাবটার প্রতি তিনি যে আলোকপাত করিয়াছেন, তাহাতে তাহার নির্ভরপরায়ণ, সরল চরিত্র একেবারে স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিয়াছে। বহু ক্রোশ জঙ্গল ও লোকালয় খুঁজিয়াও সে হয়রাণ হয় নাই। সে জলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া প্রেয়সীকে খুঁজিবে, এই মনে করিয়া নদীর তরঙ্গে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিল। মাঞ্জুর মায়ের জন্য তাহার শোক-গাথার একটি অংশ আমি উদ্ধৃত করিতেছি—

"মাঞ্জুর মা যে আমার, আরে দুঃখ, নয়নের মণি।
মাঞ্জুর মা যে আছিল আমার রে, নারীর শিরোমণি॥
মাঞ্জুর মা আছিল আমার কলিজার লউ।
মাঞ্জুর মা আছিল আমার সতী কুলের বউ॥

আমার না মাঞ্জুর মারে, আরে ভাল নয়নের কাজল।
আমার না মাঞ্জুর মারে ভাল গঙ্গা নদীর জল।
আমার না মাঞ্জুর মারে ভাল বুকের কলিজা।
আমার না মাঞ্জুর মারে, ভাল সাক্ষাৎ দশভূজা।
আমার না মাঞ্জুর মারে ভাল তীর্থ বারাণসী।
আমার না মাঞ্জুর মারে ভাল দেবের তুলসী।
আমার না মাঞ্জুর মারে ভাল আসমানের চান।
আমার না মাঞ্জুর মারে ভাল বেহেশ্‌তের নিশান।।"

শেষের কয়েকটি ছত্রে কবি বলিয়াছেন—"প্রেমই জগতের সার পদার্থ।"

"পীরিতি যতন, পীরিতি রতন আরে ভাল পীরিতি গলার হার।
পীরিতি করিয়া যেজন মরের, আরে ভাল সফল জীবন তার ॥"

বিচার-সাম্য, মনুষ্য-চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি ও প্রেমিকের হৃদয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য এই গীতিকাটি উচ্চ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ইহা ২০ পৃষ্ঠা-ব্যাপক একটি ক্ষুদ্র কাব্য এবং ৪৭০ ছত্রে সম্পূর্ণ। কোনও মুসলমান গায়েনের নিকট হইতে নগেন্দ্রচন্দ্র দে ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

৩। কাকন-চোরা' বা 'মনসুর ডাকাত' এর পালা—আশুতোষ চৌধুরী এই গীতিকাটি চট্টগ্রামের মুসলমান গায়েনদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। তিনি পটিয়া থানার অন্তর্গত পারিগ্রাম নিবাসী নিবারণ ছুতারের বাড়ীতে সেকেন্দর গায়েনের মুখে এই গানটি শুনিয়াছিলেন। আট ঘণ্টা ধরিয়া সেকেন্দর এই পালাটি গাহিয়াছিল। আমি এখানে আরও কয়েকটি গীতিকার বিষয়বস্তুর সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। নিতান্ত সহজ-প্রাপ্য ও চাষার দান বলিয়া আপনারা ইহাদের মূল্য দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহাদিগের অনুবাদ পড়িয়া বিমোহিত হইয়াছেন। আমাদের শত শত হিন্দু-মুসলমান

অধিকাংশই চাষী-সম্প্রদায় এই গানটি চিত্রার্পিত পুতুলের মত শুনিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে শ্রোতার বক্ষ ভেদ করিয়া যে দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছিল ও করুণ রসে আর্দ্র গদগদ কণ্ঠ হইতে যে রুদ্ধ-ক্রন্দনের অস্ফুট-স্বর সহসা শোনা যাইতেছিল, তাহা ছাড়া এই নীরব মুগ্ধ শ্রোতাদের আর কোন সাড়া-শব্দ শোনা যায় নাই। পালাটির নায়ক মনসুর ডাকাত।

"সেইত জঙ্গলে মনসুর ঘোরে অবিরত।
ভুঞের মানুষ ভাবে তারে বাঘ-ভালুকের মত॥
বাপ নাইরে, মা নাইরে, নাইরে বাড়ী-ঘর।
ডাকাতি করিয়া ঘোরে জঙ্গলের ভিতর॥
খুন করে, ডাকাতি করে, মনে নাই তার দুখ।
সিংকাঠি লৈয়া বাইর করে ঘরের সিন্ধুক॥
এমন ডাকাইত হৈল, কি বলিব হায়।
মরার কাফন চুরি করি' বাজারে বিকায়॥
দাফনের সংবাদ যখন পায় সে মনসুর চোরা।
রাইত নিশিতে স্বরু করে মরার কবর খোঁড়া॥
দুই চক্ষু দেখতে লাল, সুরুজ বরণ।
মুখের আওয়াজ যেন দেয়ার গর্জ্জন॥
মানুষ মারিতে তার দেলে দুঃখ নাই।
খুসী হৈয়া ধন-দৌলত সঙ্গীরে বিলায়॥
কেহ বলে মরা খায় ডাকাইতা মনসুর।
কেহ বলে দেও-র মতন তাহার গায়ের জোর॥
দল-বল হৈল তার নানান মোকামে।
কোলের ছেইলা শান্ত হয় কাফন-চোরার নামে।"

তথাপি এই মনসুরের প্রকৃতির একটা ভাল দিক ছিল। তাহার পিতা ছিল পাহাড়িয়া জঙ্গলবাসী লুধা গাজি। সে শরীর বলে অত্যাচারপূর্ব্বক পরস্ব লুণ্ঠন করিতে ও শরীরের ভীষণতায় একটা বন্য ব্যাঘ্র ছিল। কিন্তু মনসুরের মাতা ছিল পরমা সুন্দরী, নবনীত-কোমলা এক বাঙ্গালী রমণী। লুধা গাজী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনে এবং অত্যাচার করে, তাহার ফলে মনসুরের এই পৃথিবীতে আবির্ভাব। অত্যাচারের ফলে তাহার মাতা তাহাকে প্রসব করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মনসুর পিতার মত দুর্দ্দান্ত পশু-প্রকৃতি ছিল। কিন্তু সেই প্রকৃতির এক কোণে তাহার ধর্ম্মভীরু, কোমলা জননীর গুণের বীজ লুক্কায়িত ছিল।

একটি পরমা সুন্দরী, সদ্য বিবাহিতা রমণীকে দেখিয়া মনসুরের সত্যকার প্রেম হইয়াছিল। মেয়েটি যখন দোলায় চড়িয়া প্রথম শ্বশুর-বাড়ীতে যাইতেছিল, সেই সময় জঙ্গলের পথে মনসুর তাহাকে ধরে। কবি রাত্রির জ্যোছনার বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র দুই পংক্তিতে। এই কবিত্ব বহু পণ্ডিত-কবির মধ্যেও খুব সুলভ নহে—

"জ্যোৎস্ন-ভরা রাইতে রে, দোলা যায় চলি।
মুঠ মুঠ যেন কেহ ছুঁড়ে বেল-ফুলের কলি॥
দোলা যায়, যায়রে দোলা অষ্ট বেহারার কাঁধে।
মা-বাপেরে মনেতে পড়ি বৌ গুরি গুরি কাঁদে॥
ঝি-ঝিঁ পোকার ডাক শুনি কাঁপি ওঠে বুক।
মা-বাপেরে মনেতে পড়ে, ছোট ভাইয়ের মুখ॥
আগে পাছে বৈরাতি যায়, যায়রে ধীরে ধীরে।
দখিনা হাওয়া পাইয়া দোলার কাপড় ঘন ঘন উড়ে॥
ধবধবা জ্যোৎস্না পহর দিনের মত রাইত।
ঝোঁপের কাছে খাপদি রৈছে মনসুর ডাকাইত॥"

মনসুর ডাকাতকে দেখিয়া পাল্কী-বাহকেরা ভয়ে পলাইয়া গেল, অন্য লোকজন একটু দূরে ছিল। ডাকাত বাঘের মত লাফ মারিয়া পাল্কীর উপর পড়িল এবং আয়রা বিবির কানের কর্ণফুল কাড়িয়া লইল এবং নাকের নথ জোর করিয়া টানিয়া ছিনাইয়া লইতে নববধূর নাক রক্তাক্ত হইয়া গেল।

কিন্তু মনসুর ডাকাত সেদিন আয়রা বিবির রূপ দেখিয়া ভুলিল। বরযাত্রীরা দলে পুরু ছিল, সে ভয়ে ঝোঁপের মধ্যে পলাইয়া গেল। কিন্তু সেই হইতে কি করিয়া আয়রা বিবিকে পাইতে পারে, তাহার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। আয়রা বিবির স্বামী আজিম বাণিজ্যের জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন; আয়রা বিবি একা ঘরে শুইয়া কেবল তাঁহার কথা ভাবিয়া কাঁদিতেন। তিন মাস এইভাবে চলিয়া গেল—এক রাত্রে আয়রা বিবি গভীর ঘুমে শয্যায় শুইয়াছিলেন; কৌশলে সিঁদ কাটিয়া মনসুর তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল, মোমবাতি জ্বালাইয়া বিবির অতি সুন্দর মুখখানি পাগল হইয়া দেখিতে লাগিল। দীপের তীব্র প্রভা চোখের উপর পড়ায় আয়রা জাগিয়া উঠিলেন—

'চমকি জাগিয়া কন্যা কাঁপে ঘনে ঘন।
বারুদের ঘরে আগুন লাগিল যেমন॥"

মনসুর তাঁহাকে প্রেম নিবেদন করিল। ভীতা আয়রা চীৎকার করিয়া পাড়া জাগাইয়া তুলিল। তখন বহু লোকজন আসিয়া মনসুরকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং অত্যন্ত প্রহার করিয়া তাহাকে ঘোর জঙ্গলে একটা গাছের উপর ফাঁসি লট্‌কাইয়া চলিয়া গেল।

"কেহ চুল টানে কেহ নাকে মারে ঘুষি।
হাতের সুখ কইরা নৈল যার যেমন খুসী॥"

কিন্তু মনসুর মরে নাই, সে আস্তে আস্তে গাছ হইতে নামিল। বিষম প্রহারে সে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু এবারকার জন্য সে বাঁচিয়া গেল।

আয়রা বিবি মন্‌সুরকে দেখিয়া সে রাত্রে ভয় পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কঠিন পীড়া হইল এবং স্বামী ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। যথাবিহিতরূপে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইল—

"গহিন রাইতে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকে, অন্ধকার ঘোর।
ময়দানে চলিয়া আইল সেইনা কাফন-চোর॥
আর কেহ নাইক্কো তার, সঙ্গে কেহ নাই।
খন্তা-কোদাল লইয়ারে আইস্তে গোর খুঁড়িবার লাই॥
সেই দিনের মাইর খাইয়া বুকে পিঠে ধরা।
তবুও আসকের টানে আইস্তে কাফন-চোরা॥"

প্রেমিকই বটে!

"কবর খুঁড়িয়া মন্‌সুর দেখিবারে পায়।
বেহেস্তের পরী যেন সুখে নিদ্রা যায়॥"

আয়রার গায়ে হাত দিতেই মন্‌সুর সহসা চমকিয়া উঠিল। মৃতদেহ যেন নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। কে যেন অদৃশ্য-করে তাহাকে বিষম প্রহার করিল। সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া স্বপ্নে দেখিল—আয়রা বিবি কবর ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"ছিঃ এই পাপের পথ ছাড়িয়া দাও, ভাল হও, আর ডাকাতি করিও না।" মন্‌সুর যেন বলিল—"ডাকাতি না করিলে আমার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইবে কিসে?" স্বপ্ন-দৃষ্ট আয়রা বিবি বলিলেন—"যদি ডাকাতি না-ই ছাড়িতে পার, তবে আমার কাছে শপথ কর যে, দিনে পাঁচবার ঠিক সময়ে নামাজ পড়িবে।" মন্‌সুর আয়রার পায়ে ধরিয়া শপথ করিল।

সেই হইতে মন্‌সুর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, কিন্তু ডাকাতির দিকে আর মন নাই। কয়েকদিন গেল, তাহার দলের লোকেরা আসিয়া বলিল —"সর্দ্দার, তুমি সাধু হইলে আমাদের চলিবে কিসে? সেইদিন মার

খাওয়ার পর হইতে তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।" মন্‌সুর বলিল —"আজ ডাকাতি করিতে বাহির হইব, তোরা প্রস্তুত হইয়া থাক্।"

কাঁইজপার নামক স্থানে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে ঘুট্‌ঘুটে অমাবস্যার অন্ধকারে সে ডাকাতি করিতে গেল। প্রাসাদের ইট খসাইয়া দলের লোকদিগকে বাহিরে প্রতীক্ষা করিতে বলিল এবং মন্‌সুর একা ধনীর সেই বিশাল শয্যাগৃহটিতে প্রবেশ করিয়া—জোড়পালঙ্কে মশারি খাটাইয়া দৌলতদার স্বীয় সুন্দরী স্ত্রীকে লইয়া ঘুমাইয়া আছেন, দেখিতে পাইল। তাঁহার শিথানের দিকে একটা মস্তবড় সিন্দুক ছিল, মন্‌সুর তাহার হাত দিয়া তাহাতে তাল বাজাইতে লাগিল। গৃহস্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না দেখিয়া মন্‌সুর কলের চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিল—

"সিন্ধুক খুলিয়া পাইল টাকা তোড়া তোড়া।
অষ্ট অলঙ্কার আর শাল জোড়া জোড়া॥
দামী মালমত্তা সব করিয়া বাহির।"—

মন্‌সুর সেগুলি লইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় প্রভাতী-পাখীর সুরে সুর মিলাইয়া নিকটবর্ত্তী মস্‌জিদ হইতে আজানের করুণ-আহ্বান শুনিতে পাইল। রন্ধ্রপথে উষার লাল ছবি তাহার চোখে পড়িল। মন্‌সুর তখন ডাকাতি ভুলিয়া গেল। ভুলিয়া গেল যে, গৃহস্বামী সেখানে ঘুমাইতেছেন তিনি মস্ত বড় লোক, তাঁহার গৃহময় লোকজন, সঙ্গীনধারী প্রহরীরা আশেপাশে। সে ভুলিয়া গেল যে, তাহার দলের লোকেরা লুটের জিনিষ বহন করিবার জন্য বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছে—ভুলিয়া গেল যে, সে দস্যু এবং বহুমূল্য ধন-রত্ন বাহির করিয়াছে,—সে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—'লা-ইলাহা-ইল্লাল্‌লাহ্।' সেই চীৎকার শুনিয়া দলের লোকেরা ওস্তাদের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিল ও ছুট্ দিল। গৃহ-স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি দেখিতে পাইলেন এক স্বর্গীয় দৃশ্য—অতি নিবিষ্ট হইয়া এক সাধু

যথাবিহিত অঙ্গভঙ্গী করিয়া নামাজ পড়িতেছে এবং তাহার পায়ের কাছে তাঁহার ধনরত্ন লুটাইতেছে। যোড়হাতে গৃহস্বামী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নামাজ শেষ করিয়া মনসুর বলিল—"আমি ডাকাত, আপনার ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবার জন্য বাহির করিয়াছি, আপনি আমাকে ধরাইয়া দিন ও শাস্তির ব্যবস্থা করুন।" কিন্তু গৃহস্বামী কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। সেইদিন তাহাকে সাধু ও গুরু বলিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য মন্‌সুরের পায়ে উপহার দিলেন।

সেই হইতে মন্‌সুরের ডাকাতি জীবন শেষ হইয়া গেল। কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না—

"কত কাল গত হইল তারপর।
কাফন-চোরার কেহ না পাইল খবর॥"

মাঝে মাঝে জঙ্গল হইতে এক পীর বাহির হইয়া আসে, প্রহরে প্রহরে তাহার নামাজের সুর প্রাণ বিগলিত করে এবং মাঝে মাঝে দেখা যায়, ময়দানের উপরে আয়রার কবরে পীর জেয়ারত করে।

এই পালা-গানটিতে দেখা যায়, প্রেম মানুষকে কিভাবে পশু-প্রকৃতি হইতে দেবত্বে পৌঁছাইয়া দেয়। গানটি প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত, এজন্য কতকটা দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু ইহার মধ্যে মধ্যে কবিত্ব ও করুণ-রসের উৎস বহিয়া গিয়াছে। আয়রার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামী আজিম বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—

"কেমনে খাব ধন-দৌলত, কেমনে খাবরে।
তোমারে ছাড়িয়া আমি কোন্ পন্থে যাবরে॥
কুর্ম্মাইর কূলের মিঠাপান কবে আর খাবরে।
হাসি-মুখে আমারদিকে কবে চাইবেরে॥
জোড়-পালঙ্কের খাট আমার খালি রৈলরে।
বুকের ভিতর কলিজা আমার কাটি পৈল্লরে॥"

৪। এই গীতিকাগুলির মধ্যে 'ভেলুয়ার পালা'টি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহা মুসলমান কবির রচিত। চট্টগ্রামের বাস্কুনিয়া থানার অধীন পোমরা গ্রামের বৃদ্ধ ওমর বৈদ্য নামক এক মুসলমান গায়েনের নিকট হইতে আশুতোষ চৌধুরী ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার বয়স ছিল তখন সত্তর, তথাপি সে নাচিয়া গাহিয়া এই গীতিকাটি দোহারের সাহায্যে সতের ঘণ্টাকাল গাহিয়া আসরটি এমন জমাইয়া তুলিয়াছিল যে, সেই পল্লীটি সেদিন কোকিল-কূজন, রঙ্গীন-আকাশ, উন্মত্ত মধুর হাওয়ার মতই গীতিকার স্বনিকেতন হইয়া পড়িয়াছিল। এই কাব্যটির ভিত্তি ঐতিহাসিক, তন্মধ্যে নানা উপগল্প লতার ন্যায় গীতিকার মাধুর্য্য বাড়াইয়াছে। কিন্তু এখনও কাব্যোক্ত ভোলা সদাগরের বাড়ী, যাহা বিস্তীর্ণ দীঘীতে পরিণত হইয়া 'ভেলুয়ার দীঘী' নামে পরিচিত হইয়াছিল। মুনাপ কাজির কাছারীর চিহ্ন ও গীতে উল্লিখিত প্রায় সমস্ত ভৌগোলিক স্থানগুলি বিদ্যমান। টোনা বারুইয়ের ভিটা এখনও সৈয়দনগরের লোকেরা দেখাইয়া থাকে। ঘটনাটি হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। 'তারিখ-ই-হামিদী" নামক ফারসী পুস্তকে ও পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী নামক এক ভদ্রলোকের লেখায় এই গীতিকার আখ্যান-বস্তুর প্রধান প্রধান কথার উল্লেখ আছে। এই ভেলুয়ার গীতিকা নানারূপে নানা ছন্দে বিচরিত হইয়া চট্টগ্রামবাসীদিগকে এতকাল মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্পর্দ্ধা করেন। কিন্তু যে-সকল কথা লইয়া শত-সহস্র লোক বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে আনন্দোৎসব করিয়া আসিয়াছেন, অনেক সময় তাহার একবর্ণও তাঁহারা জানেন না এবং না জানিয়া ঘৃণার সহিত চাষাদের কাহিনী উপেক্ষা করেন। বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য এই জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন, বিদেশী-প্রভাবান্বিত আত্মম্ভরী একটা ক্ষুদ্র-দলের উপর প্রতিষ্ঠা

পাইয়াছে। এবম্বিধ পরগাছার অধিকাংশই যে অল্পকালস্থায়ী হইবে, তাহা সহজেই বোঝা যায়।

'ভেলুয়ার পালা'টি বৃহৎ, ১১০৭ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। ইহার আখ্যায়িকা-ভাগ বহু ঘটনা-পূর্ণ। আমাদের স্থান ও সময়াভাবে, অতি সংক্ষেপে এতৎ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া যাইব। আমির সদাগর বাণিজ্য-যাত্রার পূর্ব্বে তাহার মাসতুত ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করে। যে সূত্রে এই বিবাহ হয়, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক। ভেলুয়ার পোষা 'হিরণী' নামক পাখীটিকে আমির গুলি করিয়া মারিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাকে ভেলুয়ার ভ্রাতারা তাহাদের বন্দীশালায় জোর করিয়া আনিয়া উৎপীড়ন করে। তাহার মাসীমা জানিতে পারেন যে, তরুণ আমির তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরার পুত্র। তখন তিনি তাহাকে বন্দীশালা হইতে আনিয়া অতি আদরে স্বীয় কন্যা ভেলুয়ার সহিত বিবাহ দেন, কারণ তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর নিকট প্রতিশ্রুতা ছিলেন যে, তাঁহার কন্যা হইলে তাঁহার পুত্রের সহিত বিবাহ দিবেন। আমির ভেলুয়াকে লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসে। তাহার বিভলা নাম্নী এক অতি কুরূপা ও দুষ্ট-চরিত্রা ভগ্নী ছিল। ভেলুয়ার রূপ ও আমিরের উপর প্রতিপত্তি দেখিয়া সে ষড়যন্ত্র-পূর্ব্বক ভ্রাতাকে পুনরায় বাণিজ্যে পাঠাইল এবং ভেলুয়াকে নানারূপ অসহ্য কষ্ট দিয়া বাড়ীর বাহিরের অতি হীন-কার্য্যে নিযুক্ত করিল। এই দুরবস্থায় জল আনিতে যাওয়ার সময় ভোলা সদাগর তাহাকে জোর করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যায়। নানা প্রলোভনেও ভেলুয়া বশীভূত না হওয়াতে, ভোলা বলপূর্ব্বক তাহার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হয়। বিপদে পড়িয়া ভেলুয়া তাহার নিকট হইতে ছয় মাস সময় চাহিয়া লয় এবং ঐ সময়ের পরে, তাহাকে স্বেচ্ছায় নেকাহ্ করিবে, এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়।

বহু ধন-দৌলত লইয়া আমির গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বিভলার নিকট শুনিতে পাইল যে, ভেলুয়া তিন দিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছে এবং নদীর তীরে তাহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে। কবর খুঁড়িয়া আমির একটা কালো কুকুরের শব পাইল। তারপর আমির বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগ করিল। কত অনশন, কত ঝড়-বৃষ্টি, কত বিপদ ও অনিদ্রা সহ্য করিয়া আমির কুড়ালমুড়া গ্রামে কাঁইচো নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া স্রোতের টানে কাউখালির পাক পার হইয়া ইচ্ছামতীর মুখে পৌঁছিল, তথা হইতে রাগন্যা ছাকলার মধ্যে সৈয়দনগর নামক গ্রামে পৌঁছিল। তখন তাহার দেহ মলিন, জীর্ণ-বাসে কটি ঘেরা মাথায় জটা—এইভাবে সে টোনা বারুইয়ের সারঙ্গের বাদ্য শুনিয়া মুগ্ধ হইল এবং তাহাকে তাহার সমস্ত কথা করুণ-স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বর্ণনা করিল। টোনা বারুই তাহাকে সাকরেদ করিয়া সারঙ্গ-বাদ্য শিখাইল এবং একটা নূতন সারঙ্গ তাহাকে উপহার দিয়া 'ভেলুয়া' নামটিতে তাহার সুর বাঁধিয়া দিল। আমির 'ভেলুয়া' নামে-সাধা সারঙ্গ বাজাইয়া পাগলের ন্যায় পল্লী হইতে পল্লীতে, দুর-দুরান্তরে একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। মসলী বন্দরে যাইয়া সে ভোলার বাড়ীর কাছে সারঙ্গ বাজাইতে লাগিল। ভেলুয়া প্রাসাদের উচ্চ-তলা হইতে সারঙ্গ-বাদককে দেখিয়া তাহার শত পরিবর্ত্তন-সত্ত্বেও চিনিতে পারিল। সে ভোলার নামে মুনাপ কাজির কাছে নালিশ করিল। মুনাপ কাজির বয়স ৯০ বৎসর এবং সে অতি লম্পট। ভোলা ভেলুয়াকে অনেকরূপ শিখাইয়া দিয়াছিল। তথাপি কাজির আদালতে ভেলুয়া ভোলার সমস্ত কীর্ত্তির কথা অশ্রু-বিগলিত চক্ষে বর্ণনা করিয়া নিজ স্বামীর পরিচয় দিল। কাজি—ভোলাকে দূর করিয়া দিয়া স্বয়ং ভেলুয়াকে অধিকার করিবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি আমিরকে বলিলেন—

"তোমার যোগ্য নয় ভেলুয়া কহিলাম সার।
আর একজন লুটি' নিলে আসিবে আবার ॥

তোমার লাইগ্যা বারে বারে কে করে হাজাম।
প্রতিদিন এজ্‌লাসে আমার আছে কাম॥
আমার ঘরে থাকুক বিবি, সুখে খাইবে ভাত।
সোনার পালঙ্কের মাঝে শুইবে দিনরাত॥"

মুনাপ কাজির পাইক-পেয়াদারা আসিয়া আমিরকে 'কোর্ট' হইতে তাড়াইয়া দিল।

এই বিপদাপন্ন অবস্থায় আমির বহু পথ পর্য্যটন করিয়া স্বীয় গ্রাম সাকুল্য বন্দরে আসিয়া পিতা মাণিক সদাগরকে তাহার সমস্ত কথা জানাইয়া পায়ে ধরিয়া পড়িল, পিতামাতা ক্রোধে আগুন হইয়া গেলেন। মাণিক সদাগরের আদেশে তখনই ১৪ কাহণ (১১২০) রণ-নৌকা, বহু পদাতিক ও বন্দুকধারী, দীর্ঘ-গুম্ফ পশ্চিমা-ফৌজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা কাজির 'কাট্টালির বাক' নামক সহর একেবারে নদীর তলে ডুবাইয়া ফেলিবে, তাহাদের এই সঙ্কল্প ছিল। এদিকে কাজির গৃহে ভেলুয়া অতি সঙ্কটাপন্ন রোগের মুখে পড়িল। হঠাৎ কামান-গর্জ্জন ও বহু সৈন্যের আক্রমণে কাজি ভীত হইয়া ভোলা সদাগরের নিকট মুমূর্ষু ভেলুয়াকে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং নিষ্কৃতির চেষ্টা পাইল। সাত দিন কাজি ও ভোলা সদাগরের মিলিত সৈন্যের সহিত আমিরের সৈন্যের মহাযুদ্ধ চলিল—

"সাগরের জল হায়রে করে টলমল
আল্লার মুল্লুক যেন যায় রসাতল।"

শত্রুরা হারিয়া গেল, ভোলার হাতে ভেলুয়া যে কষ্ট পাইয়াছিল, তাহা আমির সকলই শুনিয়াছিল। ভোলার শিরচ্ছেদ হইল এবং তাহার যে-গৃহে ভেলুয়া নানা যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সেই স্থানটি ভেলুয়ার নামে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সদাগরের আবাস-স্থল-

ব্যাপক একটি দীঘী কর্ত্তিত হইল। সেই দীঘীর নাম 'ভেলুয়ার দীঘী'। তাহার জল এখনও ভেলুয়ার অশ্রুর মত নির্ম্মল, টলমল করিতেছে।

"নাকের গোড়ায় পরাণ কাজির করে ধড়ফর।
থাপ্পর মারিল তারে মাঝি গরল ধর॥
জমিনের উপর কাজি পড়িল পাকাই।
মরার মতন রৈল, হুঁস্-পোস্ নাই॥"

ভেলুয়াকে লইয়া সাধু বাড়ী আসিল, কিন্তু নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সময় দেখা গেল—ভেলুয়ার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে—

"সাগরের পারে দিল ভেলুয়ার কবর।
তারই কিনারে সাধু ঘুরে আট পহর॥
পেটে ক্ষুধা নাই তার, মুখে নাই বাণী।
কলিজাতে লউ নাই, চক্ষে নাই পানি॥"

এইভাবে এক রাত্রে আমির যেন স্বপ্নে দেখিল—আকাশ হইতে সাতটি পরী কবর-স্থানে আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ভেলুয়া ঊর্দ্ধপথে চলিয়া গেল।

টোনা বারুইয়ের সারঙ্গ—

"টোনা বারুইয়ার কথা কি করি বাখান।
সারিন্দা বাজাইতে লাগ্‌লে গাঙ্ বহে উজান॥
বনের বাঘ বশ হয়, কাঁদয়ে হরিণী।
সাপে মাথা নোয়াইয়া থাকে, এমন সে গুণী।"

আমিরকে শিষ্যরূপে গ্রহণ—

"টোনা বারুই বলে ফকির শুন দিয়া মন।
সারিন্দা শিখিলে হ'বে দুঃখ-পাসরণ॥

এত বলি টৌনা বারুই কি কাম করিল।
তার লাগি সারিন্দা এক বানাইতে লাগিল॥
বৈলাম গাছের সারিন্দা সে মন-পবনের বৈলা।
দাঁড়াইস্ সাপের রগ্ দিয়া তার বানাইলা॥
ধলা ঘোড়ার ল্যাজের ছর, নোয়াসা গাছের লাসা।
সারিন্দা তৈরী হৈল দেখ্‌তে বড় খাসা॥
এমন গুণের গুণীন্ টৌনা কি বলিব আর।
'ভেলুয়া' 'ভেলুয়া' ডাকে সারিন্দার তার॥
সারিন্দা বাজায় ফকির চোখের জল ছাড়ি।
পেটে নাই দানা-পানি ফিরে বাড়ী বাড়ী॥"

বৈলাম গাছ যদি পাঠক না জানেন, ইতিহাস-বিশ্রুত মন-পবন নামক উৎকৃষ্ট বৃক্ষের কাঠের কথা যদি তাঁহারা না শুনিয়া থাকেন, তবে বুঝিব, বাঙ্গালী বাঙ্গালার পল্লী ভুলিয়াছেন।

আমির সদাগরের সারিন্দা-বাদন—

"পাগ্‌লা ফকির সারিন্দা বাজায় ঘনে ঘন।
ভেলুয়ারে ডাকি যেন কে করে রোদন॥
সুন্দরী ভেলুয়া তখন ঘরের বাহির হৈল।
ছাদের উপরে গিয়া দেখিতে লাগিল॥
ছিঁড়া কাণি পিধারে তার, ছিড়া কাণি পিঁধা।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফকির বাজায় সারিন্দা॥
কটা তার মাথার চুল লম্বা মোচ-দাড়ি।
সারিন্দা বাজায় ফকির চক্ষের জল ছাড়ি॥"

আখ্যান-বস্তু পড়িতে পড়িতে এই স্থানে আসিলে সাকুল্য বন্দরের স্বামী, মাণিক সদাগরের চোখের দুলাল, তরুণ আমির, যাহার রূপ-গুণ সে-দেশের

গৌরব ছিল। তাহার এই প্রেম-ভিখারীর বেশ দেখিলে পাঠক করুণার স্রোতে ভাসিয়া যাইবেন।

কবির বিলক্ষণ রহস্য শক্তি ছিল, একটি পংক্তির উল্লেখ করিব। ভেলুয়া পিতৃগৃহে তাহার আদরের 'হিরণ' পাখীর মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া এক সখীকে বলিল—"যে দুষ্ট সাধু আমার হিরণীকে এইভাবে মারিয়াছে, তাহার পাঁচটি আঙ্গুল বন্দীশালা হইতে কাটিয়া আনিয়া আমার কাছে উপস্থিত কর।" সখী যাইয়া শুনিল, ইতিমধ্যেই বন্দীশালা হইতে মুক্ত করিয়া ভেলুয়ার সহিত তাহার মাতা তরুণযুবকের বিবাহ স্থির করিয়াছেন—

"বাহিরে যাইয়া দাসী দেখে সদাগরে।
সুরুজ যেন উঠিয়াছে আসমানের উপরে॥
অপরূপ সুন্দর সাধু, আচানক সাজ।
মাথার উপরে আছেরে তার হাজার টাকার তাজ॥
কাশ্মীরী শালের কুর্ত্তা, পিন্ধনে চিকণ ধুতি।
পায়ের মাঝে দিয়া লাগাই ভাল চীনা জুতি॥"

আমির সদাগরের সহিত বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে ভেলুয়া তাঁহার বিন্দু বিসর্গও জানে না। সে আমিরের যে-হাত তাহার হিরণীকে সন্ধান করিয়াছে, সেই হাতের পাঁচটি আঙ্গুল কাটিয়া আনিবার হুকুম দিয়া বসিয়া আছে। দাসী ফিরিয়া আসিয়া—

"দাসী কহে শুন কন্যা, খোদাতালার ভুল।
সদাগরের হাতের মাঝে নাইরে আঙ্গুল॥"

ঘিভলার প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

"আমির সাধুর বড় বৈল বিভলা তার নাম।
মাংস নাই অঙ্গে, অস্থি বেড়া চাম॥

পাণ্ডু বর্ণ দেহখানি রক্ত নাহি তায়।
পুরুষের মত কেশ হাতে আর পায়॥
নারীর ছুরত নাই বিভলার অঙ্গে।
এই দুনিয়ায় বর্গ নাই তার কারো সঙ্গে॥
আষাঢ়ে মেঘলার মত লাগে মুখখানি।
সে মুখের বাণী যেন চিরতার পানি॥
এক কথার টুন্‌টুনি দশ কথা করে।
দাসী-বাঁদী কাঁপে সদা বিভলার ডরে॥"

এই গীতিকাটায় কবিত্বপূর্ণ ঋতু-বর্ণনা, দাম্পত্যের শত শত মধুর চিত্র, চট্টগ্রামের নদ-নদী খাল-বিলের এরূপ জীবন্ত বর্ণনা, বাঙ্গালী সৈন্যের বীরত্ব ও বাঙ্গালীর যুদ্ধের পরিচয়, যুদ্ধের বর্ণনা, ধনীর ঘরের আসবাব, উচ্চ কুলের মহিলাদের বাসস্থান ও খাদ্যাদির বিলাস, সাজসজ্জার আড়ম্বর, আদব-কায়দা এবং গভীর যৌনপ্রেমের এরূপ প্রতিচ্ছবি আছে যে, পাঠক সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে, বাঙ্গালার সেকালের খাঁটি পল্লীকে যেন স্পষ্টভাবে নিজ চক্ষে দেখিবেন। এই কাব্যে সেই সময়ের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও বাণিজ্যাদির যে হুবহু প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহা সাক্ষাৎদর্শীর নিখুঁত বর্ণনা-সম্ভূত, কোন ইতিহাস বাস্তব-জীবনের এরূপ ছবি দিতে পারে না—কবির সহিত ঐতিহাসিকের এই স্থানে প্রভেদ।

৫। এই পল্লী-সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের রচিত এত গাথা আছে যে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। 'নিজাম ডাকাত'-এর পালায় সুবিখ্যাত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কাহিনী মুসলমান কবি রচনা করিয়াছেন। নিজাম আউলিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক, নানা ফারসী পুস্তকে ইহার সম্বন্ধে তত্ত্ব বর্ণিত আছে। এই আউলিয়া পূর্ব্বে ডাকাত ছিলেন। তিনি রত্নাকর দস্যুর মতই পাপ-জীবনের অবসানে সেখ ফরিদ নামক এক সাধুর কৃপায় স্বয়ং

বিখ্যাত সাধু হইয়া পড়েন। 'তজক-ই-জাহাঙ্গীরী' নামক ফারসী পুস্তকে লিখিত আছে—যমুনা তীরে বহু হিন্দুকে 'হর- হর' শব্দ উচ্চারণ করিতে শুনিয়া ইনি বলিয়াছিলেন—"হর্ কমরস্ত্ রাহে, দীনী ওকিলি গাহে।"—অর্থাৎ "প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীরই স্বীয় স্বীয় পন্থা তাহাদের মুক্তির উপায়।" কথিত আছে - মোহাম্মদ তোগ্‌লকের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজাম শাপ দিয়াছিলেন তাহাতে 'তোগলকাবাদ' মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। * কথিত আছে—নিজাম আউলিয়া ডাকাতি করিয়া ৯৯টি লোক হত্যার পরে একটি পাপিষ্ঠ, দুষ্ট চরিত্র লোককে হত্যা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই তিনি সাধু হওয়াছিলেন। এই অদ্ভুত-কর্ম্মা ডাকাতের চরিত্র-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস অতি কৌতূহলোদ্দীপক ভাষায় বাঙ্গলা গাথাটিতে বর্ণিত হইয়াছে।

৬। এই গাথাগুলি ছাড়া 'দেওয়ান ঈশা খাঁ', 'দেওয়ান ফিরোজ শাহ্' 'দেওয়ান ভাবনা', 'আধুয়া সুন্দরী,' 'সুরুৎজামাল' ও 'দেওয়ান মনছুর খাঁ' প্রভৃতি ইতিহাস-মূলক পল্লীগীতিকা ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। মুসলমানেরাই ইহার রচক ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান শ্রোতারা পল্লীর আসরে শতাব্দীর পরে শতাব্দী ইহা শুনিয়া আসিয়াছেন। ইতিহাস-মূলক বলিয়া পাঠক ইহাদিগকে ঠিক ইতিহাস বলিয়া ভুল করিবেন না। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি নানারূপ গ্রাম্য-সংস্কার ও উপকথার দ্বারা অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছে। 'দেওয়ান মনছুর'-এর পালাটি এখনও আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করিতে পারি নাই। ইহার একটা হস্ত-লিখিত নকল আমার কাছে আছে। ইহাতে শুজা বাদশাহ্-সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। তাঁহার আরাকান-যাত্রা ও তথাকার রাজার দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া সমুদ্র-গর্ভে রাজ্ঞী পরীবানুসহ মৃত্যু এবং বঙ্গদেশে

* 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৩৩২ বাং ১৫ই ফাল্গুন, সার যদুনাথ সরকারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তৎসম্বন্ধে বর্ণিত বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কতকগুলি কথা ঐতিহাসিকেরা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু ইহার অনেক কথাই তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে. তন্মধ্যে অনেক মৌলিক তথ্য আছে—যাহা প্রত্যয়যোগ্য। শুজা বাদ্‌শাহের শেষ-জীবন এবং দেওয়ান মন্‌হুরের সঙ্গে সখ্য-স্থাপন, চট্টগ্রামে উভয়ের বিজয়-যাত্রা এবং আরাকানের বিবরণের মধ্যে ইতিহাসের অনেক উপকরণ আছে। শুজা বাদশাহের পত্নী পরীবানু ও তৎকন্যার সম্বন্ধেও আমরা দুইটি ক্ষুদ্র গাথা পাইয়াছি, তাহা দিল্লীশ্বরদের এই গাথায় শোচনীয় পরিণাম অতি করুণভাবে ও স্বল্পক্ষরা কবিতায় বর্ণিত আছে। দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ঈশা খাঁ ও কেদার রায়ের ভাগিণী সোনামণি (সুভদ্রা)-র প্রেম ও তজ্জনিত যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি বিস্তৃত কাহিনী এই গীতিকায় বর্ণিত হইয়াছে। কেদার রায় কিভাবে হত হ'ন এবং তাঁহার নিহন্তা সেনাপতি করিম খাঁ শৌর্য্য-বীর্য্য ও আসুরিক দেহ-শক্তি, ঈশা খাঁর পুত্রদ্বয় আদম ও বিরামের—কেদার রায়ের দ্বারা নানা বিড়ম্বনার কথা অতি সরল ও কৌতুকাবহ ভাষায় আমরা পাইতেছি। বস্তুতঃ বঙ্গের এই পল্লী-সাহিত্যে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ও তাহাদের ভবিষ্যৎ সমাজ-গঠন করিবার উপযোগী বহু মাল-মসলা পড়িয়া আছে অথচ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার এই, যখন আমরা বঙ্গদেশের ইতিহাসের জন্য বিহারে ও লাহোরে কোদাল লইয়া মাটি খুঁড়িতেছি এবং আরবী ও ফারসী পুস্তক ও তাহাদের ইংরাজী তর্জ্জমা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছি, তখন আমরা এই সমৃদ্ধ উপকরণ অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছি. ইহাদের প্রতি কোন ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। আর্থারের সম্বন্ধে শত উপকথা ও ম্যবাজিনের বর্ণিত বৃত্তান্তগুলি হইতে বৃটেনের ইতিহাসের উপকরণ গৃহীত হইতেছে। রবিনহুড্-সম্বন্ধে নানা কথা লইয়া কত গবেষণা চলিতেছে। উপকথা-মিশ্রিত বলিয়া কি আমরা এই সকল উপকরণ অগ্রাহ্য করিব? ফারসী

বা আরবীতে লেখা ইতিহাসে আজগুবী কথার অভাব নাই। আমার বিশ্বাস—এই গাথা-সাহিত্য প্রকৃতভাবে, বিজ্ঞান-সঙ্গতভাবে আলোচনা করিয়া ইতিহাসের পাঠক ও লেখকগণ গ্রহণ-বর্জ্জন করিবেন। চোখ বুঁজিয়া বাড়ীর কাছের ধনাগার অগ্রাহ্য করিবেন না।

ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়িয়া দিলেও ইহা যে কবিত্বের খনি ও সামাজিক ইতিহাসের দর্পণ, আমাদের দেশের লোক-চরিত্রের মান-দণ্ড এবং প্রাচীন পল্লী-জীবনের ছায়া-চিত্র, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 'দেওয়ান ফিরোজ শাহ্' নামক গীতিকা হইতে একটি দৃশ্যের কথা এখানে উল্লেখ করিব।

কেল্লাতাজপুরের দেওয়ান ওমর খাঁর কন্যা সখিনার সঙ্গে জঙ্গলবাড়ীর ঈশা খাঁর বংশধর তরুণ বয়স্ক দেওয়ান ফিরোজের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তাঁহার মাতা কেল্লাতাজপুরে দূত পাঠাইলেন। ওমর খাঁ এই প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কোথায় প্রখ্যাতনামা তাজপুরের দেওয়ানদের অতুল বংশ-গরিমা, আর কোথায় কাফের-বংশোদ্ভব জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান গোষ্ঠী। অনেক ঘৃণাসূচক, কঠোর ও অপ্রিয়-বাক্য শুনাইয়া ওমর খাঁ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করিলেন। অভিমানাহত তরুণ ফিরোজ সৈন্য লইয়া কেল্লাতাজপুর আক্রমণ করিলেন এবং সবিক্রমে সেই অরণ্য প্রদেশের শ্রেষ্ঠ কুসুম সখিনাকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া আসিলেন। ইহার পূর্ব্বেই সখিনা বিবি ফিরোজের অপূর্ব্ব কান্তি ও সুদর্শন দেব-মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ ছিলেন, পিতার পরাজয়ের অপমান তাঁহাকে বিচলিত করিল না। তিনি তাঁহার প্রণয়ীকে বিজয়-অভিনন্দন জানাইয়া তাঁহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

পরাভূত ওমর খাঁ আগ্রায় সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট লোক পাঠাইয়া জানাইলেন—ফিরোজ খাঁ সম্রাটের দরবারের রাজস্ব দিতে অস্বীকার

করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে, উপরন্তু অনাহুতভাবে তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিয়া তাঁহার দুলালী কন্যা সখিনাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদে সম্রাট্ বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি এক বৃহৎ বাহিনী ওমর খাঁর সাহায্যার্থে কেল্লাতাজপুরে প্রেরণ করিলেন। অসমসাহসী ফিরোজ এই সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজকীয় ফৌজের সঙ্গে, স্বীয় শ্বশুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাজপুর রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। স্বামীর বীরত্ব-সম্বন্ধে সখিনার এতটা আস্থা ছিল যে, তাঁহার পরাজয় তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বামী পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন, এই সংবাদ জঙ্গল-বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। দাসী দরিয়া এই দুঃখের সংবাদ দিতে অতি সন্তর্পণে সখিনার শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল—সখিনা তখন তাঁহার স্বামীর বিজয়-সংবাদের আশায় উৎফুল্ল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দরিয়াকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—

"শুন শুন দরিয়া গো কহিযে তোমারে।
তুল্যা আন চাঁপা ফুল মালা গাঁথিবারে॥
লড়াই জিত্যা স্বামী আইলে মাল্য দিমু গলে।
ওজুর পানি তুল্যা রাখ সোনার গোছলে॥
আবের পাংখ্যা আইন্যা রাখ শয্যার উপরে।
রণজিত্যা আইলে স্বামী বাতাস করমু তারে॥
ভাণ্ডে আছে আতর গোলাপ, আনত রাখিয়া।
সোনার বাটায় সাজাও পান স্বামীর লাগিয়া॥"

কিন্তু সখিনা দেখিলেন, তাঁহার এই সোৎসাহ-বাক্যে দরিয়া সাড়া দিতেছে না, তখন তিনি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আজ কেন দরিয়া তোর হাসি নাই মুখে।"

কাঁদিয়া দরিয়া বলিল—

"ছুট্যা আইল রণের ঘোড়া লৌয়ের নিশান লইয়া।
কি কর সখিনা বিবি, পালঙ্কে বসিয়া॥
শিরের সিন্দুর বিবি, কাণের সোনাদানা।
পালঙ্ক ছাড়িয়া কর জমিনে বিছানা॥
পিন্ধনের শাড়ী খুল্যা ফেল, কাট্যা ফেল কেশ।
আজ হৈতে হবে তোমার দিগম্বরীর বেশ॥
বাহু হৈতে খোল কন্যা, বাজুবন্ধ তার।
গলা হৈতে খোল কন্যা হীরামণের হার॥
পাও হৈতে খোল কন্যা নূপুর, পাঁজুনী।
কোমর হৈতে খুল্যা ফ্যাল ঘুন্সুর ঝুনঝুনি॥
গৈরব না সাজে কন্যা, সোনার ঠোঁটে হাসি।
ছুরৎ, যৈবন তোমার হয়ে গেছে বাসি॥
বিছানে ফুটিয়া ফুল সন্ধ্যা কালে ঝরে।
আর নাহি সাজে কন্যা পালঙ্ক উপরে॥
শোন শোন বিবি, আজ কহি যে তোমারে।
তোমার স্বামী হৈল বন্দী কেল্লা তাজপুরে।"

নিকটবর্ত্তী গৃহ হইতে সখিনার শাশুড়ীর আর্ত্ত-বিলাপ শোনা যাইতেছিল—অপরাপর পরিজনেরা হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছিল। কিন্তু সখিনার চক্ষে এক ফোঁটা অশ্রু নাই, তাঁহার মুখে একটা বিলাপের কথা শোনা গেল না। তিনি উঠিয়া পুরুষের বেশ পরিলেন এবং স্বামীর আস্তাবল হইতে 'দুলাল' নামক বৃহৎ ঘোটক আনয়ন করিলেন। দেওয়ান বাড়ী হইতে ফৌজদারের নিকট সংবাদ আসিল, ফিরোজ খাঁর এক ভ্রাতা আসিয়াছেন, তিনিই সেনাপতি লইয়া কেল্লাতাজপুরের মাঠে যুদ্ধ করিতে যাইবেন।

সমস্ত ফৌজ সখিনার সঙ্গে চলিল। সখিনার তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"মরণ-ঠাটা পড়িল যেন গোলাপের বাগে।
মিলাইল মুখের হাসি, পরাণে দাগা-লাগে॥"

আড়াই দিন পর্য্যন্ত সম্রাট্ বাহিনীর সঙ্গে ছদ্মবেশিনী সখিনার যুদ্ধ চলিল। এই সময়ের মধ্যে সখিনা কতশত বাণ ও গোলার সম্মুখীন হইয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও ঘোড়া হইতে অবতরণ করেন নাই। পিতার প্রতি ক্রোধে তিনি রাজপ্রাসাদ জ্বালাইয়া দিয়া মহামারী করিতে লাগিলেন। সম্রাট্-সৈন্য পরাস্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইল। দৃঢ়-সঙ্কল্পিত বাহুতে অসি ধারণ করিয়া কাঞ্চনপ্রতিমা সখিনা অশ্ব-পৃষ্ঠে স্বামীর সঙ্গে মিলনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, এমন সময় ওমর খাঁর শিবির হইতে ফিরোজ খাঁর পত্র লইয়া লোক আসিল—"কে আপনি দরদী, জঙ্গলবাড়ীর পক্ষ লইয়া এরূপ অদ্ভুত যুদ্ধ করিতেছেন? কিন্তু আর যুদ্ধের দরকার নাই। ফিরোজ শাহ্ মোগল-সরকারের সমস্ত বাকি রাজস্ব দিয়া সন্ধি করিয়াছেন, তিনি বিবাদের মূল সখিনাকে তালাক দিয়াছেন। ওমর খাঁর সঙ্গেও তাঁহার আর কোন বিবাদ নাই, আপনি যুদ্ধ ক্ষান্ত করুন।"

এক মুহূর্ত্তে স্বামীর স্বহস্তে লেখা 'তালাকনামা'খানি দেখিলেন, স্বামীর পাঞ্জা দেখিয়া তিনি চিনিলেন—

"তালাকনামা পড়ে বিবি ঘোড়ার উপরে।
সাপেতে দংশিল যেন বিবির যে শিরে।
ঘোড়ার পৃষ্ঠ হৈতে বিবি ঢলিয়া পড়িল।
সিপাই লস্কর যত চৌদিকে ঘিরিল॥
শিরে বান্ধা সোনার তাজ ভাঙ্গ্যা হৈল গুঁড়া।
রণস্থলে তারে দেইখ্যা কাঁদে 'দুলাল' ঘোড়া॥

সিপাই লস্কর সব করে হায় হায়।
ঘোড়ার পৃষ্ঠ ছাড়ি বিবি জমিতে লুটায়॥
আস্‌মান হৈতে তারা খস্যা জমিনে পড়িল।
এত দিনে জঙ্গলবাড়ী অন্ধকার হৈল॥
আলাইয়া পড়িল বিবির মাথার দীঘল কেশ।
পিন্ধন হইতে খুল্যা পড়ে পুরুষের বেশ॥
সিপাই লস্কর সব দেখিয়া চিনিল।
হায় হায় করিয়া সবে কাঁদিতে লাগিল॥"

সেই করুণ দৃশ্যে রণ-ক্লান্ত 'দুলাল' নামক ঘোড়াটারও চক্ষু বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

যে-বক্ষ শেল-শূল বন্দুকের গুলি সহিয়া কত আশায়, কত শৌর্য্যের সহিত অনাহারে রাত্রিদিন যুদ্ধ করিতেছিল, সেই রমণীবক্ষ কোমল ফুল শরের আঘাত সহিতে পারিল না। ভালবাসার এই নিদারুণ আঘাতে সে ঢলিয়া পড়িল।

কত পালার নাম করিব? মুসলমান রচিত এই সকল কাব্য-কথা ইস্‌লাম-চিহ্নিত নহে, ইহা দেশের মানবতার মিলন-ক্ষেত্র—তীর্থ-ভূমির রজঃ বহন করিতেছে, কিন্তু ইহাতে বাঙ্গালীত্বই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখানে কবি প্রেমের কথা কহেন, সেখানে তিনি চরম আদর্শে গিয়া পৌঁছেন। অন্য কোন দেশের লোক প্রেমের জন্য এত তপস্যা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই, এখানে প্রণয়ী-প্রণয়িণীরা অল্পে তুষ্ট নহেন, তাঁহাদের লক্ষ্য ভূমা। প্রেমের জন্য নারী-পুরুষেরা কত সহিয়াছেন, কত অসহ্য ও অসম্ভব ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রের মধ্যদিয়া সহজে জীবন-তরী ভাসাইয়া দিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত সমালোচনার স্থানাভাব।

৭। "আয়না বিবির পালা"টি একটি পল্লী-বালিকার করুণ ইতিহাস। আয়না বয়ঃসন্ধিতে মহম্মদ উজ্জাল সদাগরকে দেখিয়াছিল। সেই প্রথম সাক্ষাতে সে মুগ্ধ হইল। কিশোরীর ব্রীড়ারক্তিম গণ্ডের আভা অস্তগামী সূর্য্য দেখিল আর দেখিল প্রেম-মুগ্ধ তরুণ সদাগর। তাহাদের মধ্যে কোন কথাই হইল না। কিন্তু নয়নে নয়নে যে-কথা হইল তাহা হৃদয়ের অন্তর্যামী জানিলেন। আয়নার বাবা এক বিরল-বসতি নদীর-সিকতা-ভূমিতে বাস করিতেন। তিনি সদাগরের পিতার বন্ধু ছিলেন, বৃদ্ধ হইয়াছেন—তিনি মরিলে আয়নার কি হইবে, ইহা ভাবিয়া আকুল। তরুণ সাধু উজ্জাল পিতার মনের কাকুতি বুঝিলেন কিন্তু বাধ্য হইয়া তখনকার মত চলিয়া গেলেন। বাড়ী ফিরিয়া তাঁহার মনে সোয়াস্তি নাই, বাণিজ্যের ছলে পুনরায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু এবার অর্থের সন্ধানে নহে, সেই হরিণ-নয়নাকে খুঁজিতে। নৌকাডুবি হইল,—উজ্জাল সাধু বনে জঙ্গলে ছয়মাস ঘুরিলেন, আয়নার বাসস্থানে যাইয়া শুনিলেন, তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আয়না কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। বহু পল্লী ঘুরিয়া এই তরুণ মুসাফির এক সন্ধ্যায় রন্ধন গৃহের ধোঁয়া ও প্রদীপের আলো দেখিয়া এক গৃহে ভিক্ষার জন্য জিকির ছাড়িল। সে কদাচিৎ কিছু খায়। ভিক্ষার অর্থ—আয়নার সন্ধান করা। গ্রামের বুড়ীরা বলিল—"এই ফকির মুসাফির নহে, ইহার চক্ষের ভাবে বুঝা যায়, যুবক প্রেমের দেওয়ানা।" পূর্ব্ব বর্ণিত যে বাড়ীতে সে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষার জন্য হাঁক দিল, সেই গৃহ হইতে তাহাকে ভিক্ষা দিবার জন্য এক নবীনা নারী উপস্থিত হইল, এই নারীই সেই আয়না। পিতার মৃত্যুর পর সে এক আ[illegible]য়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। উভয়ে উভয়ের জন্য চির পিপা[illegible]। সদাগর তাহাকে পরম যত্নে বাড়ীতে লইয়া আসিয়া ধুমধামের সহি[illegible] বিবাহ করিল। বিবাহিত জীবনের সেই কয়েকটি বৎসর কত সুখের।

"মায়ে তুলিয়া রাখায় বিন্নি ধানের খই।
সুয়ামীরে খাওয়ায় কন্যা গামছা-বাঁধা দই॥
সারাদিন খাটি সাধু পায় মারীর সঙ্গ।
কাছে খাড়াইয়া কন্যা বাতাস করে অঙ্গ॥
ঠাণ্ডা নদীর পানি আনি খাওয়ায় স্বামীরে।
আসমানতারা শাড়ী তার বাতাসেতে উড়ে॥
উজ্জাল সাধু হাটে যায় কিনা আনবে কি।
আয়নার লাগি কিনা আনে আভের চিরুণী॥
উজ্জাল সাধু হাটে যায় কোণাকুনি পথ।
আয়নার লাগি কিনা আনে সোনার একটি নথ॥"

কিন্তু আবার সাধুকে বাণিজ্যে যাইতে হইল, আয়নার শত নিষেধ সে শুনিল না। হায়! এই বুঝি সুখের অবসান, শেষ দেখা। আয়নার অন্তর ধড়ফর করিয়া উঠিল। যখন সাধু কোন বাধাই মানিল না, তখন চোখ মুছিতে মুছিতে—

"অভাগিনী কন্যা কহে শুন পরাণের পতি।
দেওয়া ডাকলে তখন বাইন্ধ নায়ের কাছি॥
অভাগিনী আয়না কাঁদে আমার মাথা খাও।
রাইত নিশিতে বঁধু তুমি না বাহিও নাও॥
গরুয়া তাজরের মুলুক সে দেশে না যাইও।
ছয় মাসের মধ্যে তুমি ফিরিয়া আসিও॥"

বাঙ্গালা দেশের আম-কাঁঠালে ঘেরা—কুন্দ, শেফালী, অপরাজিতা, অতসী পূর্ণ আঙ্গিনায় কোকিলের ডাকে কুটিরে কুটিরে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় যে প্রেমধারা সাধ্বী নারীদের অন্তরে অন্তরে বহিয়া যায়—তাহার খোঁজ কে রাখে? পল্লী কবিরা সেই সন্ধান দিয়াছেন।

দৈব-দূর্ব্বিপাকে আবার সাধুর জাহাজ জলে ডুবিয়া যায়, সংবাদ রটে—সাধু মারা গিয়াছেন। আয়না পাগল হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। ভিখারিণী বেশে দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া স্বামীর লাগ পায় এবং তাঁহাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। কিন্তু সে সুখ অদৃষ্ট বরদাস্ত করিল না। তিন বৎসর যে অসহায়া রমণী গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, পল্লী-সমাজ এমন স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে সাধুকে বাধ্য করিল এবং সে সেইরূপ বাধ্য-বাধকতায় পড়িয়া আর এক স্ত্রী গ্রহণ করিল। এইবার আয়নার অকথ্য দুঃখের ভাষা ফুরাইয়া গিয়াছে। সে-দুঃখ সে কাহাকেও বলিতে পারিল না। সে জঙ্গলে জঙ্গলে না খাইয়া না ঘুমাইয়া কাটায়। স্বামীর মুখখানি সদা-সর্ব্বক্ষণ মনে পড়ে এবং মুক্তার ন্যায় অশ্রু গণ্ডে গড়াইয়া পড়ে, বন ফুলের ন্যায় সেই অশ্রু অন্যের অলক্ষিতে শুকাইয়া যায়:

বেদেদের প্রাণ আছে—তাহারা কোন সমাজের ধার ধারে না। মানুষের প্রাণ জিনিষটা তাহারা চিনে এবং কাহারও দুঃখ দেখিলে আপনজনের ন্যায় তাহাকে স্নেহ দিয়া জড়াইয়া ধরে। 'এইরূপ এক কুরুঙ্গিয়া বেদেদের নৌকায় সে আশ্রয় পাইল এবং বহু দিনের চেষ্টায় সে স্বামীর-পল্লীতে বেদেদের সঙ্গে আসিল—

> "প্রভাত কালেতে কন্যা কি কাম করিল।
> কুরুঙ্গিয়া নারীর বেশ অঙ্গেতে পরিল।
> আগা-ডুরি পাটের-পাছা কোমড়ে বাঁধিয়া।
> খোঁপাতো বাঁধিল কন্যা উপ্‌তা করিয়া॥
> গলায় পরিল কন্যা লয়াগুঞ্জার মালা।
> মাথায় তুলিয়া লৈল বেশাতির ছালা।
> সারবন্দী কুরঙ্গিয়া নারী সঙ্গে সঙ্গে যায়।
> বেশাতি করিতে তারা বাইর হৈল পাড়ায়॥"

হায়রে! স্বামীর ভিটার তরুলতা তেমনই আছে, কোন ডালে বাউই পাখী তেমনই করিয়া বাসা বাঁধিতেছে। বাউই, তোর বৃথা ঘর বাঁধা, তোর মত আয়নারও ঘর থাকিতে ঘরের সুখ অদৃষ্টে নাই।

আয়নার পা থর থর কাঁপিতেছে ঐত সেই ঘর—যে ঘরে স্বামীর সঙ্গে তাহার কত সোহাগের দিন কাটিয়াছে। অভাগিনী উঠানে তিন বৎসর পূর্ব্বে মেন্দী-গাছের চারা পুতিয়াছিল, এখন তাহা বড হইয়াছে। সে একবার স্বামীর চাঁদ-মুখখানি দেখিয়া লইল, আজ আর সে স্বামীর কেহ নয়। যে-ঘর সে নিত্য ঝারিয়া পুছিয়া ঝক্‌ঝক্ করিয়া রাখিত, সেই ঘরে চাঁদের মত সুন্দর একটি ছেলে লইয়া সপত্নী আদর করিতেছে। আয়নাকে দেখিয়া শাশুড়ী বাহির হইয়া আসিলেন এবং আদর করিয়া বলিলেন—"তুমি মা কে? তোমার মতন আমার এক কন্যা বাহির হইয়া গিয়াছে, তার শোকে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, সত্য করিয়া বল মা, তুমি কাঁদিতেছ কেন?" কুঞ্জরিণীবেশী আয়না বলিল—"তোমার মুখ আমার মায়ের মুখের মত, এজন্য কাঁদিতেছি। আমি আমার মায়ের বড় আদরের ছিলাম—

"কাঁদিলে অভাগী মাগো আইত ধাইয়া।
গায়েতে লাগিলে ধুলা আঁচলে দিত মুছিয়া।"

এখন দেশে দেশে কাঁদিয়া ফিরি, কেহ জিজ্ঞাসা করেন।" তাহার কান্নায় শাশুড়ীর মন গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"তুমি যদি মা আমার আয়না হও, তবে ঘরে ফিরে আই সো।"

"পান পঞ্চাৎ ছাড়মু আমি তোমার লাগিয়া।
ভিক্ষা মাগি খামু আমি তোমারে লইয়া॥
আয়না যদি হইয়া থাক আমার মাথা খাও।
অভাগীরে থুইয়া আর কোন দেশে না যাও॥

এই মতে শাওড়ী যে করিল ক্রন্দন।
খুলিয়া ফেলিল কন্যা কেশের বন্ধন॥
মাথার বেণীটি কন্যা জমিনে ফেলাইয়া।
পাগল হইয়া কন্যা পরবেস করে নায়॥
আশা গেল বাসা গেল কোন সুখে বা বাঁচি।
আপন বন্ধু পর হইল কোন বা সুখে থাকি॥
আপনার ঘর পর হইল বাঁইচা কাজ নাই।
এই ঘরে নাই আয়নার নাই আঙ্গুল পাতিবার ঠাঁই।
সুখেতে থাকিও বঁধু, সতীন বুকে লইয়া।
(আমি অভাগিনী) দেখে যাই চাঁদমুখ জন্মের লাগিয়া॥
এই আসা শেষ আসা ভাল আর আশা নাই।
সুখে থাক প্রাণের বঁধু, আর কিছুনা চাই॥
আষাঢ়িয়া তোড়ের নদী ঢেউএ ভেসে যায়।
কাঁচা সোনার তনু হায়রে জলেতে ভাসায়॥"

এবার আয়নার শোক আমিরের বুক বিদীর্ণ করিল। সাধু তাহার আগমনের কথা জনশ্রুতিতে শুনিতে পাইলেন—

"বাতাস কয় কানে কানে আসমানে কয় রৈয়া।
আইল দুঃখিনী আয়না তোমারে খুঁজিয়া॥
নয় সে কুঞ্জরিয়ার নারী নয় সে বাদিয়া।
আইছিল দুঃখিনী আয়না তোমারে খুঁজিয়া॥
সেই মুখ সেই চোখ ভাল সুন্দর সে নাসা।
পক্ষিনী আসিয়াছিল খুঁজিতে নিজ বাসা॥
আইছিল অভাগিনী তোমায় দেখতে নারে।
কেউনা পুছিল অভাগিনীরে কেউনা কইল থাকরে॥
জিঙ্কীর পশর আংকা অন্ধকার হৈলরে।"

"যারে দেখে তারে সাধু জিজ্ঞাসা যে করে ॥
ফকির হইয়া সাধু দেশে দেশে ফিরে।
আয়নার তালাসে সাধু গাঁয় গাঁয় ঘুরে ॥
আয়নার তালাসে সাধু বনে বনে ফিরে।
তারা হৈল ঝিমি ঝিমি ডাল ফুল হইল বাসি।
জন্মের লাগ্যা মায়ের পুত্র হইল বৈদেশী ॥"

আয়নার পরিণাম ও উজ্জাল সাধুর অনুতাপ করুণার প্রস্রবন। এনক আর্ডেন ও এনির কথা বলিতে যাইয়া টেনিসন এতটা করুণরস সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এনিকে দিয়া ঘটা করিয়া এনকের একটা শ্রাদ্ধ করাইয়া সমস্ত কাব্য-সৌন্দর্য্য মাটী করিয়া ফেলিয়াছেন।

এই কবির বর্ষা বর্ণনাটি দেখুন—

"...... ...জ্যৈষ্ঠ মাস গেল।
জলের যৌবন লইয়া আষাঢ় মাস আইল ॥
কক্ষে কলসী মেঘের রাণী ফেরেন পাড়াপাড়া।
আসমানে খাড়াইয়া জমিনে ঢালেন ধারা ॥
কোথা হতে আইল পাগল জোয়ারের জল।
ডুবা ডোঙ্গরা বাহিয়া মুলুক কৈল তল ॥
আষাঢ়িয়া নয়া পানি হৈয়াছে পাগল ॥
কোথা হৈতে আইলরে ঢেউ ফেনা মুখে লইয়া।
সাধুর তরণী যায় পাল উড়াইয়া ॥"

এই গীতিকাটি 'ধোপার পাট' প্রভৃতি কয়েকটি পালার সমসাময়িক এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া মনে হয়

'নছর মালুম' পালাটিতে কবি লিখিয়াছেন—"এই কাহিনীটি একটা মিথ্যা গল্প নহে—ইহা সত্যিকার কথা।" পালাটির রচক এবং গায়ক সমস্তই

মুসলমান। বহু কষ্টে প্রধানতঃ নূর হোসেন-এর নিকট হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

এই কাব্যে যে-সকল আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মাঝে চট্টগ্রামের উপকূল অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তত্ত্ব বহু পরিমানে পাওয়া যায়। সায়েস্তা খাঁর হস্তে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া মগেরা অতি দ্রুততার সহিত পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের বিপুল ধনরত্ন ও দেব-বিগ্রহ তাহারা মাটীর নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মগদিগের এই পলায়ন 'মগ ধাওনি' নামে প্রসিদ্ধ। সেই পলায়নের বহুদিন পরেও মগেরা এক একটা সাঙ্কেতিক-স্থানে নির্দ্দেশ-সূচক চার্ট লইয়া চট্টগ্রামের নানাস্থান হইতে মাটীর নীচে প্রোথিত অর্থাদি তুলিয়া লইয়া যাইত। সেদিনও দেয়াং পাহাড়ের নিম্নে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ দেব-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহারা অটুট ও একস্থানে সযত্নে রক্ষিত ছিল, তাহা 'মগ ধাওনি'র সময়কার বলিয়া মনে হয়। পর্ত্তুগীজ জলদস্যু (হার্ম্মাদ)-গণের চিত্রও তাহাদের অত্যাচারের কথা ব্রহ্মদেশীয় লোকদের আচার-ব্যবহার পচা মাংস ও নাপ্পি খাওয়ার কথা এবং তাহাদের মেয়েদের ব্যভিচার ও পুরুষ ধরিবার ফন্দী, জাহাজসমূহের সমুদ্রে ভ্রমণ, চট্টগ্রামের নানা বন্দর ও পল্লীর ইতিহাস এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। হার্ম্মাদদের হাতে দুরবীণ ও বন্দুক থাকিত এবং তাহারা কালো-কোর্ত্তা গায়ে পরিয়া শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় সমুদ্রগামী বাণিজ্য-তরিগুলি লক্ষ্য করিত। পরীন্দিয়া নামক স্থানে শুটকী মৎসের ব্যবসা এবং বঙ্গোপসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির বর্ণনা চলচ্চিত্রের মত চোখের সামনে ভাসিয়া যায়—

"উত্তর দিকেতে আইসে জাহাজ ডান দিকেতে কূল
বহু রং বেরং-এর পাখী দেখা যায় বহু রং বেরং-এর ফুল

বেমান দরিয়ার বামে মাঝে মাঝে চর
সেই চরেতে নাইরকেল বন দেখতে মনোহর।
ঝরি ঝরি পড়ে নাইরকেল মাইন্‌ষে নাহি খায়
লাখে লাখে ফেনার মতন ভাসে দরিয়ায়
কোন চরে ধু ধু বালি নাহি কোন গাছ
হাজারে বিজারে তায় কুমীর করে বাস।
মস্ত মস্ত আণ্ডা পাড়ি বালু চাপা দিয়া
চাহি রহে মেদী কুমীর উপরে বসিয়া
আরো কিছু পশ্চিমেতে আছে এক চর
বেশুমার সাপ থাকে নামে কালন্দর।"

পরীদিয়া গ্রাম সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—এককালে পরীরা এইখানে থাকিত। কালে তাহারা চলিয়া গেল—

"ধাইয়া গেল যত পরী না রহিল আর
মানুষের বস্তি হৈল বসিল বাজার
যত জাইলা মাছ ধরে বেমান সাগরে
শুকাইয়া লয় তাহা পরীদিয়ার চরে
শুট্‌কি মাছের আড়ং হৈল ব্যবসা হইল ভারি
পরীদিয়ার চরে আসে যতেক ব্যাপারী॥"

ইহা ছাড়া ইলসাখালির এক কৃপণ বৃদ্ধের বর্ণনা এবং ব্রহ্মদেশের মাফো নামক এক ধনী বণিকের ইতিহাস এরূপ জীবন্তভাবে দেওয়া হইয়াছে—যাহাতে মনে হয়, আমরা ব্রহ্মদেশের কোন পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ব্রহ্ম-দেশীয় রমণীদের চিত্র এইরূপ—

"মাথার চুল বাবরি ছাটা এঙ্গি থাকে বুকে
বোড়ার ভিতর পানের থলি ইসারাতে ডাকে

রূপের ছটা বুকের গোটা নারঙ্গার তুল
মাথার উপর ঝুটি যেন খুঁটি ধরে বেল-কদম্বের ফুল
কানের মাঝে সোনার নাধং * রাস্তা দিয়া যায়
মুচকি হাসিয়া তারা পুরুষ ভোলায়।”

এই গল্পের প্রধানা নায়িকা আমিনা খাতুন। কত প্রলোভন, কত উৎপীড়ন, কত অবস্থান্তর ও কতরূপ বিপদে পড়িয়া তাহার স্বামীর প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছে—তাহা এই সীতা-সাবিত্রীর দেশেরই যোগ্য। এই অনুরাগ কবিরা পুরোহিতের মতন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া দেখান নাই—এই দেশ সাধ্বীদের দেশ। হিন্দু-মুসলমান অভেদে এখানে সেই আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—বাঙ্গালী গৃহস্থ এতদিন এই সকল দেবী-প্রতিমাকেই পূজা করিয়া আসিয়াছে। আমরা এখানে মস্তক নত করিয়া চিরদুঃখিনী, অপার ধৈর্য্যশীলা, সুখে বীতস্পৃহা সমুদ্র-প্রমাণ বিপদের মধ্যে অচঞ্চল ধৈর্য্য ও ধর্ম্মশীলা পতিপ্রেমে পাগলিনী অভাগিনী আমিনাকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিতেছি। এই মহীয়সী নারী-মূর্ত্তি এমনভাবে বাঙ্গালী কবিরাই বুঝি আঁকিতে পারিয়াছেন, অন্য দেশে এরূপ দেবী-প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায় না। এদেশের জলবায়ুতে এই সকল রমণীর কুসুমাদপি কোমল এবং বজ্রকঠোর উপাদানের আবির্ভাব স্বাভাবিক।

বসোরা যেমন গোলাপের স্থান, আমাদের গৃহ আঙ্গিনায় এই সকল সাধ্বীর তেমনি সহজ সুন্দর গতিবিধি। হে মাতঃ, তোমাকে বহুবার দেখিয়াছি, হিন্দুর ঘরে এবং মুসলমানের ঘরে যেখানে দেখিয়াছি—সেইখানেই চক্ষু জুড়াইয়া গিয়াছে, তুমি আমাদের দেশের বহু তপস্যার ফল, আজ কি পাশ্চাত্য হাওয়ায় আমাদের চিরাগত আদর্শ উড়াইয়া লইয়া যাইবে!

* ‘নাধং’ ব্রহ্ম-রমণীদের একটি সর্ব্বদা ব্যবহৃত কর্ণ-অলঙ্কার।

৮। 'নূরন্নেহা ও কবরের কথা' – মুসলমান কবির লেখা, আশুতোষ চৌধুরী কয়েকজন মুসলমান গায়েনের নিকট হইতে পালাটি সংগ্রহ করিয়াছেন। ছোটবেলা হইতে নূরন্নেহা ও মালেক—স্নেহ-সূত্রে বাঁধা, অনাথ ও নিরাশ্রয় মালেককে প্রতিবেশী আজগরের কন্যা নূরন্নেহা রাঁধিয়া দিত ও নানারূপ সেবা করিয়া তাহার মনের কষ্ট ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

দৈবক্রমে উভয়ের বিচ্ছেদ হয়, মালেক নূরন্নেহাকে ভোলে নাই। কয়েক বৎসর পরে আবার তাহার খোঁজ পাইয়াছে। গীতিকার মুখবন্ধের দৃশ্যে বহুকাল পরে প্রণয়ী-যুগ্মের পূর্ণমিলন এবং মালেক তাহার প্রাণঢালা প্রেম নিবেদন করিল। স্নেহার্দ্র অপাঙ্গদৃষ্টিতে চাহিয়া নূরন্নেহা বলিল— "তোমাকে ভুলি নাই, ছোটবেলার প্রেম কি ভোলা যায়?"

ইহার পরে দুইজনের সঙ্গে দুইজনের প্রেম যেমন আবেগ পূর্ণ তেমনই নিষ্কলুষ – দুইজনের বিশ্বাস বিবাহ হইবে, নূরন্নেহার পিতা আজগর মালেকের অনুরাগী সুতরাং প্রণয়ী-যুগলের মন তৃপ্তির পুলকে ভরা।

অবস্থার অনেক বিপর্য্যয় হইল। এই পালাটিতে হার্ম্মাদগণের উৎপাত এবং নায়ক-নায়িকার উপর যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনার যে বর্ণনা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা। হার্ম্মাদগণ এই ভাবেই দেশময় অত্যাচার করিয়া বেড়াইত।

কিন্তু শুভ-মিলনের মহেন্দ্রক্ষণে বিপদ উপস্থিত হইল। একদা নূরন্নেহার পিতা আজগর মালেককে লইয়া বেড়াইতে চলিয়া গেলেন। তিনি এক বিস্ময়কর রহস্যের উদ্ঘাটন করিলেন। তিনি বলিলেন –"মালেক, তোমার মাকে তোমার পিতা নজু মিঞা নানা লোকের চক্রান্তে পড়িয়া সন্দেহের চক্ষে দেখেন। এই সন্দেহ এতটা বদ্ধমূল হয় যে তোমার জন্মের পরেই তিনি তোমার মাকে ত্যাগ করেন, সেই হতভাগিনীকে

আমিই নিকাহ্সূত্রে বিবাহ করি এবং নুরন্নেহা তোমার সহোদরা ভগিনী। শরিয়ৎ মতে তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না।"

এই সংবাদে মালেকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সে কাহাকে কিছু না বলিয়া সেই গৃহ ত্যাগ করিল, মালেকের জন্য সেই রাত্রে নুরন্নেহা নানারূপ রাঁধা-বারা করিয়া সে উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিয়া কাটাইল। তাহার বর্ণনায় কবি নারীর মনস্তত্ত্বের যে সূক্ষ্মজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রথম-শ্রেণীর কবির উপযুক্ত। মালেককে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নুরন্নেহা কাঁদিয়া আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া দিল। বহু দিনান্তে মালেক বাণিজ্য করিয়া অনেক ধনরত্ন অর্জ্জন পূর্ব্বক পুনরায় নুরন্নেহাদের গ্রামে আসিয়া জাহাজের নোঙ্গর লাগাইল—আর একবার নুরন্নেহার মুখখানি দেখিতে। কিন্তু বসন্তের মহামারিতে আজগর মিঞা ও নুরন্নেহা মরিয়া গিয়াছে। লোকে তাহাদের কবর দেখাইয়া দিল। মালেক সেই কবরের উপর পড়িয়া রহিল, তাহার জাহাজের লোকজন আসিয়া অনেক সাধাসাধি করিল, কিন্তু সে নড়িল না। সেই রাত্রে মালেক কবরের উপর নুরন্নেহার ছায়া-মূর্ত্তি দেখিতে পাইল, মূর্ত্তি যেন তাহাকে বলিল—"আমার দেহে রক্ত মাংস নাই, তবুও আমি তোমাকে ভুলিতে পারিতেছি না, তোমার জন্য দিবানিশি আমার মন কাঁদিতেছে।"

চোখের জলে কবরের মাটী ভিজাইয়া মালেক তথায় পড়িয়া রহিল—

"ক্ষুধা তৃষ্ণা তার কিছু নাইক মালুম
অনড় পড়িয়া আছে কন্ দিয়া গিছে ঘুম।
দাড়ি-মাঝি তারে আসি করে টানাটানি।
না খাইলরে দানা আর না খাইল পানি।"

বড় বড় বাণিজ্য-তরি সেই পথ দিয়া যাইত—সকলে দেখিতে পাইত—

"চাইয়া দেখে পাগলা মালেক চাইয়া দেখে দূরে,
আর কখনো বা কবরের চারদিকে ঘুরে,

কি এক ভাবনা ভাবে, মুখে নাই বাত,
ছেঁড়া কাপড় ছেঁড়া কোর্ত্তা, টুপি নাই মাথাত ॥"

এই গীতিকাটিতে প্রাদেশিকতা অত্যন্ত বেশী কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা বাঙ্গলা ভাষার অসাধারণ শক্তি প্রমাণ করিতেছে। মনের ভাব ব্যক্ত করিতে বাঙ্গলা ভাষার যে অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা আছে, তাহা বিস্ময়কর। মালেকের পিতা নজু মিঞা কাঁইচা নদীতে ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া মারা যায়, নজুর আশী বছর বয়স্কা মা--মালেককে বুকে করিয়া বিলাপ করিতেছেন। বৃদ্ধার বর্ণনা এইরূপ—

"আশী বছরের বুড়ী তুই ওক্ত রাঁধে।
সাগরে জোয়ার আইলে বুক কুটি কাঁদে ॥
কাঁদে বুড়ি রব করি শুনিতে অদ্ভুত।
হাড়ি কুমীরের মত করে 'হুত' 'হুত' ॥*
জোয়ারে না আইলি রে পুত, ভাটায় না আইলি।
কোন হাঙ্গরে কোন কুমীরে আমার পুতরে খাইলি ॥
নাতীরে লইয়া বুকে কাঁদে তার দাদী।
ছাওয়াল নাতীরে মোর না করালি সাদি ॥"

ছোটকালের প্রেম সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

"ছোট কালের পীরিতি রে ভাই কাঁটালের আটা।
ছাড়ালে না ছাড়া যায় এমি বিষম লেটা ॥
ছোট কালের পীরিতিরে কোকিলের রা।
উতরি উতরি উঠে, কলজাতে মারে ঘা ॥
ছোট কালের পীরিতিরে নারিকেলের তেল।
জমিয়া ছিল শীতের রাইতে রৈদে উনাই গেল ॥"

* 'হুত'—পুত শব্দের অপভ্রংশ।

কবির মাতৃভাষার উপর অদ্ভুত আধিপত্য, যা কিছু বলিতে চাহিতেছেন—তেমনি জোরের ভাষায় পর পর উপমা দিয়া ব্যক্ত করিতেছেন।

এই গানেও হার্ম্মাদ দস্যুদের ভীষণ উৎপীড়নের কথা অতর্কিত ভাবে জালিয়াগণ কর্ত্তৃক তাহাদের চক্ষে মুষ্টি মুষ্টি লঙ্কার গুড়া-নিক্ষেপ, জল দস্যুদের জাহাজের বর্ণনা, বাণিজ্য-তরি-বাহকদের বৈঠার তালে তালে দ্রুত ছন্দে সারিগান এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত কত কৌতূহলোদ্দীপক কথাই না আছে। গানটি কবিতার একটি বাগান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু নানা বিচিত্র ঘটনা ও দৃশ্যের বর্ণনা ছাপাইয়া উঠিয়াছে—মালেক ও নূরন্নেহার প্রেম-বদ্ধ সুবর্ণ-মূর্ত্তি খেজুবাহ মন্দিরের স্তম্ভে যে-সকল প্রস্তরের অনিন্দ্য সুন্দর প্রণয়-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম এই যুগল-মূর্ত্তি তেমনই সুন্দর, চোখের তৃপ্তি এবং আনন্দের প্রদীপ। এই গীতিকার গল্পের বাঁধুনি এমন চমৎকার যে—আধুনিক কালেব কোন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তাহা হইতে ভাল কিছু করিতে পারিতেন না আর কোন গীতিকার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই 'নুবন্নেহা ও কবরের কথা' প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের পংক্তিতে স্থান পাইবে। ইহা প্রায় আড়াইশত বৎসবের প্রাচীন, অথচ এদিকে আমরা আধুনিক গল্পগুলিকে বাঙ্গলা উপন্যাসের জনক বলিয়া নাগাড়ম্বর করিতেছি। ঘটনা-বৈচিত্র্যে চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং মূল-আখ্যায়িকাটি কেন্দ্রীভূত করিবার কৌশলে এই গীতিকার মত আর কয়খানি পুস্তক বাঙ্গলায় আছে তাহা জানিনা, তবে ইহা কবিতায় লেখা।

৯। 'দেওয়ানা মদিনা' নামক আর একটি গীতিকার কথা বলিয়া আমরা এই অধ্যায়ের শেষ করিব। গাথা সাহিত্যের পুষ্প-বনের মধ্যে এই গীতিকা পদ্মরাণী—ইহার তুলনা নাই। 'দেওয়ানা মদিনা' গীতিকার কথা আমি ইস্‌লামিয়া কলেজে আহুত একটি সভায় বিস্তারিতভাবে লিখিয়া

প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। 'বিচিত্রা' পত্রিকার ২য় খণ্ডের, ২য় সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত ফরাসী লেখক রোমাঁ্যা রল্যা এই গীতি-কাটির অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানের দু'টি শিশুপুত্র রাখিয়া তাঁহার পত্নী পরলোক-গমন করেন। সপত্নীর ষড়যন্ত্রে এই দু'টি কিশোর-পুত্রকে নৌকা ডুবাইয়া মারিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আদিষ্ট ব্যক্তি করুণা করিয়া কোন প্রবাসী বণিকের হাতে তাহাদিগকে সমর্পণ করে। সেই বণিক ইহাদিগকে অতি হীন কার্য্যে নিযুক্ত করে এবং অতি খারাপ খাদ্যাদি দিতে থাকে। জ্যেষ্ঠ আলাল এই কষ্ট সহিতে না পারিয়া পলাইয়া চলিয়া যায়। দেওয়ান সেকেন্দর অপর এক দেশ হইতে শিকার করিতে আসিয়াছিলেন, এই অপূর্ব্ব সুন্দর বালককে দেখিয়া তিনি আকৃষ্ট হন এবং তাহাকে স্বীয় প্রাসাদে আনিয়া লালন-পালন করেন। তাহার অসামান্য মনস্বিতা, ব্যবহারের সৌজন্য ও রূপ দেখিয়া তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ছেলেটি বড় ঘরের। কিন্তু বালক কিছুতেই পরিচয় না দেওয়াতে তিনি তাঁহার দুইটি কন্যার একটির সঙ্গে ইহার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। হতভাগ্য কনিষ্ঠ পুত্র দুলালকে বণিক এক চাষী-গৃহস্থের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলে।

এই চাষী গৃহস্থের অবস্থা এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে বেশ ভাল ছিল। তাহার বাড়ী-ঘর, জমি-জমা ও মদিনা নাম্নী এক কন্যা ছিল। দুলাল ও মদিনা যেন কায়ার সঙ্গে ছায়া, এই ভাবে একত্র বড় হইয়া উঠে। মদিনা মুহূর্ত্তকালও দুলালের সঙ্গছাড়া থাকিতে পারিত না। বৃদ্ধ কৃষক তাহার সম্পত্তি দুলালকে দিয়া এবং মদিনার সঙ্গে পরিণীত করাইয়া পরলোকে গমন করে।

কালে দুলালের সুরুজ নামে এক পুত্র জন্মে এবং রাজ্যচ্যুত কৃষকবেশী

দুলাল সেই অবস্থায়ও অসুখী হয় নাই। বরং মদিনার অক্লান্ত সেবা ও ভালবাসায় সে তৃপ্ত হইয়াছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অভাব তাহাকে মাঝে মাঝে বড়ই ব্যথিত করিত। সে তাহাকে পাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু খুঁজিয়া পায় নাই।

এদিকে আলাল বড় হইয়া তাহার প্রভু সেকেন্দর বাদ্শাহের নিকট হইতে কিছু সৈন্য ও বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য বিস্তর লোকজন লইয়া পিতৃ-ভূমিতে উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ-পিতা তাহাদের শোকে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং বিধবা-পত্নী রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া এরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রজা-পীড়ন করিতে থাকেন যে, তাহারা একরূপ বিদ্রোহী হইতে উদ্যত হয়। এই সময় আলাল যাইয়া নিজ পরিচয় দেওয়াতে প্রজারা তাহার সঙ্গে যোগ দেয়। রাণী পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন এবং আলাল পিতৃ-রাজ্য উদ্ধার করে, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য তাহার মনে কোন সুখ ছিল না। সেকেন্দর বাদশাহ্ এবার আলালের পরিচয় পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব করেন। আলাল বলিল—"আপনার দুই কন্যা—যদি আমার নিখোঁজ-ভ্রাতার সন্ধান মিলে, তবে আমরা দুই জনে দুই কন্যা বিবাহ করিব, কিন্তু তাহাকে না পাইলে আমি বিবাহ করিব না।"

আলাল ছদ্মবেশে দুলালকে খুঁজিতে বাহির হইল। কত বন-জঙ্গল, গ্রাম ও নগর খুঁজিতে খুঁজিতে একটি গ্রামের চাষাপাড়ায় উপস্থিত হইলে সেখানে দেখিতে পাইল—রাখাল বালকেরা ক্রীড়াচ্ছলে দল বাঁধিয়া একটি ছড়া গাহিতেছে, তাহাতে আলাল-দুলালের পূর্ব্বকথা সকল বর্ণিত আছে। আলাল বুঝিল, তাহার সন্ধানার্থই দুলাল এই ছড়াটি রচনা করিয়া পল্লীতে পল্লীতে প্রচার করিতেছে। ছড়া রচকের খোঁজ লইয়া সে দুলালের বাড়ীতে গেল। দুই ভ্রাতা পরস্পরকে

চিনিয়া সাশ্রুনেত্রে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া রহিল। আলাল বলিল,—"চল ভাই, আমাদের রাজত্ব ফিরিয়া পাইয়াছি। তোমার সিংহাসন প্রস্তুত আছে, উভয়ে মিলিয়া আমাদের পৈতৃক-রাজ্য ভোগ করি।" দুলাল বলিল,—"আমি যে এখন পাকা গৃহস্থ, মদিনা আমাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসে এবং দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র সুরুজ আমার কলিজার রক্ত। আমি এই স্নেহ-মায়া দিয়া গড়া বাড়ীঘর কিরূপে ছাড়িব?" আলাল বলিল—"তুমি স্ত্রীকে তালাক দিয়া যাও, তাহা হইলে ধর্ম্মের চক্ষে তুমি পতিত হইবে না। তাহাদের যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, মদিনা পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে এবং তাহার ও তোমার পুত্রের জীবিকা-নির্ব্বাহে কোন কষ্টই হইবে না। তুমি চাষার মেয়ে বিবাহ করিয়াছ, একথা প্রকাশ হইলে যে, আমাদের উচ্চ-বংশের মর্য্যাদা একেবারে লুপ্ত হইবে।" নানারূপে বাধ্য হইয়া, অত্যন্ত দ্বিধা-সম্পন্ন মনের অবস্থায় দুলাল স্বীকৃত হইল এবং মদিনাকে একখানি তালাকনামা পাঠাইয়া দিয়া নিজের দেশে চলিয়া গেল। খুব ধুমধামের সহিত দুই ভ্রাতা সেকেন্দর বাদ্শাহের দুই কন্যাকে বিবাহ করিল।

প্রথমতঃ মদিনা তালাকনামা বিশ্বাসই করে নাই। সে বুঝিয়াছিল, ইহা তাহার স্বামীর একটা রহস্যমাত্র। কিন্তু বহুদিন গত হইলেও যখন স্বামী ফিরিয়া আসিল না, তখন সে তাহার এক সম্পর্কিত ভ্রাতাকে সঙ্গে দিয়া সুরুজকে দুলালের নিকট পাঠাইয়া দিল। দুলালের সঙ্গে প্রাসাদের বাহিরে তাহাদের দেখা হইলে—দুলাল অতি নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া বলিল—"আর এক মুহূর্ত্তও তোমরা এখানে থাকিও না। তাহা হইলে আমার সমস্ত সম্ভ্রম নষ্ট হইবে এবং লজ্জায় মাথা কাটা যাইবে।" কাঁদিতে কাঁদিতে সুরুৎজামাল বাড়ীতে ফিরিল, তাহার মায়ের মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মদিনা পাগল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

এদিকে সুরুজকে প্রত্যাখ্যান করার পর হইতে তীব্র অনুতাপে দুলালের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কতকালের কত স্নেহ-কথা ও সুরুজের ম্লান-মূর্ত্তি মনে হইয়া তাহার হৃদয় খাক্ হইয়া গেল—ধন-সম্পত্তি, রাজপদ তাহার তুচ্ছ মনে হইতে লাগিল। সে কাহাকেও না বলিয়া, কোন সঙ্গী না লইয়া মদিনার উদ্দেশ্যে স্বীয় পুরাতন কুটীরে উপস্থিত হইল এবং মদিনার কবরের কাছে ডেরা বাঁধিয়া ফকির-স্বরূপ জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিল।

এই গীতিকাটি অতি সংক্ষেপে কথিত হইল। ইহার গল্পভাগ তেমন জমাট্ বাঁধে নাই। ইহার প্রথম দিকটা অনেকটা একটা প্রাচীন উপকথা,—বিমাতার ষড়যন্ত্রের কাহিনীও কতকটা সেই উপকথার অংশ। কিন্তু বিমাতাকে কবি যেরূপে অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নারী-চরিত্রের ছলনা ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অপূর্ব্ব ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। যে রঙ্গীন রাজকীয় ডিঙ্গিতে আষাঢ় মাসের নূতন জলের মধ্যদিয়া কুমারদ্বয়কে মধ্যগাঙ্গে নেওয়া হইয়াছিল, তাহার বর্ণনাটি চমৎকার। যে-ভাবে বিমাতা কুমারদের ও তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিল, তাহার বর্ণনায় লেখক বিলক্ষণ কাব্য-প্রতিভা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই অংশ শেষাংশের সহিত জুড়িয়া দিয়া কবি কাহিনীটিকে বৃথা দীর্ঘ করিয়াছেন। প্রকৃত গল্প আরম্ভ হইয়াছে আলালের সঙ্গে সেকেন্দর বাদ্শাহের সাক্ষাৎ ও দুলালের সঙ্গে আলালের পুনর্মিলনের সময় হইতে।

দুলাল তালাকনামা দিয়া চলিয়া গেলে মদিনা তাহা বিশ্বাস করে নাই—

> "তালাকনামা যখন পাইল মদিনা সুন্দরী।
> হাসিয়া উড়াইল কথা বিশ্বাস না করি॥
> আমার খসম মোরে না ছাড়িবে পরাণ থাকিতে।
> চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে॥

তারে ছাড়িয়া দুলাল রইতে না পারিব।
কতদিন পরে খসম নিশ্চয় আসিব ॥
আজ আইসে, কাল আইসে, এই না ভাবিয়া।
মদিনা সুন্দরী দিল কত রাইত গোঁয়াইয়া ॥
আজ বানায় তালের পিঠা, কাল বানায় খই
সিকাতে তুলিয়া রাখে গামছা-বাঁধা দই ॥
শালি ধানের চিড়া কত যতন করিয়া।
হাঁড়িতে ভরিয়া রাখে, সিকাতে তুলিয়া ॥
ভাল ভাল মাছ আর মোরগের ছালুন।
আজ আইবে বলে রাখে খসমের কারুন ॥”

এই সরলা চির-প্রত্যয়শীলা লক্ষ্মী মূর্ত্তিরা এখনও বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বুকে পাষাণ বাঁধিয়া কত দুঃখ নীরবে সহিতেছেন তাহাদের ধৈর্য্যের অন্ত নাই, ভালবাসার অন্ত নাই। হায়! শিক্ষিত সম্প্রদায়, তোমরা ইহাদিগকে চিনিলে না! ঘরের-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছ—বিলাতী চলচ্চিত্রের নাচুনীদের মোহে!

মদিনার সরল হৃদয়ের বিশ্বাসের লৌহ-কপাট বাস্তব-সত্যের বজ্রাঘাতে সেইদিন ভাঙ্গিল, যে-দিন সুরুজ—পিতাকে আনিতে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল। তখনকার দৃশ্য হৃদয়বিদারক। মদিনা গত জীবনের স্বামীসঙ্গ স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছে—

“মদিনা কাঁদয়ে আল্লা কি লিখেছ কপালে।
বনের পংখী হইয়া যেমন উইড়া চলে গেলে ॥
পরাণের পংখী আমার, পরাণ লইয়া গেলা।
পাষাণে বান্ধিয়া দিল্ কেমনে রহিব একেলা ॥

একদিন তো না দেখিয়া থাকিতে নারিত।
কোন্ পরাণে কৈল হেন কাজ বিপরীত॥"

১০। 'বার মাসের পালা'—ইহার প্রতিটি ছত্র শেলের মত বুকে ঘা দেয়—

"লক্ষ্মী না আঘন মাস বাওয়ার দাওয়া মারি।
খসম মোর আনে ধান, আমি ধান লাড়ি॥
দুই জনে বইসা শেষে ধানে দেই উনা।
টাইল ভইরা রাখি ধান করি বেচাকিনা
হায়রে পরাণের খসম এমন করিয়া।
কোন্ পরাণে রইলা তুমি আমারে ছাড়িয়া॥
পোষ না মাসেতে যখন ছাবে সাইল ক্ষেত।
আমি না অভাগী পর দেই যত লেত খেত॥
উকায় ভরিয়া পানি তামুক ভরিয়া।
খসমের লাইগা থাকি পথপানে চাইয়া॥
ক্ষেত না পেকিয়া খসম যখন দেয় গুছি।
ভাত না রান্ধিয়া তার লাগি বৈসা থাকি॥
জালা আগাইয়া দেই ক্ষেতের কাছেতে।
কত তারিপ করে খসম আসিয়া বাড়ীতে॥
দারুণ মাঘ মাসের শীতে কাঁপয়ে পরাণী।
উষাকালে উঠ্যা খসম সাইল ক্ষেতে দেয় পানি॥
আগুন লইয়া আমি যাই ক্ষেতের পানে।
শীতে কাঁপি, আগুন তাপাই দুই জনে॥
সাইলের দাওয়া মারি যতনে তুলিয়া।
সুখে দিন যায়রে আমার ঘরেতে বসিয়া॥

সেই তো সুখের কথা যখন হয় মনে।
মদিনার বয় পানি অঝ্‌ঝর নয়নে॥
খসম কাটে চারি আর আমি আনি পানি।
দুইয়ে মেলি করি কাম আমি অভাগিনী॥"

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এই মাসগুলির বর্ণনার মধ্যে প্রচলিত বারমাসীগুলির একঘেয়েমি নাই। চাষা-কবি কোন্ কবি-প্রসিদ্ধির ধার ধারেন না। তিনি কৃষকের বাস্তবচিত্র দিয়াছেন। সাধারণতঃ বারমাসী গুলি বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয়। কোকিলের রা এবং আম্র-মুকুলের গন্ধের কথা দিয়া তাহা সুরু হয়। কিন্তু এখানে শুধু অগ্রহায়ণের নূতন ধান্তেই তাহাদের মঙ্গল-উৎসব। সেই দিনের কথাই মদিনার স্বাভাবিকভাবে প্রথম মনে পড়ার কথা।

এই গীতিকার অনেক কথা পাঠক বুঝিতে পারিবেন না। তাহা আরবী, ফারসী, উর্দ্দূ ও সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্যের জন্য নহে। চাষারা—কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই ইহা অনায়াসে বুঝিবে। কিন্তু যদি গুছি, জালা, অঝ্‌ঝর, বাওয়া প্রভৃতি কথায় আসিয়া পাঠক ঠেকিয়া পড়েন, তবে তাহার জন্য আমার কোন সহানুভূতি হইবে না। এই বঙ্গদেশের চৌদ্দ আনা লোক চাষ-আবাদ করিয়া খায় তাহারা কৃষক, তাহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য কথাগুলি যদি আমরা না বুঝি, যদি তাহাদের এত কষ্টে তৈয়ারী নানারূপ চাউল দুই-সন্ধ্যা বিলাসের উপকরণের সহিত তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়া জীবন রক্ষা করি, অথচ যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান জিনিষ উৎপন্ন করিয়া দেয়, এই বাঙ্গালা দেশে বসিয়া সেই বাঙ্গালার বেশীর ভাগ লোকের কথা যদি আমরা না বুঝি দেশের সঙ্গে যদি আমাদের এমন ভাবের নাড়ীচ্ছেদ হইয়া থাকে, যদি নিজ দেশের জনসাধারণের ভাষা অভিধানে স্থান না দিয়া বাঙ্গলা অভিধানখানিকে সংস্কৃত

শব্দে বোঝাই করিয়া দেশের লোকের অনধিগম্য করিয়া তুলিয়া থাকি, তবে রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিভূ সাজিয়া মিলনের চীৎকার করা বৃথা।

যাহা হউক, আমরা মূল বিষয়টির পুনশ্চ অবতারণা করিব। তারপর মদিনার এই অবস্থা কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

"কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিবির দুঃখে দিন যায়।
খানাপিনা ছাইড়া কেবল করে হায় হায়॥
তারপরে না চিন্তায় শেষে হইল পাগল।
যাই না মুখে আসে, তাই না বলয়ে কেবল॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে দেয় গালি।
ক্ষণে গায়, ক্ষণে জোকার দেয়, ক্ষণে করতালি॥
খাওনা-বেগর আর এই না অবস্থায়।
সোনার অঙ্গ মৈলান হৈয়ে হাড়েতে মিশায়॥
দিনে দিনে সর্ব্ব অঙ্গ হৈল হাড় শেষ।
কালি হৈল সোনার মুখ ছেঁড়া তার বেশ॥
তারপর না একদিন সকল চিন্তা রৈয়া।
বেহেশ্‌তের হুরী গেল বেহেশ্‌তে চলিয়া॥
দুধের বাচ্চা সুরুজজামাল পড়িয়া মায়ের 'পর।
চখের জলেতে ভাসে কান্দিয়া বিস্তর॥
পাড়া-পড়শী মিলে সবে কবর খুড়িয়া।
মাটি দিল ফতোয়া-মতন জানাজা পড়িয়া॥"

এই অভাগিনী স্বামী-গত-প্রাণা মদিনা স্বামীকে যে ভালবাসিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই, খাঁটী ভালবাসা কখনও ব্যর্থ হয় না। সেই বিদেহী, অশরীরী প্রেমকে জল অগ্নি, সময়, বজ্র, বিদ্যুৎ কিছুতে ধ্বংস করিতে পারে না।

মদিনা মরিলে দুলালের অনুতাপ এইবারে জ্বলিয়া উঠিল—

"বিদায় দিয়া সুরুজেরে চিন্তয়ে দুলাল
কলিজার লৌ আমার সুরুজ জামাল।
কি কইবে মদিনা বিবি শুনি মোর কথা
দুঃখ সে পাইল তারে দিলে কত ব্যথা।
সে নাকি পরাণ দিয়া কিন্যাছিল মোরে
ফাঁকি দিয়া কোন পরাণে আইলাম তারে ছাইড়ে।
দুঃখের দোসর বিবি আমার যে জান
তারে ছাড়্যাছি আমার কেমন পরাণ।
তার বাপে দুঃখের দিন আশ্রয় দিল মোরে
সুখের লাগিয়া বেয়া দিয়াছিল তারে।
আমার পানে চাইয়া দিছিল বাড়ীঘর যত
ভাব্যাছিল মনে আমি সুখ দিবাম কত।
সেইনা মদিনারে আমি দিলাম বড় দাগা
মরিলে দোজখে হায়রে আমার হইব জায়গা।
এই না ভাবিয়া দুলাল কোন কাম করে
না জানায় আলাল ভাইরে না জানায় স্ত্রীরে।
ঘর থনে বাহির হইয়া পন্থে দিল মেলা
লোকলস্কর নাই সে চলিল একেলা।"

পথে যাইতে যাইতে মাথার উপর কর্কশ কাকের 'কা-কা' শব্দ শুনিল, একটা গাভীন-শেয়ালী ডাইন দিকদিয়া চলিয়া গেল, দুলাল দুর্লক্ষণ দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া চলিতে লাগিল।

এই ত গ্রামের পথ, সে বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে; একি! মদিনার এত যত্নের এত আদরের গাইটা পথে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। "ঘাস নাই পানি নাই, ডাকে ঘন ঘন।"

যখন মদিনা ছয় বছরের ফুট্‌ফুটে মেয়েটি ছিল, দুলালের আঙ্গুল ধরিয়া বেড়াইত—এক দণ্ড দুলালকে ছাড়া থাকিত না—সেই সময় বৈশাখ মাসে একটি বুলবুলীর বাচ্চা তার মায়ের সঙ্গে উড়িতে শিখিতেছে দেখিয়া সে দুলালকে আবদার করিয়া বাচ্চাটি ধরিয়া দিতে বলিল। সেই বাচ্চা ভাল খাঁচায় পুরিয়া তাহারা দুইজনে এতকাল পালন করিয়াছে। আজ খাঁচাটা ভাঙ্গা দাওয়ায় পড়িয়া রহিয়াছে। এত সাধের বুলবুলি ঘরের চালার উপর বসিয়া করুণস্বরে চীৎকার করিতেছে। পালিত বিড়ালটি রান্নাঘরের এক কোণে বসিয়া ডাকিতেছে—তথায় কেহ নাই।

এই গত জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বামী-স্ত্রী দুইজনে মিলিয়া একটা ভাল আমের চারা আঙ্গিনায় পুতিয়াছিল। মদিনা রোজ রোজ জল ঢালিয়া সেটিকে বড় করিয়াছিল—"সেইনা আমের চারা গরুতে খাইল।"

এই সকল দেখিয়া উৎকণ্ঠায় দুলালের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। সে 'মদিনা মদিনা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হায়রে, যদি মদিনার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিত, প্রাণের একটি স্পন্দন থাকিত—তবে স্বামীর সেই অমৃততুল্য কণ্ঠস্বরের আহ্বানে সে পুনর্জ্জীবন পাইত। কিন্তু তাহার কোন সাড়া নাই। ঘরের এককোণে সুরুজ মরার মত পড়িয়াছিল, বাপজানের ডাক শুনিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

"দুলাল জিগায়—সুরুজ, মদিনা কোথায় ?
চোখে হাত দিয়া সুরুজ কবর দেখায়।"

দুটি ছত্রে একটি নিদারুণ করুণ ছবি। এক হাত দিয়া সুরুজ চোখের জল ঢাকিতেছে, অপর হাত দিয়া পিতাকে আঙ্গিনার এক পার্শ্বে মাতার কবর দেখাইতেছে।

সেই দৃশ্য দুলাল দেখিতে পারিল না, সহিতে পারিল না।

"নিজহাতে বধ করলাম মদিনার প্রাণ
এই দুনিয়ায় আর নাই মোর থান।
আইসরে পরাণের বিবি কবর ছাড়িয়া
কথা কও মোর পানে তাকাও ফিরিয়া।
আমি যদি কৈরাছি পাপ রইছ ছাড়িয়া
পরাণের সুরুজে কেমনে রইলে ভুলিয়া।
জমিনের গাছ-বিরিক্ষি আসমানের তারা
আমার পাছেতে হৈল রাইতের আঁধিয়ারা।
দেওয়ান বিবির লোভে আমি করিলাম বেসাতি
জমিনের ধুলার লাইগা ছাড়লাম হীরামতি।
ছোটকাল হইতে মোর মদিনা পরাণি
একদণ্ড না দেখিলে হৈত পাগলিনী।
এক সাথে গোয়াইনু কত না বৎসর
দোজখে রহিলাম আমি মদিনা বেগর।"

তার পরে সেই মদিনার কবরের কাছে এক ডেড়া বাঁধিল—

"আর সে বানিয়াচঙ্গে ফিরিয়া গেল না।
দুলালের কান্দনেতে পাথর গল্যা পানি।
জালাল গাইনে গায় দুঃখের কাহিনী।"

আমরা শিক্ষিত-সম্প্রদায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মালিক। খনির মধ্যে খনির ন্যায় আমাদের পল্লীতে পল্লীতে বঙ্গ-ভারতীর যে অজস্র দান পড়িয়া আছে তাহা আমরা দেখি নাই, শুনি নাই—বিদেশী পণ্ডিতেরাও তাহা দেখেন নাই সুতরাং তাহাদের মুখে—ভাল—এই কথাটি না শুনিলে আমরা ভাল বলিব কিরূপে? এইরূপ শত শত গীতিকা ও কথা আছে। তাহাদের

অনেকগুলি নবম দশম শতাব্দীর; হিন্দু-মুসলমানের পৃথক ছাপমারা তাহারা নয়—তাহারা উভয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব। এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের মালিক বাঙ্গালী। আমি শুধু মুসলমান কবিদের কয়েকটি রচনার নমুনা দিলাম, তাহাও অতি অল্প সংখ্যক। অপ্রকাশিত বহু গীতিকা আমার কাছেই আছে—বাঙ্গালার পল্লী-দরদী লোক যদি খুঁজিয়া বেড়ান, তবে এখনও বৃদ্ধ গায়েন অনেক আছেন—যাহাদের নিকট হইতে এখনও শত শত কাহিনী ও গীতিকার উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু আমরা ছাত্রদিগকে বিদ্যার্জ্জনের জন্য বিলাতে পাঠাই, তাহারা বঙ্গদেশকে ঘৃণা করিতে শিখিয়া আসে। কত সহস্র টাকা বৎসর বৎসর এইভাবে ব্যয় হয়, কিন্তু তাহারা যে আমাদের দেশের ক-খ জানে না, অথচ তাহা জানিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিলাত যাত্রা ও তথায় শিক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির শতাংশের একাংশ ব্যয়ও পড়ে না। নিজের দেশ না জানিয়া প্রবাসে যাইয়া আমরা ইঙ্গবঙ্গ সাজিয়া আসি ও লক্ষ টাকার অধিকারী আমরা, অথচ একশত টাকার তোড়া দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাই। হিন্দুদের রচিত—মহুয়া, কাজলরেখা, চন্দ্রাবতী, কমলা, কেনারাম, মালঞ্চমালা প্রভৃতি অনেক গীতিকা ও রূপকথা আছে—মূলতঃ তাহাদের সঙ্গে মুসলমানগণের রচিত কাব্যগুলির প্রভেদ অল্প—একই ধাঁচের লেখা, একই সুর, একই আদর্শ। একথা পরে লিখিব।

কিন্তু আমরা মনে করি, 'আলালের ঘরের দুলাল' টেঁকচাঁদ ঠাকুর কৃত, তৎপূর্ব্বে প্রমথ শর্ম্মার 'নববাবু বিলাস'—কিংবা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা'—সর্ব্বশেষে বঙ্কিমচন্দ্র এবং অতি আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—ইহারাই আমাদের কথা-সাহিত্যের গুরু। কিন্তু এই বিগত এক হাজার বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী কথা-সাহিত্যে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা যে অদ্ভুত প্রতিভা দেখাইয়াছেন, তাহা ঢাকার মস্‌লীন ও সাতৈয়ের পাটিজাতীয়—তাহাদের তুলনা নাই। একবার এইরকম গল্প-কথার

ভাণ্ডারে প্রবেশ করুন। বিদেশী সমালোচকেরা প্রকৃত জহরী—তাঁহারা এই গল্প-সাহিত্যের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা স্তবের মত শোনায়।

এই পল্লী-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহার মূর্খ-লেখকদের আদর্শ (বিশেষরূপে প্রেমের রাজ্যে) এত বড় যে, তাহার চূড়া হিমগিরির গৌরীশঙ্করের মত আকাশে ঠেকে। প্রেমের দুই মুহূর্ত্তের লীলা-খেলা, একটি চুম্বন বা কর-স্পর্শের ভিক্ষা করিয়া এই প্রেমের পিয়াসা মিটিয়া যায় না। সমস্ত কথা-সাহিত্যের ভূমাই লক্ষ্য। প্রেমের রাজ্যে এই সাহিত্যের নাম তপস্যা। যাঁহারা অগ্নিহোত্রী, যাঁহারা জীবনপণ করিয়া অরণ্য ও গিরিগুহায় সিদ্ধির জন্য সাধনা করেন, বাঙ্গালার পল্লীর প্রেমিকেরা তাঁহাদেরই সগোত্র। যাঁহারা তরল আমোদ-প্রমোদে প্রেমের স্বরূপ মনে করেন, তাঁহারা সিনেমা দেখিতে যাইয়া মুহূর্ত্তের কৌতুক উপভোগ করিয়া আসুন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভীষণ ভুজঙ্গসঙ্কুল তড়াগে, কণ্টকাকীর্ণ জলপথে পদ্ম তুলিতে যাইয়া কখনও ডুবিয়া মরিয়াছেন, কখনও একবার পাইয়া আবার হারাইয়া পুনশ্চ পাইবার জন্য প্রাণপণ তপস্যা করিয়াছেন—তাঁহাদের এই সাহিত্য রাম-শ্যামের জন্য নহে। এজন্য ডিরেক্টার ওটেন সাহেব 'ইংলিশম্যান'-এ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই—"যদি কোন পাশ্চাত্য সমালোচক সৌভাগ্য বশতঃ হঠাৎ এই গীতিকাগুলির সাক্ষাৎকার পান, তবে ইহাতে এদেশের লোকের সংস্কার-মুক্ত মর্ম্মকথার পরিচয় পাইবেন—এই অভিজ্ঞতা তাঁহার কাছে এক নব আবিষ্কারের সন্ধান দিবে, কলিকাতা সহরের শ্রমক্লান্ত-পান্থ সহসা ষ্টীমারে যদি পূর্ব্ববঙ্গের বিশাল নদীতে পৌঁছিয়া বর্ষার উদার হাওয়া উপভোগ করেন, তবে তাঁহার যেমন সমস্ত ক্লান্তি অপনোদিত হইয়া এক অপূর্ব্ব পুলকে মন পূর্ণ হয়, এই গীতিকাগুলি পাঠ করিয়া আমার তেমনই অপ্রত্যাশিত আনন্দ হইয়াছে।" [To the western critic stumbling by good fortune over

Dr Sen's book, these ballads straight from the unsophiscated heart peoples heart Come fresh and stimulant as the breeze that revives the faded traveller from Calcutta as he is in steamer and ploughs across the monsoon gusts of Eastern Bengal.—Oaten in the Englishman.]

আমেরিকান সমালোচক এলেন লিখিয়াছেন—"এই সকল গীতিকায় স্বাধীনতার যে-সব ছবি দৃষ্ট হইল, তাহাতে ভারত ইতিহাসের এই সত্য উপলব্ধ হইল যে, এদেশে বার্দ্ধক্যের জড়তা এখনও আসে নাই, ইহার যৌবন-শ্রী অব্যাহত আছে। যে-সকল জাতি এখনও প্রাচীন হইয়া তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি এবং দেশ গড়িয়া তুলিবার কথা ভোলে নাই, তাহাদের রক্তে সেই বাণী এখনও সাড়া দেয়, এই গীতিকাগুলি যেন সেই দেশেরই বাণী—আমি এই সুপ্রাচীন বঙ্গদেশে সেই অক্ষুণ্ণ যৌবনের সজীবতা ও সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছি।" [All of which confirmed my conviction that India could never have reached such age unless bearing within it the roots of unweakening youth I was greatly interested to find literary fruits of this ancient nation where the age of pioneers is not too far in the past and where creator of nations hinger still in folk's memory as in its blood.]

সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক রদনষ্টাইন লিখিয়াছেন—"এই গীতিকাগুলি আমার কাছে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম অবদান বলিয়া মনে হইয়াছে। ইহা সৌন্দর্য্য ও নাট্যকলার খনি। প্রত্যেকটি গীতিকায় ভারতের সেই মহীয়সী, স্থির অথচ ভাবময়ী, ব্রীড়ান্বিত অথচ আবেগশালিনী, সংযত অথচ সাহসিকতাপূর্ণ—অত্যাশ্চর্য্য রমণী-মূর্ত্তি দেখিলাম এই মূর্ত্তি ভারতের যুগ-যুগান্তরের সমস্ত সমাজ ও ধর্ম্ম-বিপ্লবের মধ্যে একই অটুট

সৌন্দর্য্য বিদ্যমান যে-মূর্ত্তির পূজারীরা তাঁহাকে বরহুত, সাঁচী ও অমরাবতীর পাথরে এবং মর্ম্মরে খোদিত করিয়াছে, অজন্তা ও বাগে রত্নোজ্জ্বল চিত্রে চিত্রিত করিয়াছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শত শত ক্ষুদ্র চিত্রে—জম্মু, জয়পুর, দিল্লী এবং আগ্রায় অর্ঘ্য প্রদান করিয়া সম্মান করিয়াছে, আপনার সংগৃহীত গীতিকায় ভুবনমোহিনীদের যে মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহা সেই প্রাচীন মহিলাদেরই ধারা। ভারত তাহার প্রাচীন-কলার যতই না কেন নব্য-অভ্যুত্থান আনয়ন করুক, এই গীতিকাগুলির সহজ প্রগাঢ় অনুভূতি এবং ভাব-প্রকাশের সহজ ভঙ্গীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না।"

[It is of the greatest possible interest and full of beauty and drama. Though every ballad moves that marvellous being exalted, grave and shy and passionate, reserved and cold and how nobly beautiful the Indian woman ! She has remained unchanged through all the phases of Indian culture, social and religious. Her lover carved her in Stone and marble at Barhut, Sanchi and Amaravati, painted her rediant and bejwelled at Ajanta and Bagh and delighted to honour her in thousand of humble studies in Jammu, Jaipur, Delhi and Agra, Muslim as all well as Hindu well in to the 19th century. No revival seems able to preserve the strength and directness of true Indian tradition which is still alive in your latest Ballads]

ভারতীয় শিল্পের বিখ্যাত সমালোচিকা এবং কলা-শিল্পী ফরাসী মহিলা হেগ্ লিখিয়াছেন—"আমি বিশ বৎসর যাবৎ ভারতীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সহসা যে এরূপ অতুলনীয় অপূর্ব্ব রত্নের

খনি পাইব, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এই গীতিকাগুলি জগতের সাহিত্যের প্রথম পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য এবং যুগে যুগে পাঠকগণ ইহার নব-নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিবেন। ইহাদের নারী-চরিত্রগুলি কি অপূর্ব্ব! সেক্সপীয়র ও রেসনীর নারী-চরিত্রগুলির ন্যায় ইহারা প্রতি ঘরে পঠিত হইবার যোগ্য।" [Oh ! all these plucky women ! they ought to be known like the women in shakespeare and Racine.] তিনি এক দীর্ঘ পত্রে বহু গীতিকা হইতে কবিত্ব ও চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে মেটারলিঙ্ক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লেখকদের চরিত্র-সৃষ্টিতে দোষ আছে। কিন্তু এই রমণী-চরিত্রগুলি একেবারে নিখুঁত। তিনি গীতিকাগুলির ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ রোমঁ্যা রলঁ্যার ভগ্নী তাঁহাকে সানন্দে সাহায্য করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

ডক্টর সিলভ্যাঁ লেভি (Dr. Sylvan Levi) লিখিয়াছেন— "সাহিত্য-কলার অপূর্ব্ব ফলস্বরূপ আমি এই শীত-প্রধান, কুহেলিকাচ্ছন্ন দেশের বিশ্রী এবং বিষাদময় আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়াও আজ এই গীতাকাগুলির প্রসাদে আপনাদের দেশের সুনির্ম্মল নীল আকাশ, মনোরম প্রবহমাণ নদী-স্রোত এবং চির-সবুজ বন-ভূমির স্বপ্ন দেখিতে পাইতেছি এবং সেই অনির্ব্বচনীয় সুন্দর পরিবেষ্টনীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ়রূপে অনুরক্ত এবং হিংস্র বন্য-জন্তুদের প্রতি উপেক্ষাশীল ও সমস্ত বিপদে ভ্রুক্ষেপহীন দু'টি নায়ক-নায়িকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি, যাহারা ভালবাসার সুধারস-পানে সমস্ত বাহ্য-জগৎ ভুলিয়া গিয়াছে।" [This is the wonder of art that owing to you I could in the sad, dull, dim days of winter dream of a blue sky, of lovely rivers and of ever green woods, of

couples of lovers wandering amidst the wild beasts, raptured by their natural love.—Dr. Sylvan. Levi.]

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও শিল্প-সমালোচক ডক্টর ষ্টেলা ক্র্যামরিশ মহুয়া' পড়িয়া লিখিয়াছেন—"সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে আমি এমন উপাখ্যান পড়ি নাই। আমার জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু এই জ্বরের ঘোরেও আমি তিন রাত্রি মহুয়া নদের চাঁদ ও হুমরা বেদেকে স্বপ্নে দেখিয়াছি।"

মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড এই গীতিকাগুলির প্রথম ভাগের একটি নাতি-ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন—"প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃগণ যদি তাঁহাদের শাসিত-দেশের লোক-চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তবে বিশেষ প্রণিধান করিয়া এগুলি তাঁহাদের পড়া উচিত।"

বিদুষী মিসেস্ আর্কিট 'মহুয়া' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই গীতিকাটির মর্ম্ম-স্পর্শ করিবার ক্ষমতা সেক্সপীয়রের লেখার মত। এই সকল গল্প পড়িয়া মনে হয়, বাঙ্গালার ভাবী-রঙ্গমঞ্চের অসামান্য সফলতার সম্ভাবনা আছে" [Shakespearian in the directness and simplicity. You have the possibilities of great stage.]

শত শত অতি দীর্ঘ সমালোচনা সম্বন্ধে আর বেশী কিছু লিখিব না। বিলাতের 'টাইম্‌স্ পত্রিকা' দুইটি সম্পাদকীয়-স্তম্ভে এই গীতিকাগুলির অজস্র প্রশংসাসূচক সমালোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য আরও বহু পত্রিকা ও সুধীমণ্ডলী ইহাদের শত-মুখে প্রশংসা করিয়াছেন।

গীতিকাগুলির বর্ণিত প্রেম-সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিব, মদিনার কাহিনী পড়িয়া তাহা পাঠক বিশেষ করিয়া বুঝিবেন। এই প্রেম মৌরুস

ও ঘটনাবহুল বাস্তব-কাহিনীর মধ্যে শুধু মাঝে মাঝে একটি সুগন্ধি দম্‌কা হাওয়ার মত ক্ষণস্থায়ী আনন্দ বিতরণ করিয়া দিয়া বহিয়া যায় নাই—ইহা শুধু রঙ্গীন ভাবুকতার চিত্রও নহে। কৃষকের কঠিন শ্রমিক-জীবন তাহার নৈসর্গিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে যে কিরূপ মধুময় হইতে পারে—দৈনন্দিন চাষ-আবাদের মধ্যে—বেলা-অবসানে স্বীয় কুটীরে—নানা বিচিত্র অবস্থায়, দিনের পর দিন কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের সাহচর্য্যে ও তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের আনন্দ জলাভূমিতে অজস্র কুমুদের মত কিরূপ বাড়িয়া উঠে, কবি সেই চিত্র দিয়াছেন। কৃষি-প্রধান বঙ্গদেশের কবি যাহা দিয়াছেন, অন্য কোন দেশের কোন কবি দিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বতের বিচিত্র কুসুম-সম্ভারের মধ্যে সীতার সঙ্গে বিচরণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"তোমার সঙ্গে এই পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিয়া আমি অযোধ্যার সাম্রাজ্যও তুচ্ছ মনে করিতেছি।" একদিন দেওয়ানগিরি পাইয়াও দুলাল তাহার কুটীর-জীবনের প্রতি অনুরাগ সেইরূপভাবে বুঝিতে প রিয়াছিল।

এই প্রেম ভগবানের দান, কর্দ্দমের মধ্যে প্রস্ফুট কমল, জঙ্গল-ঘেরা পুষ্পবন, দুর্গম স্থানের অনাস্বাদিত সুষমা। ব্রততী যেমন তরুকে জড়াইয়া ধরে, ঐ দাম্পত্য-প্রেম সেইভাবে কৃষকের কুটীরকে আনন্দের নিকেতনে পরিণত করে; অথচ বুল্‌বুলীকে ধরা, খাঁচায় পোষা, আমের চারা পোতা প্রভৃতি শৈশবের ঘটনাগুলি বাস্তব-জীবনের মধ্যে অনৈসর্গিক পূর্ব্বরাগের জন্ম দিয়াছে। প্রেম ভূমিস্পর্শ করিয়া ভূমির উর্দ্ধে উঠিয়াছে।

এই যে চাষার-জীবনে বাস্তব-জীবনের খুঁটিনাটির মধ্যে প্রেমের প্রকাশ—তাহার মৌলিকত্বও আছে; তাহাতে romance-এরও অভাব নাই। কবি চাষার-প্রেমের যে চিত্র আঁকিয়াছেন ও তাহাতে যে উচ্চ আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

৯। 'সোনাবিবি'র পালাটি সম্পূর্ণ আমার কাছে আছে, ইহার অল্প অংশ মাত্র ছাপা হইয়াছে। মামুদ ও তাহার স্ত্রী সোনার প্রেম-চিত্র পল্লী-কবি এইভাবে আঁকিয়াছেন—

"সকল ছাড়িয়া মামুদ গৃহেতে বসিল।
সোনার লাগিয়া মামুদ পাগল হইল॥
বাপ-আমলের খাট-পালঙ্গ, সাজুয়া বিছানা।
শয়ন করে মামুদ সঙ্গে লইয়া সোনা॥
কি জানি সোনার যদি ঘুম নাহি আসে।
আবের পাংখা লইয়া মামুদ জুড়ায় বাতাসে॥
ঝিলিমিলি মশারী টাঙ্গা তবু মনে ভয়।
মশার কামড়ে যদি ঘুম নাহি হয়॥
পিঁপড়ার কামড়ে পাছে গায়ে হয় চাকা।
আপনি অঞ্চল দিয়া সাধু অঙ্গ দেয়রে ঢাকা॥
মধুর আলাপে নিশি গত হইয়া যায়।
মামুদ ভাবে আজের নিশি কেনবা পোহায়॥
ডেকনারে সোনার কোকিল
বাচ্চায় দেওরে উম।
তোমার ডাকে ভাইঙ্গা যাইব
আমার সোনার ঘুম॥
শোন শোন বনের দইয়াল দিওনারে শিষ।
কাঁচা ঘুমে জাগলে সোনার মাথায় হৈবে বিষ॥
'বিয়ান বেলায় ভোমরারে কইয়া বুঝাই তোরে।
ফুলের ঘুম ভাঙ্গাওনা গুন্গুর গুন্গুর সুরে॥
বাড়ীর পাছে বাঁশের ঝাড়ে নাচিছে খঞ্জনা।
বিভোলে শয্যায় পড়ি ঘুমায় প্রাণের সোনা॥

দুই আঁখি মুদিয়া কন্যা বিভোলে ঘুমায়।
দুই আঁখি মেলিয়া মামুদ ভিয়াসে তাকায়॥
বসনে না ঘিরে অঙ্গ মামুদ ভাবে মনে মনে।
কি জানি ছুঁইতে গেলে ভাঙ্গে, কাঁচা ঘুম॥
মাথার কেশ আউলা ঝাউলা শয্যার তলে লুটে।
বিয়ানের বাতাসে কন্যার মধু নিদ্রা টুটে॥
বাহুটি শিথানে কন্যা শুইয়া নিদ্রা যায়।
জাগাইতে না পারে মামুদ কি করে উপায়॥
ধীরে ধীরে পুষ্পের কলি ফুট্যা যেমন উঠে।
দুই নয়ন জড়াইয়া ঘুম আস্তে আস্তে টুটে॥
দুই বাহুর আলিঙ্গনে সোনা নয়ন মেইলা চায়।
লাজে রাঙ্গা হৈল কন্যা সিন্দুরের প্রায়॥
আউলা কেশ তুইলা কন্যা ঝাইরা বান্ধে চুল।
মুখ খানি যেমন সোনার ভোরের পদ্ম ফুল॥
মুখে চুম্ব দিয়া মামুদ ঘরের বাহির হইল।
দুয়ারেতে মা জননীকে দেখে লজ্জা পাইল॥"

মামুদ স্ত্রীকে লইয়া এইভাবে পাগল—সে তাহার সমস্ত কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিল, দিন-রাত সোনা বিবির কথা, কি করিয়া তাকে সুখী করিবে এই চিন্তা। এত সোহাগের ভাষা পল্লী-প্রেমিক কোথায় পাইল, মনের কথা প্রকাশ করিবার এত সন্ধান তাকে কে দিল?—

হাঁইট্যা যায়রে সোনা বিবি কলসী কাঁখে লৈয়া।
চাইয়া থাকে মামুদ মিঞা হাতের কাজ থুইয়া॥
যখন নাকি সোনা বিবি বাঁধে মাথার চুল।
হাসিয়া হাসিয়া মামুদ তুল্যা আনে ফুল॥

যখন নাকি সোনা বিবি রাঁধিবারে যায়।
মামুদ ভাবে মলিন অঙ্গ হইবে ধুঁয়ায়॥
মামুদের সঙ্গে সোনা হাসি কয় কথা।
কি দিয়া সাজাবে ভাবে আগার স্বর্ণলতা॥
হাটে যায় বাজারে যায় মামুদ কেনা বেচা করে।
লাভের কড়ি দিয়া রোজ সাজায় সোনারে॥
কানের কর্ণফুল আনে দাঁতের লাগি মিশি।
শতেক চাঁপা ফুট্যা উঠে সোনা মুখের হাসি॥
আইলা কেশ তুইলা কন্যা ঝাইরা বাঁধে চুল।
মুখখানি যেন কন্যার ভোরের পদ্ম ফুল॥
আস্তে ব্যস্তে চলি সোনা গাঙ্গের ঘাটে যায়।
গত নিশির কথা মনে বড় লজ্জা পায়॥
বিয়ান বেলা উঠে মামুদ কাজে দিল মন।
কতক্ষণে হৈব ফিরা নিশির মিলন॥
রূপে মত্ত হৈয়া মামুদ কোন কাম করিল।
দুনিয়ার যত কাম সব ছাড়ি দিল॥
সোনা ধেয়ান, সোনা গেয়ান, সোনা চিন্তামণি
এক নজর না দেখিলে পাগল পরাণী॥
কেমন কর্‌য়া হাটে কন্যা কেমন কর্‌য়া চলে।
মুচকি হাসিয়া কন্যা কেমন কথা বলে॥
মেন্দী পাতা আন্যা মামুদ নিজ হাতে বাটে।
পায়েতে লাগাইয়া দেখে কেমন কর্‌য়া হাটে॥
লাল টুকটুক্ চরণ দুটি মাটিতে পড়িল।
এরে দেখ্যা মামুদের মন বিরস হইল॥

আনিল বিজলী খড়ম সোনার লাগিয়া।
বাজার হইতে আনে সুরমা কিনিয়া॥
ধরিয়া চিকণকাঠি মামুদ আপনার হাতে।
কাজল রাঙ্গিয়া সোনার দুই নয়নের পাতে॥
আড়-নয়নে হাসে কন্যা আড়-নয়নে চায়।
এরে দেখ্যা মামুদ মিঞা পাগল হইয়া যায়॥"

মামুদের খাঁটি দোস্ত মোমিন তাহার এই স্ত্রৈণতা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল, সে বুঝিল—মামুদ একেবারে জাহান্নমের পথে চলিয়াছে। সে মামুদের সঙ্গে দেখা করিল।

"আসিয়া মোমিন কয় দোস্ত এবান কর কি ?
তোমারে পাগল কৈরাছে ছোলেমানের ঝি।"

সে তাহাকে জোর করিয়া বাণিজ্যে লইয়া যাইবার সব ব্যবস্থা করিল, কিন্তু মামুদ মাথার ব্যথা ও জ্বরের ভান করিয়া শুইয়া রহিল। এক মাস-কাল সে বাড়ীতে থাকিল, মোমিন চটিয়া তাহাকে বলিল—"বসিয়া খাইলে রাজার ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়। তোমার রেস্ত ভাই এখুনি ফুরাইয়া যাইবে।"

"এমন করিয়া কেন হইলে দুনিয়ার লক্ষ্মীছাড়া!
তোমার স্ত্রী—
চিনিমণ্ডা নয়রে দোস্ত, পিঁপড়ায় খাইবে লইয়া।
করপুর নহেরে দোস্ত, যাইবে উড়িয়া॥
ননীর পুতলা নয়রে সোনা—রৈদের আঁচে গলে।
কাঁচা রঙ্গের পুতলী যে জলে যাইবে গলে॥
দৌলত নহেরে তোমার বিবি—লোকে করিব চুরি।
ঘরে ঘরে এইমত কত আছে নারী॥

পান পানি নয়রে তোমার সোনা লোকে লৈয়া যায়।
নিশির নিয়ার নহে আঁচেতে শুকায়॥
বনের পক্ষী নয়রে সোনা উড়িবে পাখায়।
ঘরের প্রদীপ নয়রে সোনা ফুঁ দিয়া নিবায়॥
ঘাটের পানসী নয়রে সোনা পরে বাইয়া নিবে।
গাছের ফল নয়রে সোনা কাক কোয়েলে খাবে॥"

এই সকল কবিরা গ্রাম্য-জীবনের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। একটা কিছু বলিতে হইলে তাহাদের মুখে কত উপমাই না জোটে।

বিদেশে যাইবার ভয়ে ও দোস্ত মোমিনের ভয়ে মামুদ হালবলদ কিনিয়া চাষে মন দিল, বাড়ীর কাছে ক্ষেত করিয়া বাড়ীতে থাকিবার উপায় বাহির করিল—

"শাউনের দেওয়া ডাকে ঘন বহে ধারা।
কত কষ্টদেয় দেখ শাউনের বাদরা॥
আসমানেতে শাউনের দেবা ডাকে গুমগুম
সোনারে লইয়া মমুদ পইরা দিল ঘুম॥
ভাদর মাসেতে দেখ সাপলা ফুল ফোটে।
তবুও অভাগা যাত্তুর নিন্দ নাহি টুটে॥"

এইরূপে আলস্যে ফসল নষ্ট হইল, দৈবদোষে বলদ যোড়া মারা গেল—অবশিষ্ট বলদ দুটি পাড়িত হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে বসন্ত রোগে তার মা মারা গেলেন—

"গোষ্ঠে যাইতে দুগ্ধের গাভী পন্থে গেল মারা।
দিন রাত মামুদ মিঞা কাইন্দা হৈল সারা॥
নিশি রাইতে আগুনেতে বাড়ীখানা জ্বলে।
কড়ার ভিখারী মামুদ হইল এই কালে॥

বাপের কালের খাটপালং পুইড়া ভস্ম হয়।
ভুিতে অঞ্চল পাইতা সোনা কেমনে রয়॥
আজ গেছে উপাসেতে কাইল শাক ভাত।
ভাইব্যা চিন্ত্যা মামুদ শিরে দিয়া হাত॥
উপাস-কাপাসে সোনার শুকায় চাঁদ মুখ।
এরে দেখ্যা মামুদের কাট্যা যায়রে বুক॥”

ক্রমে দুঃখ অসহ্য হইল—এদিকে তাহার দোস্ত মোমিন বাণিজ্যে যাইয়া বহু ধনরত্নসহ ছয় মাস পরে ফিরিয়া আসিল। বন্ধুর কষ্ট দেখিয়া তাহার প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল। তাহার সাহায্যে অগত্যা মামুদ বাণিজ্যে যাত্রা করিল—“মোমিনের নাও খানি লইল চাহিয়া”—লাউ, কুমড়া ও কচু পসরা লইয়া ক্ষুদ্র নৌকাখানি উত্তরে কংস নদী বাহিয়া চলিল। তাহার এক সম্পন্ন মামা ছিল অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া মামুদ তাহারই আশ্রয়ে সোনাকে রাখিয়া গেল।

“কংস বাহিয়া সাধু যায় উত্তর ময়ালে।
খোলার ডিঙ্গা তাহার যেন কংস নদীর জলে।”

একদিন ঝড়ে ডিঙ্গার কাছি ছিঁড়িয়া গেল, নৌকাখানি হালের শাসন মানিল না—অবশেষে ডুবিয়া গেল। জলে ভাসিতে ভাসিতে আধমরা অবস্থায় এক ঘোর জঙ্গলে মামুদ আসিয়া পড়িল। সেই বনে এক বিষধর সর্প তাহাকে দংশন করিল।

দৈবানুগ্রহে এক জঙ্গলিয়া ওঝার কৃপায় সে বাঁচিয়া উঠিল। সর্ব্বদা তাহার সোনাকে মনে পড়িতে লাগিল—

“পাখা যদি থাকতরে বিধি যাইতাম উড়ি।
পরের ঘরে কেমন আছে আমার সোনা বিবি॥
আমার সোনার মর্জ্জি-মেজাজ পরে কি জোগায়।
কালো মুখে কটুবাক্য তাহারে শুনায়॥

নিদ্রা যদি পায় সোনার কে দেয় বিছানী।
তিয়াস লাগিলে তাহার কেবা জোগায় পানি ॥
ক্ষিদা লাগিলে আমার সোনার মুখে নাহি রা।
মুখ দেখ্যা কে বুঝিবে তাহার অন্তরা ॥
সন্ধ্যা বেলা শূন্য কলসী কাঁখেতে করিয়া।
বিরহে বিভোলা সোনা যায় কি চলিয়া ॥
শুকনা মুখে পন্থ চাইয়া বাড়ী ফিরা যায়।
পরের ঘরে সোনা পরের গালি খায় ॥
নদীর কূলে কেয়া গাছ ফুলের সুবাসে।
অভাগিনী বিরহিনীর নিদ্ কিসে আসে ॥
ফাগুনে আগুন জ্বালরে শুকায় নদীর কুল।
বিরহিনী নারীর অঙ্গে ফুটে যৌবন-ফুল ॥
এহি তনা ভাদ্রমাস বড় লাগে মিঠা।
একদিন না খাইতে চাইল সোনা সুরসা তালের পিঠা ॥
দলিদ্দর হইলাম আমি নছিব বড় বুরা।
আমার পয়সা ঘরে নাইরে পাইলাম মনে পীড়া ॥"

এদিকে সোনা মামুদের মামা-বাড়ীতে যাইয়া তাহার এক মামাত ভাইয়ের প্রেমে মজিয়া তাহাকে নেকাহ্ করিয়া বসিল। চার বৎসর হইয়া গেল, মামুদ ফিরিল না। সোনা সন্তান-সন্ততিসহ সুখে গৃহস্থালী করিতে লাগিল।

বহুদিন পরে 'সোনা সোনা' করিয়া হতভাগ্য প্রেমের পাগল মামুদ বাড়ী ফিরিয়া দেখিল—তাহার মামাত ভাই তাহার ভিটামাটী দখল করিয়া বসিয়াছে, তাহার ঘর-বাড়ীর কোন চিহ্নমাত্র নাই।

"পরে নিল বাড়ী ঘর, বাপের বসতি
বাপের ভিটায় নাই সে জ্বলে সাঁঝে কড়ার বাতি ॥"

উন্মত্তের মত সে মোমিন দোস্তের বাড়ী যাইয়া বলিল—"বল, আমার সোনা কোথায়? সে আমার বিরহে নিশ্চয়ই মরিয়াছে, তাহার কবর দেখাইয়া দাও।"

"সেই কবরের মাটী আমি মাখ্যা নিজ গায়।
দেওয়ানা হইয়া যাইবাম্ যেখানে নয়ন যায়॥"

বন্ধুর মুখে মামুদ নিষ্ঠুর সত্য শুনিল। এই উপলক্ষে স্ত্রী-জাতের প্রতি কবি তাঁহার মনের ক্রোধ ব্যক্ত করিয়াছেন—

"কেশেতে বান্ধিয়া রাখ, কর গলার মালা।
নারীরে পত্যয় নাই, চোখে দিব ধুলা॥
হিয়ার মাঝে শুইয়া রাখ পরাণ-কোটরায়।
সময় পাইলে নারী ছাড়িয়া পলায়॥
সকল থেকে অবিশ্বাসী নারীর নয়ানে।
ঘোমটা আড়ালে থাকে পুরুষ-সন্ধানে॥
অজ্ঞান পুরুষ জাতি নারী পুষতে চায়।
সাপ-ধরা বাদিয়া যেমন কাল সাপ লইয়া খেলায়॥
কাল সর্প হইয়া নারী দংশিবে মাথায়।
অঞ্চল আড়াল দিয়া পুরুষে ভুলায়॥"

কিন্তু মামুদের প্রেম বিদেহী, ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের প্রেম, তাহা সহজিয়াদের প্রেম, যে প্রেমের কথা চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"প্রণয় করিয়া ভাঙ্গায় যে, সাধন-অঙ্গ পায় না সে।" সাংসারিক হিসাবে অবিশ্বাসিনীকে ছাড়িয়া অন্যজনকে লইয়া সংসার করা চলে, লোকে তাহাতে সুখীও হইতে পারে, কিন্তু তাহার ভাগ্যে প্রেম-সাধনায় সিদ্ধি হইবে না। মামুদ ছিল সেই প্রেম-রাজ্যের তপস্বী, চন্দ্র যেমন তাহার জ্যোছনা কাঁটাবনেও বিতরণ

করে, দেহ-সুখ অপ্রত্যাশী সাধকও তাঁহার প্রেমের পাত্র হইতে তাঁহার মন ফিরাইয়া আনিতে পারেন না, তাহাতে যত কষ্টই না হউক।

"মোমিনের ঘরে মামুদ গোপনে থাকিয়া।
সোনা মুখের হাসি মামুদ আইল দেখিয়া॥
শোন শোন মোমিন দোস্ত, তোমারে জানাই।
সুখে থাকুক সোনা আমার কিছু নাহি চাই॥
ছাওয়াল সব লইয়া সোনা থাকুক মনের সুখে।
সুখের ঘরের কোণায় যেন দুঃখ নাহি ঢুকে॥
যে-ভাবে আছয় সোনা, থাকুক সেই বেশে।
এদেশ ছাড়িয়া আমি যাব অন্য দেশে॥
এদেশে আইসাছি দোস্ত, কেউ জানি না শুনে।
কি জানি, শুনিলে সোনা ব্যথা পাবে প্রাণে॥
বাতাস থাক নদীর কূলে কইয়া যাই মানা।
কাক-কোকিল গাছ-বিরিক্ষি যত বন্ধু জনা॥
আসমানের চাঁদ-সুরুজ কহি সবার থানে।
আমি যে আইসাছি, কথা রাখিও গোপনে॥
শুন শুন গোষ্ঠের ধেনু, তোরে কইয়া যাই।
আমার কথা না কহিও সোনা বিবির ঠাঁই॥
শুনরে বহতা নদী উজান বইয়া যাও।
না কইও না কইও কথা আমার মাথা খাও॥
দুঃখ পাইয়া সোনা যদি তোমার কূলে আইসে।
জুড়াইও তাপিত প্রাণ শীতল বাতাসে॥
কোন দিন পুছে যদি আমার বারতা।
সান্ত্বনা করিও তা'রে কইয়া এই কথা॥

'বনের সর্প খাইছে তারে বনেতে পাইয়া ॥'
কাঁদিলে সোনার দিও তুই আঁখি মুছায়া ॥"

এই বলিয়া মামুদ যোড়হস্তে আল্লার নিকট সোনা বিবির কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া গদগদ কণ্ঠে আশীর্বাদ করিল। তারপর—

"ছেঁড়া কাঁথা বাইন্ধা মামুদ দোস্তের বিদায় লয়।
দেশ ছাড়িয়া জন্মের মত বৈদেশী যে হয় ॥
মামুদের দুঃখে কান্দে বনের পাখ-পাখালী।
আবের পাংখার তলে সোনা করে ঠাকুরালী ॥
পন্থের পথিক যত মামুদে নেহালে।
কাঞ্চা বয়সের ফকির ভাসে অশ্রুজলে ॥"

তবুও কোন সময়ে চিত্ত ব্যথিত হয়, মামুদ অধীর হইয়া পড়ে—

"তুই না আছিলি সোনা, আমার পরাণের পরাণ।
বুকেতে পাতিয়া দিছি রাত্তির বিছান ॥
ঘামেতে ভিজিলে অঙ্গ শীতল পানি দিয়া।
আবের পাংখায় দিছি বাতাস ঘুমের লাগিয়া ॥
এতেক সাধের সোনারে আমার, কি করিলা তুমি।
তোর নাই যে দোষ সোনা, সব্ব দোষী আমি ॥"

যখন বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রনা হয়, তখন এই প্রেমের-ফকির ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া বলে—

"আল্লা, আমায় দেখাও পথ।
যে পথেতে গেলে হবে আমার সঙ্গত ॥"

এরূপ আর একখানি ছবি জগতের সাহিত্যে নাই। হিন্দুদের রচিত পল্লী-গীতিকায় শত শত নারী-চরিত্র আছে, যাহারা প্রেমের জন্য সর্ব্ব

ত্যাগিনী, ধরিত্রীর ন্যায় সর্ব্বংসহা, যে-সকল মুসলমান-লিখিত গাথার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে সেইরূপ নারী বিরল নহে। কিন্তু মনির ওঝা ও মামুদের মত চরিত্র হিন্দু-গাথায় নাই, ভ্রষ্টা নারীর জন্য এই প্রেম জগতের সাহিত্যে দুর্লভ। আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—বাঙ্গালার গাথা-রচকেরা সর্ব্বদাই ভূমাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, প্রেম-বর্ণনায় তাঁহারা খাঁটি প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের অনুশাসন, সামাজিক সংস্কার ও লোকাচার ছাপাইয়া উঠিয়াছে—সেই প্রেমের বিজয়-দুন্দুভি। দুঃখের বিষয় মিঞাজান রচিত এই পালাটির কিয়দংশ মাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপর গানের বৃহত্তর অংশটিই আমি আর প্রকাশ করিতে সুবিধা পাই নাই, তখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমার আসন টলিয়া গিয়াছিল।

আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—আমার নিকট অপ্রকাশিত অনেক গীতিকা আছে, তন্মধ্যে কয়েকটির মাত্র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি, কিন্তু সমধিক পরিমাণে অধিকাংশেরই কোন পরিচয় দিতে পারিলাম না।

১০। **'মাছুম খাঁ পল্টনের পালা'** নামক একটি গীতিকা ময়মনসিংহ কেন্দুয়া হইতে নগেন্দ্রচন্দ্র দে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে একটি মুসলমান গৃহস্থ পরিবারের কথা আছে মাছুম খাঁ ও কাছুম খাঁ দুটি ভাই মাতা-পিতাহীন হইয়া তাহাদের মামা সায়েস্তা খাঁর বাড়ীতে আশ্রয় পাইল।

সায়েস্তা খাঁ বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ, তাঁহার চৌদ্দ খানি হাল, বহু গোলা ধানে ভর্ত্তি—বাড়ীতে রকম-বেরকমের অনেকগুলি ঘর এবং "এক খায় আর আনে নাই কূল কিনারা।" তাঁহার এক কন্যা সোনাজান বিবি পরমা সুন্দরী। মাছুম ও কাছুমের বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া মামুল খুব খুসীই হইলেন, দুটি ভাত দিয়া তাহাদের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির কার্য্যে লাগাইয়া দিলেন।

তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া সায়েস্তা খাঁ খুব ভরসা দিলেন—"আমার বাড়ীতে এসেছ বেশ করেছ, আমার ভাগনে হইয়া তোমরা পরের বাড়ীর মজুর হইবে, তাহা হয় না। আমার ক্ষেত ও অপরাপর যাহা কিছু ইহা একরকম তোমাদেরই— তোমরা আমার সম্পত্তি নিজের মনে করিয়া খাটিতে থাক। আর আমার মেয়ে সোনাজান—সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী, উহাকেই বা পরের হাতে দিতে যাব কেন, আমি মাছুমের সঙ্গেই তাহার বিবাহ দিব। আমার যা কিছু আছে তাহার মালিক তো তোমরাই হইবে।"

তাহারা দেহের রক্ত জল করিয়া মামার বাড়ী খাটিতে লাগিল। "দেহের লউ পানি কৈরা খাটে মামুর বাড়ী।" কেবল দুটি ভাত পায়। কোন মাস-হরা গ্রহণ করে না। মাতুল যে সকল আশা-ভরসা দিয়াছেন, তাহার উপর অকপটে বিশ্বাস করিয়া—"জিনের মতন দুই ভাই খাটে মামুর বাড়ী।" যার সঙ্গে মামার কোন ঝগড়া লাগে, তবে অন্যায় করিয়া কাহারও ত্রাণ পাইবার উপায় থাকে না। "যার লগে ঝগড়া লাগে সেন যমে ধরে টানে"—

"গিরস্থালী করিয়া তাদের দিন যায়।
চুরিদারি মিছাবাদের ধারে নাহি যায়॥
বিপদে পড়িলে কেউ দোস্তের দোসর
আপন-পর জ্ঞান নাই, পড়ে তার উপর॥
বাজরামি নষ্টামি কেউ করিলে তাদের সনে।
উচিত মত শিক্ষা দেয় দেখে ত্রিভুবনে॥
খোঁড়া লেংড়া দেখ্‌লে তারা বড় দুঃখ পায়।
বেশী করে ধান-চাল তাদেরে বিলায়॥"

"দুঃখিত দেখিলে পরাণে বরদাস্ত না হয়।"—কিন্তু মামার চোখে এই সকল উদারতা ভাল বোধ হয় নাই—

"এরে দেইখা মামু তাদের বহুৎ গালি পাড়ে।
পরের ধন বিলাইতে দুঃখ নাই অন্তরে॥"

শেষে পষ্টাপষ্টি ভাবেই মামু তাদেরে ভৎর্সনা করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন—

একদিন কহে মামু এই সে কারণে।
দলিদ্দের গোষ্ঠী, বাড়ী ছাড়ি যা এক্ষণে॥
একথা শুনিয়া তারা দিলে দুঃখ পাইয়া।
বেজার হইয়া যায় মামার বাড়ী ছাড়িয়া॥"

তাহারা একখানি ছোট ডেরা বাঁধিয়া পরের ক্ষেতে ভাগিদার হইয়া খাটিতে লাগিল। মালিকের ক্ষেতের ধানের একটি অংশ পাইয়া, তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিল। শ্রমশীলের বাহু লক্ষ্মী আশ্রয় করেন, এই অল্প আয় হইতেও তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইল, আবার কাণা-খোঁড়া, অন্ধ-আতুরেরা তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরখানি ছাকিয়া ধরিল। এদিকে মাতুল সায়েস্তা খাঁ তাহাদের সহায়তা হারাইয়া দুরবস্থায় পড়িলেন। যাহারা বিনাকড়িতে নফরগিরি করিয়া তাহার আয় ফলাও করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের অভাবে ক্রমে বৎসর বৎসর ক্ষতির পরিমান বাড়িতে লাগিল, বাহিরের লোক দিয়া সেরূপ খাটুনি ও স্বার্থরক্ষা অসম্ভব। "বিনিকড়িতে হেন নফর কোথা পাবি।"

মাতুল অনন্যোপায় হইয়া আবার ভাগিনেয়দের দুয়ারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"আমার ভাগিনা কেন বস্তুরে পরের ঘর
সকল লোকে জানে, তোদের মামা তালেবর।"

তিনি আরও বলিলেন—"এক কন্যা সোনাজান দিব মাছুর কাছে।" এবং তাহা হইলে ভাগিনেয়রাই যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, তাহা পুনরায় খুব দৃঢ়তার সহিত প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পিতার এই কথা সোনাজান শুনিল, মাছুমের প্রতি ইতিপূর্ব্বেই তাহার অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, পিতার প্রতিশ্রুতি শুনিয়া তাহার মনের ভালবাসা সুদৃঢ় হইল, মাছুমও যারপর নাই প্রীত হইল।

এই ঘটনার পর তিন বৎসর যায়, তাহারা প্রাণপণে খাটিয়া মাতুলের সমস্ত দায় উদ্ধার করিয়া দিয়াছে, আবার তাঁহার অবস্থা সচ্ছল হইয়াছে। কিন্তু আশার ফেরে ভ্রাতৃদ্বয় এতটা খাটিয়াও—"মামুর মনে তারা এক কড়ার মূল না পায়" একদিন সাহস করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় মামার নিকট আয়ের একটা ভাগ চাহিল—

"ভাগের কথা শুনিয়া মামু রুষিয়া কয় বুলে।
দাতা হইয়া তোরা মোর সকলি খোয়ালে॥
মামুর বাড়ী ভাগ না থাকে কিসের ভাগ চাও।
খাওন দেই এর বেশী আর কিছু না পাও॥
আমি আশ্রয় দিয়াছিলাম এজন্য আছহ বাঁচিয়া।
এতদিন যাতি তোরা নালায় ভাসিয়া॥
আমার ভাত খাইয়া হোয়েছ মোটা তাজা।
বড় হইয়া এখন আইছ, আয়ের ভাগ নিবা॥"

কাছুম—সোনাজানের সঙ্গে তাহার জ্যেষ্ঠ মাছুমের বিবাহের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিল। ক্রোধের সহিত মাতুল বলিলেন—"দিন মজুরের সঙ্গে সোনাজান বিবির বিবাহ দিব, এও কখন হয়?" শুধু ইহা বলা নয়, অন্য একস্থানে সোনাজানের বিবাহের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। মাছুম বলিল—"আর না থাকিব এই দুর্জ্জনের পুরী।" সে মুর্শিদাবাদ

আসিয়া নবাব মুকসুদ আলি খাঁর দরবারে উপস্থিত হইয়া গোলামগিরির জন্ম প্রার্থী হইল। নবাব তাহার সুশ্রী ও সুগঠিত দেহ দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং তাহাকে পল্টনগিরির কার্য্যে বহাল করিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে অসমসাহসিকতা ও সামরিক কৌশল প্রভৃতি গুণ দেখাইয়া সে মনসবদার হইল। "হাজার পল্টনের মিঞা হৈল হুকুমদারী।" তাহার ভাই কাছুম খাঁও এক মৌলবীর শিষ্য হইল, তৎপর মস্তবড় পণ্ডিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। সোনাজান এবং মাছুম খাঁর প্রেমে কখনই ভাটা পড়ে নাই, এই পল্লী যুবক-যুবতীর সরল মনে শৈশবের অনুরাগ ক্রমেই বদ্ধমূল হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহা মুছিয়া যায় নাই। গাথা-সাহিত্য-সুলভ আদর্শ প্রেম, নিঃস্বার্থ প্রাণ-দেওয়া সৌভাগ্য প্রভৃতি মহৎ গুণে গীতিকার পরিসমাপ্তিটি উজ্জ্বল হইয়াছে। গীতিকাটি শেষ অঙ্কে বিয়োগান্ত করুণ রসে ভরপুর। কিন্তু আমি সেই সকল কথার এখানে উল্লেখ করিব না। গাথা-সাহিত্যের প্রতি অঙ্কে অঙ্কে এইরূপ চিত্র আরও অনেক আছে। এই গীতিকাটির ভাষা একান্ত গ্রাম্য, কবিতার গতিপথ যেন বন্ধুর, চরণে চরণে মিল পড়ে না, প্রায়ই তালভঙ্গ হয়। অপ্রকাশিত গাথাগুলির মধ্যে এই গীতি হইতে অধিক কবিত্বপূর্ণ এবং নায়িকার ত্যাগ ও সহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল অনেক গীতিকা আছে, সেগুলি ফেলিয়া আমি এই কাব্যটি লইয়া এত আলোচনা করিতেছি কেন? তাহার কারণ— চাষাদের মধ্যে যে সতেজ ও বলিষ্ঠ স্বায়পর চরিত্র এদেশে এখনও দেখা যায়, তাহার কোন চিত্রই বঙ্গ-সাহিত্যে নাই। সামাজিক সৌভ্রাত্র, পরের বিপদকে অনাহুত ভাবে নিজের মাথায় করিয়া লওয়া, ঝগড়া লাগিলে স্থায়েরদিকে প্রাণদিয়া ঝুঁকিয়া পড়া প্রভৃতি সামাজিক গুণ হিন্দু সাহিত্যে একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আদর্শ প্রেম, আদর্শ রাজ-ভক্তি, আদর্শ বিশ্বাস, আদর্শ আত্মত্যাগ ও আদর্শ সহিষ্ণুতার ছবি এই চিত্রশালায় অনেক পাওয়া

যাইবে। কিন্তু দরিদ্র গৃহস্থের এরূপ নির্ভীক চিত্র, এরূপ পরের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করা, এরূপ দরিদ্রদের প্রতি দয়া এবং এরূপ সুদৃঢ় ভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ—এসমস্ত গুণ মুসলমান সমাজে এখনও বিদ্যমান। হিন্দুদের অদৃষ্টবাদ, ভক্তি জড়তা ও কর্ম্মক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে উদাসীনতা কতকটা বৈশিষ্ট্যে দাঁড়াইয়াছে। যদি কেহ তাহাদের প্রতি অবিচার করে, তাহারা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া ক্ষমাশীল হইয়া থাকে, তাহারা সাপকেও 'বাস্তু' বলিয়া তাহার সঙ্গে এক ভিটায় বাস করিতে চায়, তাহারা ঝগড়া চায় না, মিটমাট চায়। আধ্যাত্মিকতা হিসাবে ইহার কতকগুলি গুণ উচ্চ-স্তরের, কিন্তু অনেক সময়ই সেগুলি জড়তা বা ভয়ের ছদ্মবেশ। মুসলমান সমাজে এখনও সতেজ ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অভাব হয় নাই, উপস্থিত ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন এড়াইয়া তাহারা মৃত্যুর বিভীষিকায় অভিভূত হইয়া পড়ে না। যে-কথাগুলি একবার উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাই পুনরায় উদ্ধৃত করিয়া তৎপ্রতি আপনাদের দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট করিতেছি—

"যার লগে ঝগড়া লাগে যেন যমে ধরে টানে,
গিরস্থালি করিয়া তাদের দিন যায়।
চুরিদারি মিছাবাদের ধারে নাহি যায়।
বিপদে পড়িলে কেউ দোস্তের দোসর॥
আপন-পর জ্ঞান নাই পড়ে তার উপর॥
বান্দরামি নষ্টামি কেউ করিলে তাদের সনে।
উচিত মত শিক্ষা দেয় দেখে ত্রিভুবনে।
ে াড়া ল্যাংড়া দেখলে তারা বড় দুঃখ পায়।
বেশী করে ধান-চাল তাদের বিলায়।"

সেরূপ ধান-চাল বিলাইবার লোক দয়ার্দ্র হিন্দু-সমাজে অনেকে আছেন, কিন্তু জগতে টিকিয়া থাকিবার জন্য যে তেজ দরকার, সেই 'দুষ্টের

দমন আর শিষ্টের পালন' নীতির সমর্থক লোক আমাদের সমাজে বিরল হইয়া পড়িয়াছে। পৈত্রিক প্রাণটি লইয়া আমরা ঘরের কোণে যতই সরিয়া যাইতেছি, ততই 'কমলি নাহি ছোড়তা'—কমলি ঘেষিয়া ঘেষিয়া সেই প্রাণটি লইবার জন্ত ধাওয়া করিতেছে।

অগণিত এই গীতিকা শুধু প্রেম নহে – সমুদ্র-যাত্রার কত কথা, কত জলযুদ্ধ, কত দেশ-বিদেশে বাণিজ্যের কাহিনী, কত ত্যাগ-বীর, দান-বীর ও যুদ্ধ-বীরের প্রসঙ্গ এই সকল পল্লী-গাথায় খাঁটি বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ কবিত্বের ছন্দে লিখিত হইয়াছে যে, তাহা পড়িয়া মনে হয়, শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে একটা ক্ষুদ্র-গণ্ডীর মধ্যে সংস্কৃতাত্মক ও বিদেশী ভাবাপন্ন বাঙ্গলা লইয়া গর্ব্ব করেন, তাহা কি কবিত্বে, কি চরিত্রাঙ্কনে, কি ঘটনার বাহুল্যে ও বিচিত্রতায় এই বিরাট্ পল্লী-সাহিত্যের নিকট নগণ্য। আমরা পুরাণ ও কাব্য খুঁজিয়া কয়টিই-বা মহীয়সী রমণী-চরিত্র পাইয়াছি? গৌরী, সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, কাদম্বরী প্রভৃতি সে কয়েকটি নারী-চরিত্রকে নখাগ্রে গণনা করা যায়। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের এসম্বন্ধে সমৃদ্ধি অসাধারণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিকার মধ্যে এক একটি অমর-চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের ত্যাগ, তাহাদের প্রেম, তাহাদের তপস্যা পৌরাণিক নারী-চরিত্র-অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে; তাহাদের রূপ-গুণ একবার উপলব্ধি করিলে, তাহা চিরতরে মনে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। মুসলমান কবিরাও কেহ কেহ বেহুলার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, এখনও তাহা প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালার বেহুলা, বাঙ্গালার মদিনা, বাঙ্গালার নুরন্নেহা, আয়না, ভেলুয়া, সখিনা, ছুরৎ—বাঙ্গালার মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালা, কাজল-রেখা প্রভৃতি বহু সংখ্যক আদর্শ রমণী বঙ্গ-সাহিত্যের কৌস্তুভ কোহিনূর। ইহাদের একটিকেও বাদ দেওয়া যায় না, ইহাদের প্রত্যেকটি হীরকের মূল্য বহন করে। এই রমণীরা প্রত্যেকেই বাঙ্গালী, বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য লইয়া

ইহারা ফুটিয়াছে—বাঙ্গালার বিল ও পুষ্করিণীতে পদ্মরাণীর মত। ইহাদের তুলনা ভারতীয় অন্য কোন প্রদেশের সাহিত্যে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এইরূপ আদর্শ-প্রেমের জীবন্ত-ছবি একখানাও দেখি নাই। হয়ত আমি প্রাচীন-পন্থী হইয়া পিছনে পড়িয়া আছি, অতি-আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের রস-বোদ্ধা গল্প-লেখকগণ আমার উপর চোখ রাঙ্গাইবেন, আমি নাচার

কিন্তু তথাপি বলিতে একটুও কুণ্ঠিত হইব না যে, মামুদের চরিত্র-স্রষ্টা স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ—যাহা হীন-লালসাজাত নহে এবং যাহা কৃষক-কবি মিঞাজান ঋষির ন্যায় প্রেমের ব্রহ্মলোকে পৌছাইয়া দিয়াছেন—য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকও .সই রাজ্যের নাগাল পাইবেন না। রাজা আর্থার ভ্রষ্টা ও অনুতপ্তা রাজ্ঞীকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই দূর হইতে আশিস্ জানাইয়াছেন। এবম্বিধ অবস্থায় য়ুরোপীয়-সাহিত্যে অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রই অল্পবিস্তর নির্ম্মমতা দেখাইয়াছেন। কেহ কেহ আবার ওথেলোর মত পত্নীকে গলা টিপিয়া মারিয়া প্রতিশোধ লইয়াছেন। রোমান্ কবি ভার্জ্জিল তাঁহার নায়িকা রাজ্ঞীকে দিয়া বলাইয়াছেন যে— তাঁহার প্রতারক-প্রণয়ীর যদি তিনি দেখা পান, তবে তাহাকে নিজ হাতে হত্যা করিলে তিনি সুখী হইবেন. কিন্তু সে মৃত-নায়কের পদতলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। শেষ সুরটার একটু আমেজ দিয়া তিনি ভালবাসার রীতি রক্ষা করিয়াছেন। মেটার লিঙ্কের প্রেমিক নায়ক স্বীয় স্ত্রী মিসেলেণ্ডার সঙ্গে কনিষ্ঠ-ভ্রাতার গুপ্ত-প্রেম আবিষ্কার করিয়া ক্ষমাশীলতার ভাণ করতঃ তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছেন। এনাকারেনিনার স্বামী সাধারণ স্বামীদের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, কিন্তু প্রেমের আনন্দ-লোকে টলষ্টয়ও পৌছিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা দেশের কবিরা জানেন, প্রেম জ্যোস্নার মত—তাহা নির্ব্বিচারে যেখানে সেখানে পড়ে. কলঙ্ক দেখিয়া তাহা নিজের সত্তা নিজের আত্মবিস্মৃত

স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতা হারায় না, ভাগীরথীর মত সে যে-দিকে ছুটিয়াছে, সংসারের সামাজিক পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা-বিঘ্ন তাহার গতি ফিরাইতে পারে না। প্রেম গুণাগুণ জানে না, দোষ দেখিয়া ছাড়ে না, ছাড়িতে পারে না—তাহা তাহার প্রাণের অঙ্গীয় হইয়া যায়।

১১। দস্যুদের জীবনের শেষ-পরিণতি ও অনুতাপ যে কি ভীষণ, তাহা নিজাম ডাকাত ও কেনারাম দস্যুর ব্যবহারে দেখা গিয়াছে। কেনারাম তাহার লুণ্ঠিত সাত ঘড়া মোহরের এক ঘড়া গুরু কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইলে, তখন ঊর্দ্ধে চাহিয়া, সাশ্রুনেত্রে তাহা এক একটি করিয়া ফুলেশ্বরী নদীর জলে নিক্ষেপ করিল এবং নরহত্যা কলঙ্কিত নিজের হাত নিজে কামড়াইয়া রক্তাক্ত করিয়া ফেলিল, তখন সেই দৃশ্য ভুলিবার নহে। বাঙ্গালীর যুদ্ধ-জাহাজগুলি কিরূপ ছিল, তাহা ভেলুয়ার মুসলমান কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

> "এই সকল কথা সাধু কিছু না শুনিল।
> 'ডিঙ্গা সাজা, ডিঙ্গা সাজা' হুকুম করি দিল॥
> প্রথমে সাজায় ডিঙ্গা নামেতে বালাম
> যাত্রাকালে সেই ডিঙ্গায় লইত আল্লার নাম॥
> তারপরে সাজায় ডিঙ্গা নামে হাইল কাইল।
> সে ডিঙ্গায় নৈল সাধু খোরাকির চাইল ডাইল॥
> তারপরে সাজায় ডিঙ্গা নামে হুড়মুড়ি
> সে না ডিঙ্গায় লইল তুলি হলদী মরিচের গুড়ি॥
> তারপরে সাজায় ডিঙ্গা নামেতে সিন্ধুক।
> সে না ডিঙ্গায় আছে সাধুর কামান বন্দুক॥
> তারপরে সাজায় ডিঙ্গা নাম তার হোলা।
> সে না ডিঙ্গায় নৈল সাধু বারুদ আর গোলা॥

তারপরে সাজায় ডিঙ্গা তার নাম সরু।
সেই না ডিঙ্গার আড়ে আড়ে বাঘে মারে গরু॥
তারপর সাজায় ডিঙ্গা ডিঙ্গার নাম বেরু।
সেই না ডিঙ্গার আড়ে থাইকা কানাইয়া বাজায় বেনু॥
তারপরে সাজায় ডিঙ্গা হবল বেতের ছানি।
সেই না ডিঙ্গায় কাটে সাত বরষার পানি॥
তারপর সাজায় ডিঙ্গা নামেতে আস্তল।
ছয় মাসের পথ হৈতে দেখা যায় মাস্তল॥
তারপরে সাজায় ডিঙ্গা নাম মনুহর।
সেই না ডিঙ্গায় সোয়ার হৈল মাঝি গরুড়ধর॥
তারপরে সাজায় ডিঙ্গা নামে খৈয়া পেটি।
ধনে মালে না পুরিলে কাটিয়া ভরে মাটি॥
তারপরে সাজায় ডিঙ্গা নামে গুয়াধর।
সেই না ডিঙ্গায় সোয়ার হৈল জামাল সদাগর॥"

জাহাজগুলির নাম প্রাকৃত, তখনও বঙ্গদেশে সংস্কৃতের জাগরণ হয় নাই—এই জন্য দেশী নামের ছড়াছড়ি, অনেক কথা অতিরঞ্জিত, তথাপি এই সকল জাহাজ যে অতিকায় ছিল, তাহা বুঝা যায়। ছয় মাসের পথ হইতে মাস্তল দেখা যায় এবং জাহাজ এত বৃহৎ যে, সাতটা বর্ষার জল সহিয়াও তাহার গতির বিরাম নাই, এই সকল ইঙ্গিত-বাক্যে লোকের মনের পূর্ব্ব-সংস্কারের আভাষ পাওয়া যায়। বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও কবি কঙ্কনের অতিশয়োক্তি হইতে ইহা বাস্তবের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। কবি কঙ্কনের যুগে পশ্চিম-বঙ্গে সমুদ্র-যাত্রার কাহিনী উপগল্পে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু চট্টগ্রামের সারেঙ্গরা বহুদিন পর্য্যন্ত জাহাজ সমুদ্রের উপর বাহিয়াছে। এই সকল জাহাজের

অনেকগুলির নাম ও আকৃতির প্রতিলিপি 'পূর্ব্ব বঙ্গ-গীতিকা'র ২য় খণ্ডে ২য় সংখ্যায় (৯৭ পৃঃ) দেওয়া আছে।

প্রেমের প্রসঙ্গে চাষী-কবিদের লক্ষ্য এত সূক্ষ্ম যে, তাহা আমাদিগকে বিস্মিত করে। সে-সকল বর্ণনা অদ্ভুতরূপে মৌলিক ও দেশের খাঁটি পরিচয়-জ্ঞাপক। এই সাহিত্যে ধারকরা কিছু নাই। চাষী-কবিদের সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে অঋণী, সংস্কৃত বা অন্য কোন সাহিত্যের অলঙ্কার শাস্ত্র বা আইন-কানুন ইহাদের গণ্ডীতে পৌঁছে নাই। এই জন্যই ইহা এত মৌলিক ও দেশজ-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত।

"হাটে যাইতে, ঘাটে যাইতে এপারে সেপারে।
বঁধু খাড়াইয়া চাইরে, সদাই আঁখি ঠারে॥
মাছ মারিতে আইসে বঁধু গোয়াল দীঘীর ঘাটে।
আইঠা (এঁটো) হাতে সুন্দরী কন্যা আড়ে চাইয়া থাকে॥
গাঙ্গের ঘাটে যায়রে কন্যা সিনান করিবারে।
ভরা কলসী উপুর কইরা কন্যা যায় জলে॥
যদি সাঁতার দেয়রে বন্ধু পানিতে নামিয়া।
বঁধু নাকি ডুব্যা মরে আকুল ভাবিয়া॥
বঁধুয়া যায় হাওয়া খাইতে, সুন্দরী জলেতে।
আসমানের চাঁদ যেন গইলা ভূএে পড়ে॥
এইপারে সেইপারে হয় আঁখির মিলন।
জ্যোনি পোকা আর চাঁদের রাত্রে দরশন॥
চোখে চোখে আলাপন উভয়ের হাসি।
আমার হাসি লইছে বন্ধু হৃদ-পিঞ্জরে গাঁথি॥
নয়নের পীরিতি বঁধু করেছে নয়নে।
একদিন তো না দেখা হইল বয়ানে বয়ানে॥

বঁধুয়ার ঠাণ্ডা মুখ না জুড়াইল পরাণে।
সেই দুখের আগুনে হিয়া জ্বলে রাত্রে দিনে ॥
তুমি বঁধু মাছ মারিতা, চুপড়ী ধরতাম আমি।
জলেরে যাইতাম যখন সঙ্গে যাইতা তুমি ॥
গাঙ্গের কূলেতে শাক বাইছা তুলতাম আমি।
রান্ধ্যা দিতাম পরিপাটী সুখী হইতা তুমি ॥
বঁধুর যত অঙ্গের ব্যাধি মোর অঙ্গে দেও আইন্যা।
বঁধুর ব্যাধি দূর করিয়া স্থির কর মোর হিয়া ॥
বঁধু মোর চিকণ কালা গলার তুলসী।
সেই বঁধু পরাণে মৈলে কেমনে আমি বাঁচি ॥ *

যেমন কোন বৃক্ষের মূল খুঁড়িলে তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় কোথা দিয়া কত দূর গিয়াছে, তাহা টের পাওয়া যায়। এই বিরাট্ পল্লী-সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সমস্ত দিকদিয়া তাহার স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিকাশের পরিচয় পাওয়া যাইবে। "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী, অবনী বহিয়া যায়"।—প্রভৃতি জ্ঞানদাসের পদে আমরা মুগ্ধ। কিন্তু এই পল্লী-সাহিত্যের সর্ব্বত্র—কি মুসলমান, কি হিন্দু উভয় শ্রেণীর গাথায় নানা ছন্দে এই ভাবটির দৃষ্টান্ত বহুবার পাইয়াছি। পল্লী-গীতি-কারদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই মহাজন-পদাবলীর পূর্ব্ববর্ত্তী কিন্তু বেশীর ভাগই পরবর্ত্তী। সুতরাং মনে হইতে পারে যে, পল্লী-কবিরা বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদের খনি হইতে উহা কুড়াইয়া পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা কখনই নহে। বৈষ্ণব সাহিত্য ভগবৎ-ভক্তির রূপক, কিন্তু বাঙ্গলা পল্লী-সাহিত্য বাস্তবতাময়। উহা ভক্তি বা ভগবৎ-প্রেমের ধার ধারে না। এই একটি ব্যাপার নহে, বৈষ্ণব-সাহিত্যের নানা অংশের সঙ্গে পল্লীকথার যে একটা সাদৃশ্য আছে,

* মুসলমান কবি লিখিত—"সুন্দরী কন্যার বয়ান।"

তাহা এত স্পষ্ট যে, তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই—আমি শত শত দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা প্রমাণ করিতে পারি। "জিহ্বার সহিত দাঁতের পীরিত সময় পাইলে কাটে।" ইত্যাদি ভাব পল্লী-গাথায় অনেকবার পাইয়াছি। এই মুসলমান-রচিত পল্লী-গীতিকায়ও পাওয়া গিয়াছে—"ছোটর লগে বড়র পীরিত যেন পদ্ম-পাতার পানি। কোন্ সমে পড়্যা যায় তার খবর নাহি জানি।" একজন বড় অপরে ছোট, এই অবস্থা-বৈষম্যে প্রেম প্রকৃত জন্মে না। 'কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।" এই দুইয়ের মধ্যে প্রেম হইতে পারে না।

মুসলমান কবির গীতিকার এই অংশ চণ্ডীদাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ সাদৃশ্যের কারণ কি? যাঁহারা উভয় শ্রেণীর রচনা ভাল করিয়া পড়িবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন—ইহাদের আকার-প্রকার স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও নিকট ঋণী নহে। আসল কথা এই যে, যুগ যুগ ধরিয়া সহজিয়ারা এদেশে স্নেহ ও আদরের শত কথার গড়ন দিয়াছেন। যে কোমল-কান্তভাব ও প্রকাশ-ভঙ্গী অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে বাঙ্গালী নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে, তাহা বাঙ্গালী জনসাধারণ ছড়ার মত দিন-রাত্রি মুখে মুখে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। সেই সকল আদিম ছড়ার খনি হইতে পল্লী-কবি ও বৈষ্ণব-কবি উভয়েই সেই সকল কথা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল কবিগণের ভাবের সঙ্গে একটা আধুনিক গানের ঐক্য আছে—

> "নাম না জানে ঠিকানা, সোহি দেশ মুখ জানা।
> যাহা টুট গৈয়ি সব ধান্ধা. রাম রহিম এক বান্দা।
> যাহা কাফেরে,মুসলমানা, যাহা ভানু শশী নহে আনা।"

পল্লী-কবিদের প্রকাশভঙ্গী সরল ও গ্রাম্য। কিন্তু গভীর অনুভূতির পরিচায়ক। বৈষ্ণব-কবিরা সাহিত্যিক-নৈপুণ্য ও কলা-সৌন্দর্য্য দিয়া সেই একই কথা সাজাইয়াছেন।

এই গীতিকাগুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের শ্রেণী-ভেদের উপর কোন জোর দেওয়া হয় নাই। মুসলমান কবিদের অনেকেই নিরঞ্জনের বন্দনা করিয়া পুস্তক আরম্ভ করিয়াছেন। পীরগণের বন্দনা ও মক্কা-মদিনা প্রভৃতি তীর্থের গৌরব-ঘোষণার ব্যাপদেশে এই কবিরা সময়ে সময়ে কাশী ও বৃন্দাবনের বন্দনা করিয়াছেন। কেহ কেহ সর্প-দেবতা পদ্মাকে এবং পাতালে সপ্তকোটি নাগ-নারায়ণকে শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। একজন মুসলমান কবি সীতা দেবীকে নমস্কার করিয়াছেন, আর একজন ঠাকুর জগন্নাথকে বন্দনা করিয়াছেন। একজন মুসলমান কবি চাষখোলা গ্রামের বুড়া মাকে প্রণাম করিয়াছেন। তাঁহারা হজরত মোহাম্মদ, মহাত্মা আলি প্রভৃতির বিস্তৃতভাবে বন্দনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের শ্রদ্ধেয় তীর্থ ও ঠাকুরদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে ত্রুটি করেন নাই। মুসলমান কবিদের এই বন্দনাসূচক মুখবন্ধে আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য, কেহ কেহ স্বীয় পল্লীকেও নমস্কার করিয়াছেন। দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি এই কৃষক-জনসাধারণের একটা বিশেষ স্বতঃসিদ্ধ মনোভাব। অনেক মুসলমান কবিই পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ হিমালয়কে বন্দনা করিয়াছেন। মোহাম্মদ ইউনুস কৃত চৌধুরীর লড়াই-এর একটি বন্দনা আছে। এই দীর্ঘ বন্দনা-পত্রের অনেকটা বাদ-সাদ দিয়া উদ্ধৃত করিতেছি—

"পশ্চিমে বন্দিয়া গাই মক্কা আস্ত স্থান।
উদ্দেশে সেলাম জানাইলাম হিন্দু-মুসলমান।
হাসেন হুসেন বন্দুম রছুলের নাতি।"

* * *

"মকার পূর্ব্বেত বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ।
আচার নাই বিচার নাই বাজারে বিকায় ভাত।
এমন সুধন্য জায়গা জাতি নাহি যায়।
চণ্ডালেতে রাঁধে ভাত ব্রাহ্মণেতে খায়।

পূর্ব্বেত বন্দনা করি তীর্থ বারাণসী।
ঘরে ঘরে হরির নাম দুয়ারে তুলসী।
তার দক্ষিণে বন্দি সোনার লঙ্কাপুরী।
ইন্দ্রজিতের মাতা বন্দুম রাণী মন্দোদরী।"

তারপরে কবি শরিয়তের পীরদিগকে বন্দনা করিয়া উপসংহারে "রাগ রাগিণী বন্দুম লক্ষ্মী সরস্বতী।" এবং চট্টগ্রামের চট্টেশ্বরী দেবতাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। 'নুরন্নেহা ও কবরের কথা' নামক গীতিকায় কবি লিখিয়াছেন—

"বিছমিল্লাহ্ আর শ্রীবিষ্ণু একই গেয়ান।
দোকাঁক করিয়া দিয়া প্রভু রাম রহমান।" *

মনে হয়, এই সকল অশিক্ষিত কবিগণের হৃদয় এত নির্ম্মল ছিল যে, সেই হৃদয়-দর্পণে সত্যের প্রতিবিম্ব যথাযথ ভাবে পড়িয়াছিল, যেখানে যা কিছু আছে তাহা তাহারই রূপ, যেখানে যে-কেহ শ্রদ্ধাভরে তাহাকে প্রণাম করে সেখানেই এই সরল কবিরা ভেদবুদ্ধিহীন হইয়া তাহাকে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। সেই শ্রদ্ধা আল্লাহ্ তা'লার পায়ে যাইয়া পৌঁছিয়াছে কিনা, তাহা আপনারাই বলুন। আপনারা কবিকে 'নির্ব্বোধ কুসংস্কারগ্রস্ত' বলিয়া যদি সুখী হন, তবে আমি প্রতিবাদ করিব না, তবে এই কথাটি বলিতে চাই—একটি দুইটি কবি নহেন, এই গাথা-রচক মুসলমান-কবিদের অধিকাংশই এই 'কুসংস্কার' দেখাইয়াছেন। কেহ কেহ চৈতন্যদেবকে এত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি, তিনি এই বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমান অভেদে প্রাণের রাজা ছিলেন। এই যে জগতের নানা বিচিত্রতার মধ্যে একের অনুভূতি ও নানারূপ বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা—তাহা বাঙ্গালী-প্রকৃতির স্বধর্ম্ম, একথা

* পূর্ব্ব বঙ্গ-গীতিকা' ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা ৫০১ পৃঃ।

একবার বলিয়াছি। কতকগুলি গীতিকায় দেখা যায়—হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া যাইবার নানারূপ আয়োজন করিতেছে। 'কালু-গাজি ও চম্পাবতী'র কাব্যে কবি গঙ্গাকে গাজীর মাসীমাতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারের আগ্রহ ছাড়েন নাই। মুসলমান সাধু এক হিন্দুকে গঙ্গা দেখাইবার লোভ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—
"করাইতে পারি যদি গঙ্গার দর্শন। হৈবা কিনা মুসলমান করহ স্বীকার॥"
একখানি কাব্যে এক মুসলমান রমণীকে জিন্দাপীর বৈষ্ণবী সাজিতে উপদেশ দিয়া গজনী সহরে যাইতে বলিতেছেন—

> "শীঘ্র কন্যা, যাও মাগো, বৈষ্ণবী সাজিয়া।
> সেতাবি চলিয়া যাও গজনীর সহর বুল্যা॥
> গজনীর সহরে গেল সুলেতারা নারী।
> হাতে লোটা তিলক-কৌটা বৈষ্ণবীর বেশ ধরি ॥"

'হরিদাসের পালা' জনৈক মুসলমান কবির লেখা। কবির নাম খলিলুর রহমান, ময়মনসিংহের সরিষাপুরে তাঁহার বাড়ী ছিল। এই কাব্যে দেখা যায়—"এক মুসলমান রাজপুত্র সর্ব্বদা হরিনাম করাতে তাহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য জহ্লাদকে হুকুম দিতেছেন এবং নানারূপ নির্ম্মম অত্যাচার করিতেছেন। ভগবানের কৃপায় প্রতিবারেই রাজকুমার বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতেছেন।" মুসলমান কবি যে রাজকুমারকে প্রহ্লাদ সাজাইয়া তাহার ভক্তির অসামান্যত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'মনাই যাত্রা' একখানি রূপক কাব্য, মুসলমানের লেখা। ইহাতে মন আধ্যাত্মিক-পথের যাত্রীস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে চারি ফেরেশতাকে শরীরের চারি পীর এবং চারি বেদকে তাহার ছেদ বলা হইয়াছে। এই গীতিকা কতকটা 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের ছাঁচে ঢালা। এই সকল গোঁজামিলের চেষ্টায়

কোন সাহিত্যিক-কলা-কৌশল প্রদর্শিত হয় নাই, বরং কাহিনীগুলি কতকটা উদ্ভট্ হইয়াছে। তথাপি এই সকল প্রচেষ্টায় দেখা যাইবে—দুই ভিন্ন ধর্ম্মমত পোষণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য বাহু সম্প্রসারণ করিতে ব্যগ্র। 'কালু-গাজি ও চম্পাবতী' কাব্যে এবং 'মল্লিকা' কাব্যের মুকুটরায়ের কাহিনীতে ও এই শ্রেণীর আরও কোন কোন কাব্যে হিন্দু-রাজার সমস্ত প্রজাসহ ইস্‌লাম অবলম্বন করিবার কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'মল্লিকা' কাব্যখানি সরসতা ও বর্ণনা-কৌশলে খুব জোরের কাব্য হইয়াছে। রাজকুমারী মল্লিকা হানিফের নিকট পরাজিতা হইয়া তাহার অঙ্কশায়িনী হইলেন এবং রাজা বরুণ তাঁহার সমস্ত প্রজাসহ ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এই সকল কথা গীতিকাটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম-প্রচারার্থ লিখিতকাব্যে কোথাও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও নির্ম্মমতা নাই।

'সোনাবিবি'-র পালাটির রচনাকারীর নাম পাওয়া যায় নাই, তবে তিনি যে মুসলমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পালাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ময়মনসিংহের কেন্দুয়া আইথর গ্রামবাসী চন্দ্রকুমার দে। ময়মনসিংহের কাটিহালী নিবাসী রহমান সেখের নিকট হইতে তিনি এই পালার অনেকাংশ পাইয়াছিলেন। কবির বাড়ী ছিল শ্রীহট্ট জেলায় বানিয়চঙ্গ নামক প্রসিদ্ধ পল্লীতে—ভেরামনা নদীর তীরে। বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান জুমন খাঁ দয়া করিয়া তাঁহাকে কতকটা জমি দিয়া বাড়ী-ঘর করিয়া দিয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছেন—"মা-বাপে দিছে জন্ম, তিনি দিছেন ভাত।" কবি যথারীতি আল্লা-নিরঞ্জনকে বন্দনা করিয়া ওস্তাদের পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছেন; তারপর পীর-পয়গম্বরদিগকে 'মাথা-নোয়াইয়া' বন্দনা করিয়াছেন। এই নাথ-সম্প্রাদয়ভুক্ত এক বিপুল জন-সাধারণ ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই প্রমাণ

করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, সুতরাং সেই সংস্কার যে বংশ-পরম্পরা তাহাদের শোণিতে প্রবাহিত হইয়া আসিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—মুসলমান কবিদের অনেকে তাঁহাদের জন্ম-পল্লীকে প্রণতি জানাইয়া মুখ-বন্ধ করিয়াছেন, এই অশিক্ষিত কবিদিগকে কোন মোল্লা বা শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত কিছু শিখায় নাই, কিন্তু তাঁহারা জানেন মাতৃ-পল্লী তাঁহাদের কত শ্রদ্ধার সামগ্রী, তাঁহারা তাঁহাদের দেশ-মাতৃকার প্রতি প্রাণের ভালবাসা অতি শ্রদ্ধা-সহকারে জানাইয়াছেন। হিন্দু কবি হইলে শুধু গঙ্গা-নদীর বন্দনা করিতেন, কিন্তু মুসলমান কবির হিন্দু-শাস্ত্রের কোন সংস্কার নাই, 'সোনা বিবি'র কবি লিখিয়াছেন—'ভেরামনা নদী বন্দুম বহে শত নালে।' শুধু তাহাই নহে—'পাড় বন্দি বৃক্ষ বন্দি ডালে আর মূলে।' এবং অন্য এক স্থানে 'গোয়ালেতে গরু-বাছুর গাহিত বন্দিয়া'—তিনি কৃষক-কবি, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ শিখান নাই যে, নদীদের মধ্যে গঙ্গাই একমাত্র বন্দনীয়, সে হয়ত গঙ্গা নদী দেখেনই নাই, তাঁহার নিবাস পল্লী-নদীর তীরে—যাহার তীরভূমি, জল এবং বৃক্ষ-লতার সঙ্গে তিনি চির-পরিচিত, যে গোয়াল-ঘরের গরুবাছুর তাহাকে জীবিকার সংস্থান করিয়া দিতেছে, এই সকলই তাঁহার স্বগণ ও পূজনীয়। মা-বাপের কথা মনে হইলে তাহাদের কথাও মনে হয়—বন্দনার সময় এই অন্তরঙ্গদিগকে তিনি ভুলিবেন কিরূপে। আমাদের অনেক প্রবাসী বন্ধুকে কলিকাতায় দেখিয়াছি, 'তাঁহাদের বাড়ী কোন্ নদীর তীরে' জিজ্ঞাসা করিলে, অনেকক্ষণ ঘাড় চুলকাইয়া স্মরণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। অথচ নাইল, সিন, ইয়াং সিকিয়াং প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত না ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিতে পারেন। এই স্বদেশ-ভক্তগণ দেশের প্রতিনিধি হইয়া বক্তৃতায় স্বদেশের প্রেম জাহির করেন, কিন্তু কৃষক-কবিরাই দেশ-মাতার খাঁটি সন্তান, দেশের প্রতি ইহাদের দরদ খাঁটি, তাঁহাদের চক্ষে গোয়ালঘরটি

পর্য্যন্ত মন্দিরের মত পবিত্র। আপনারা পুঁথিপত্র ও পার্শি-উর্দ্দুর বয়াৎ বা শাস্ত্রের শ্লোক লইয়া আসিয়া ইঁহাদের সরল বিশ্বাসে হানা দিবেন না। আমার মনে হয়, আমাদের অনেকের অপেক্ষাই ইঁহারা স্বদেশ-প্রেমিক।

আমি এসম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। আমি শেষের এই অধ্যায়ে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছি—হিন্দু ও মুসলমান বহুকাল একসঙ্গে বাস করিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, এই সৌহার্দ্দ-স্থাপনে পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রভাব অপরিহার্য্য—তাহা এড়ান যায় না। কবিগণ সম্যকরূপে স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যে সার্ব্বভৌম উদারতা ও প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমার কাছে অনেক মহাগ্রন্থ অপেক্ষাও সত্যের বেশী সন্ধান দেয়, কারণ তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সত্যের যে পরিচয় পায়, তাহা আমরা বই পড়িয়া পাই না। আমাদের অনেকটাই কোলাহল, অনেকটাই পরস্ব, তাহা নিজস্ব করিয়া লইতে পারি নাই, তাহা কৃত্রিম আবৃত্তি—আমাদের নিজের কথা নহে, কারণ নানা শিক্ষার কুহকে পড়িয়া আমাদের জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আমরা আমাদিগকে চিনি না, আমরা যদি আম হই, তবে মিছামিছি মনে করিতেছি—আমরা জাম এবং এই লইয়া বিতর্ক করিতেছি। এই সকল কৃষক-কবির চিত্ত অতি নির্ম্মল মুকুর স্বরূপ, সত্যের কিরণ তাহাতে সহজেই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। আমাদের কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি—তাহা আগে জানা উচিত, তাহা জানিলে কোন মতভেদের অবকাশ সেখানে থাকিবে না। আমরা কি—সে পরিচয়ের চিত্র অতি নির্ভুতভাবে এই পল্লী-পটুয়ারা আঁকিয়া দেখাইতেছেন। এক কৃষক-কবি নির্ভীক ভাবে একটি কাহিনী বর্ণনা করিলেন, তাহাতে দেখিতে পাই—"রাজবধূ তাহার একান্ত অনুরক্ত স্বামীকে কহিয়া বলিয়া এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া স্বীয় প্রণয়ীর সঙ্গে রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।" এই কার্য্যের জন্ত হিন্দু ও মুসলমান সমাজ-গুরুগণ সেই নারীর

নাসাকর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু কবি ঘটনাটি এমন দরদ দিয়া সুকৌশলে অপূর্ব্ব কবিত্ব-মণ্ডিত করিয়া আঁকিয়াছেন যে—তাহা পড়িলে স্ত্রীলোকটি কোথায় দোষ করিল, তাহা নিতান্ত অনুসন্ধিৎসু সমালোচকও খুঁজিয়া পাইবেন না বরং শেষাঙ্কে পাঠকের মন সেই রমণীর জন্য দরদে ভরিয়া যাইবে এবং প্রণয়ীটির প্রতিও অসামান্য শ্রদ্ধা হইবে। কবির হাতে সত্যের যাদুকাঠি ছিল, তিনি সামাজিক মান-দণ্ডে কিছু বিচার করেন নাই। বিচার তিনি কিছুই করেন নাই, বিচারের ভার পাঠকের উপর দিয়াছেন, তিনি শুধু শুদ্ধান্তঃকরণে শিশুর নির্ম্মল চক্ষে ঘটনাটি যেন প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেজন্য এরূপ অদ্ভুত সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন। কতবার এই সকল গাথায় কুমারী-কন্যা, পিতামাতা ও অভিভাবকগণের বিদ্রোহী হইয়া স্বেচ্ছামত বর মনোনয়ন করিয়াছে। কতবার স্বীয় স্বামীকে ছাড়িয়া অপরের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মণ-কুমারী মুসলমান বর বাছিয়া লইয়াছে এবং মুসলমান রমণী হিন্দুর পক্ষপাতিনী হইয়াছে। কবিরা যেন কোন সমাজেই বাস করেন না, তাঁহারা যেন যথেচ্ছাচারী—কিন্তু তাঁহাদের হাতে সত্যের যাদুকাঠি ছিল, তাহারই জোরে তাঁহারা সর্ব্বত্র বিজয়-কুণ্ডল কর্ণে পরিয়াছে। পাঠকের নিকট সব কথাই ভাল ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইয়াছে, সর্ব্বত্রই গীতিকাগুলি অশ্রুর উপহার পাইয়াছে। কবিরা এমন একস্থানে যাইয়া আসন লইয়াছেন, যাহা সমাজের উর্দ্ধে—সমস্ত অনুশাসনের উর্দ্ধে। আমি বিস্ময়ের সহিত এই গাথা-সাহিত্যে লক্ষ্য করি—ইহারা এত দুর্জ্জয় সাহস, এরূপ নির্ভীকতা, এরূপ স্বচ্ছন্দ ও সরল ভঙ্গীতে সত্য বলিবার সাহস কোথায় পাইলেন? ইহারা সাম্প্রদায়িক কলহ-দ্বন্দের উপরে—আমরা যেখানে বসিয়া কিচির-মিচির করিতেছি, তাহার বহু উর্দ্ধে এই সকল ভরত-পক্ষী তাঁহাদের স্বর-সুধালহরী বিতরণ করিতেছেন। ডিরেক্টর ওটেন্ সাহেব

এই মর্ম্মে গীতিকাগুলির কথা বলিয়াছেন—"বাঙ্গালীরা যে পরিমাণে এই গাথা-সাহিত্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমাজ গঠন করিতে পারিবে, ততখানি তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে এবং কুসংস্কার কৃত্রিমতার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া শুধু সাহিত্যে নহে—জীবনেও মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে, গীতিকাগুলি শুধু কাব্য বা ইতিহাস পড়ার কৌতূহল পূর্ণ করে না, ইহা জীবন্ত-সাহিত্যের প্রেরণা দিতে সমর্থ।"

[The measure of Bengal's appreciation of these ballads, not as mere historical or literary curiosities —but as living literature will be some index of the extent to which her spirit is escaping from the trammels of artificiality in its effort to express itself not only in literature but in life.] *

পূর্ব্বকালে সংবাদ-পত্রের বালাই ছিল না, তথাপি কোন বড় ঘটনা হইলে তাহা অল্প-সময়ের মধ্যে দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইত। এই প্রচার কার্য্য চালাইতেন গ্রাম্য কবিরা। হিন্দুদের মধ্যে ভাট্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এইরূপ গ্রাম্য ছড়া বাঁধিয়া দেশময় গাহিয়া ফিরিতেন, বানিয়াচঙ্গের (শ্রীহট্ট) ভাটেরা এবিষয়ে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কতকগুলি গীতিকা আমি শৈশবে শুনিয়াছি। "বরিশাল কীর্ত্তিপাশা গ্রামের রাজা রাজকুমারকে তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন, জমিদার তাঁহার নিকট হিসাব-নিকাশ চাহিয়াছিলেন, এই বিপদ এড়াইবার জন্য পাত্র মহাশয় বিষের-সরবৎ পান করাইয়া প্রভুকে হত্যা করেন। পুলিশের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি সুন্দরবনের জঙ্গলে পলাইয়া

* 'Englishman' 7th Feb. 1934.

যান, সেখানে তাঁহার বাঘের হাতে মৃত্যু ঘটে।” এই পালার অনেকটা আমার কাছে আছে, ঘটনাটি একশত বৎসরের কিছু পূর্ব্বের। আর একটি গীতিকা—রাজবল্লভের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি রাজনগরের পদ্মা-গর্ভে ধ্বংস পাওয়া সম্বন্ধে—এসকল কাহিনীতে খুঁটিনাটি অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে, যখন বর্গীর হাঙ্গামা হয়, তখন বর্গিগণ আলিবর্দ্দী খাঁর হাত হইতে পলাইবার পথে বনবিষ্ণুপুরে উঁকি মারিয়া যায়। কিন্তু বনবিষ্ণুপুরে হানা দেওয়া তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ তাহারা খুব দ্রুত গতিতে পলাইবার সুবিধা খুঁজিতে ছিল—সুতরাং শেষরাত্রে তাহারা রাজধানীর কাছে আসিয়াও কোনরূপ উপদ্রব না করিয়া ভোর হওয়ার পূর্ব্বেই চলিয়া যায়। তাহাদের গতিবিধির কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ বনবিষ্ণুপুর-বাসিগণ বিশ্বাস করিল যে, তাহাদের দেবতা মদনমোহন রাত্রের অন্ধকারে শিবিরে যাইয়া তাড়া করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। এই পালাটি ছাপা হইয়াছে। *

ইহা ছাড়া সাঁওতালগণের লুণ্ঠন, ত্রিপুরার কুকী জাতির নিম্ন-প্রদেশ আক্রমণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের পল্লী-গীতিকা আমি পাইয়াছি, এতদ্বারা লোকের সংবাদ-পত্র পাঠের কৌতূহল কতকটা মিটিত, তবে এই সকল গাথা স্থানীয় গুরুতর ঘটনা উপলক্ষে মাত্র রচিত হইত। অন্য সংবাদ অভাবে আজকালকার দৈনিকগুলি যেরূপ ‘রাস্তায় বড় ধূলি উড়িতেছে’ প্রভৃতি মৌলিক সংবাদ প্রচার করেন, এই সকল গীতিকায় সেইরূপ বিষয় থাকিত না।

এইরূপ লৌকিক-সংবাদ জ্ঞাপনপক্ষে মুসলমানগণই বেশী কর্ম্মঠতা উদ্যোগ ও তৎপরতা দেখাইয়াছেন এই সংবাদবাহী সাহিত্য এখন পর্য্যন্তও চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা প্রচার করিতেছেন—এই

* ‘বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়’ ২য় খণ্ড।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীগুলি প্রায়ই পয়ারে লিখিত হয়। এরোপ্লেন, মটর, প্রভৃতি আধুনিক সময়ের বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রাদি হইতে, রাজা থিবোর সিংহাসন-চ্যুতি, কামাল পাশার বিজয়বার্ত্তা, চট্টগ্রাম-জেলেদের কবিতা, ভূমিকম্প, চাষার ক্ষেত-নিড়ানের কবিতা, রেঙ্গুনের কবিতা, আমু-কালু গুনাগার, গরুর দুঃখ, ভেড়্যাইর মা, মুর্শিদের বার মাস, বার জিলার রঙ্গিন কবিতা, তুফানের কবিতা প্রভৃতি শত শত বিষয়ের কবিতা আমার নিকট আছে, এগুলি সাময়িক স্থানীয় ঘটনার সূচি—"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই"—প্রবাদ অনুসারে সময়ে সময়ে এই ক্ষুদ্র পুস্তকগুলির মধ্যে কিছু কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। আমরা যাহাদিগকে চাষা বলিয়া ঘৃণা করি, তাহারা আমাদের জাতির গৌরব, আমি তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাদের রচিত গাথা-সাহিত্য পূর্ব্ববঙ্গ ছাইয়া আছে, সেগুলি লোপ পাওয়ার মধ্যে—আমরা বড় বড় বাড়ী তৈরী করিয়া পড়া-শুনা করিয়া বিদেশী ভাষা প্রভৃতিতে প্রাজ্ঞ হইতেছি, অথচ দেশী সম্বন্ধে আমাদের ঐরাবৎ অজ্ঞতা উপহাসের বিষয়—কি একান্ত করুণ অশ্রুপাতের বিষয় তাহা বলিতে পারি না। এই সকল কবিত্ব-শূন্য পয়ারে রচিত সংবাদিকা গুলিও আবর্জ্জনার ঝুড়িতে ফেলিবার যোগ্য নহে, তাহারা প্রমাণ করিতেছে যে, আমাদের অজ্ঞ-জনসাধারণের জানিবার আকাঙ্ক্ষা অল্প নহে, শিক্ষিতেরা যখন অবজ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে শিখাইবেন না, তখন তাহারা নিজেদের সাধ্যানুসারে, অল্প-বিদ্যার জোরে যে অবিরত চেষ্টা করিতেছে, তাহা উপহাস করা আমাদের পক্ষে ঘোর অন্যায় হইবে। সন্ন্যাসীদের নেংটীর গেরোতে যেমন মাঝে মাঝে দুর্ল্লভ গাছের মূল ও ঔষধ গচ্ছিত থাকে, তাহা মৃত-সঞ্জিবনী ক্ষমতা রাখে, এই অর্দ্ধ-উলঙ্গ অসন-বসনহীন কৃষকদের কৌপিনের গেরো অনুসন্ধান করিলে হয়ত

কখনও এমন একখানি হীরক পাওয়া যাইবে, যাহা রাজ-প্রাসাদে নাই, সেরূপ অমূল্য ভাণ্ডার যে তাহাদের আছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা দিয়াছি।

আমার কাছে শুধু মুসলমানদের নিকট হইতে সংগৃহীত প্রায় ১৫০ খানা অপ্রকাশিত পল্লী-গীতিকা আছে। মুদ্রিত পুঁথিও আরও প্রায় তুল্য সংখ্যক আছে। বাঙ্গালা দেশের আনাচে-কানাচে যেরূপ সন্ধ্যা মালতি ফুটিয়া থাকে, বঙ্গের অজ-পাড়া গাঁয়ের কুটিরে, এইরূপ কবিতা সুলভ। কিন্তু যাহা সুলভ তাহাই মূল্যহীন নহে। বাতাস তো কত সুলভ, কিন্তু এক মিনিট হাওয়া হইতে বঞ্চিত হইলে বুঝা যায়—তাহার মূল্য কি? মায়ের স্নেহের মত সুলভ জিনিষ কি, কিন্তু যে হতভাগ্য মাকে হারায়—সে বুঝে সেই স্নেহের মূল্য কি? এই গীতিকাগুলি বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্যকে এমন করিয়া বুঝাইয়াছে, যাহা শত গবেষণামূলক, প্রাইজ ও উপাধি পাওয়া থিসিসে পারিবে না—বাঙ্গালীর শৌর্য্য বীর্য্য, বিশেষ করিয়া তাহার হৃদয়ের সুকুমারত্ব এই গাথা-সাহিত্যের সর্ব্বত্রসুপ্রকাশ। প্রকৃতি রোজ রোজ এই দেশে যে-সকল ফুল উপহার দেন, এই সকল কবিতা তাহাদের মতই সুন্দর, তাহাদেরই মত আমাদের প্রকৃতি-লক্ষ্মীর নিজ হাতের দেওয়া সামগ্রী। বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা মহা-কর্ত্তব্য—এই পল্লী-সম্পদকে সংগ্রহ করা। তাঁহাদেরই দেশের ইহারা এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমানদের দ্বারাই ইহা এতকাল রক্ষিত হইয়া আছে। যদি মুসলমানগণ তাঁহাদের নিজেদের এই মহার্ঘ সামগ্রী তুচ্ছ করেন, তবে তাঁহাদের ভাষা-জননী নিতান্তই ক্ষুব্ধ হইয়া বন-বাদারে লুকাইয়া কাঁদিবেন, সেই চোখের জলের অভিশাপের ভাজন তাঁহারা যেন না হন—বহু সাম্প্রদায়িক ঝগড়া-বিবাদ ছাড়িয়া দিয়া আমরা হিন্দু-মুসলমান যদি একত্র হইয়া স্বীয় উত্তরাধিকার রক্ষা করিতে লাগিয়া যাই, যাহা আমাদের উভয়ের

পূর্ব্ব-পুরুষেরা বংশানুক্রমে অর্জ্জন করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, যাহা সংসারের চিন্তা ভুলাইয়া দারিদ্র্য ও আধিব্যাধি জড়িত এই মানব-জীবনে নির্ম্মল অপূর্ব্ব সান্ত্বনার বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে—তবেই আমাদের কর্ত্তব্য পালন করা হইবে। আমাদের ভাষা-সুন্দরী অপরূপ রূপে জগৎ মুগ্ধ করিবেন, তিনি বোর্‌খা পরিয়া আসুন কিংবা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া আসুন, তিনি গলায় হাস্‌লিই পরুন বা সাতনড়ি হারই পরুন, গায়ে চন্দনই মাখুন, কি আতরে তাহা বাসিত করুন, তাহাতে কিছু আসিবে যাইবে না।

এই স্থানীয়-ইতিহাস-সম্বলিত কবিতাগুলির মধ্যে সেখ্ মন্‌ছুর রচিত 'শমসের গাজির গান' একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক, ইহার কাব্যাংশ হইতে ঐতিহাসিক অংশই উপাদেয়—ইহা বাঙ্গালা দেশের এক প্রান্তের একটি বিশ্বস্ত বিবরণী, আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে গরীয়ান। শমসের গাজি একটি দরিদ্র কৃষকের সন্তান হইয়াও কিরূপে সে কিছুকালের জন্য ত্রিপুর-রাজ-সিংহাসন দখল করিয়াছিল তাহার খাঁটি ইতিহাস এই পুস্তকে অতি সরল ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। আলিবর্দ্দী খাঁ ইহাকে কিরূপে মুর্শিদাবাদে নিমন্ত্রণ করিয়া হত্যাসাধন পূর্ব্বক আতিথ্য-সৎকারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তাহা গাজির বন্ধু ও চরিত-লেখক সেখ মন্‌ছুর করুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালার বিস্তৃত ইতিহাস যিনি লিখিবেন, তাঁহাকে তাঁহার এক পৃষ্ঠায় এই সুলিখিত বিবরণীর জন্য স্থান করিয়া দিতে হইবে। শমসের গাজি ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। এই পুস্তক নোয়াখালী হইতে মৌলভি লুৎফুল-কবির প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন দুষ্প্রাপ্য।

আমাদের দেশের এই অজস্র দানের সমঝদার এখানে অবশ্যই আছেন, তাঁহাদের সন্ধান লইতে আমি ঢাকায় আসিয়াছি। ইহারা অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের কবি, সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহাদের দরদী কাহাকেও পাই কিনা, জানিতে আসিয়াছি। গীতিকাগুলি লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, কিন্তু ফুলের মত

তাহাদের বাসি হইবার সম্ভাবনা নাই। রচনার দিন তাঁহারা যে সুঘ্রাণ দিয়াছেন, এখনও তাহাদের সেই সুঘ্রাণ আছে। তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের কোকিলের ডাক, বর্ষাকালের কেয়াফুলের ঘ্রাণ ও বসন্তের মলয় সমীরণ সকলই আছে। তাহারা খাঁটি বাঙ্গালার জিনিষ, এই দেশের শোভা, সমৃদ্ধি। সম্প্রতি আশুতোষ চৌধুরী 'মজুনা' নামক একটি গীতিকার সন্ধান দিয়াছেন। তিনি রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে উহা পাঠাইয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন। এই গীতিকায় সায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজার্গা উমেদ খাঁর নেতৃত্বে মগদের সঙ্গে মোগল-সৈন্যের যে ঘোরতর নৌ-যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ণনা আছে। বর্ণনাটি পড়িলে মনে হয়, যেন উহা কবির চাক্ষুষ ঘটনা। কবির নাম নাই, কিন্তু বন্দনাটি পড়িলে তিনি যে মুসলমান তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না, নায়ক-নায়িকা সকলেই মুসলমান। যুদ্ধের বর্ণনা—

"সারা দিন যে যুদ্ধ হৈল মগ-মুসলমানে।
বেলার শেষে কালা মেঘ উড়ে হাইড়া কোণে॥
ধীরে ধীরে সেই মেঘ আস্‌মান ছাইল।
ঝাপ্‌টাইয়া তুফান এক উত্তর থনে আইল॥
বেবান সাগরে তখন হৈল বিষম হাল।
চাইর দিকতুন ডাক পৈল 'সামাল, সামাল॥'
উপরে উঠিছে ঢেউ আকাশ বরাবর।
নীচের-দিকে পড়ে যেন পাতালের ভিতর॥
বিজুলী ঠাটার ডাকে আস্‌মান ভাইঙ্গা পড়ে।
রণবাদ্য থামি গেল শঙ্খমুখের চরে॥
পরাণের লালসে মগে ডাকে 'ফরা, ফরা।'
এইবার নিরঞ্জন সঙ্কটেতে তরা॥

নৌকা-মারা জল পৈল কে করে সন্ধান।
শত শত মরি গেল মগ-মুসলমান॥
হিন্দু লাঠিয়াল মৈল, ভাসি' গেল লাঠি।
মগে ন পাইল আগুন, মুসলমানে মাটি॥"

এক প্রহর রাত্রির পর তুফান থামিয়া গেল, মাঝিমাল্লা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তখন সেই বিভীষিকার চিত্রপট উত্তোলন করিয়া কবি কাব্যের প্রধান নায়ক সায়াদের প্রাণ-রক্ষার সংবাদ দিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করিলেন—

"আঁধার রাইত আসমানেতে উঠল সোনার চাঁদ॥
চাটগাঁইয়া মাঝি সায়াদ বাঁচা গেছে॥"

যুদ্ধের বর্ণনা বহু বিস্তৃত, কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"প্রথমে চলিল 'ঢুলব' লইয়া কামান।
দূরে থাকি দেখা যায়রে পাহাড়ের পরমাণ॥
আর এক জাহাজ চলে গোলা-বারুদ লৈয়া।
তার পাছে চলে ফৌজ 'ঘরাবে' চড়িয়া॥
'ঘরাবে'র পাছে বাঁধা 'জলেবা'র বসি।
পাছেতে বসিয়া মাঝি হালধরে কষি'॥
মগের 'জলেবা' নৌকার কি করি বর্ণন।
সাগরেতে চলে যেন হাঁসের মতন॥
জোয়ারের ওক হইছে, মাথায় গরুজ খাড়া।
দুই দিক থনে বাজনা বাজে কাড়া আর নাগড়া॥
শেষ ভাটায় গাঙের পানি অলছ তলছ করে।
মগের বহর আইল তখন শঙ্খমুখের চরে॥

শঙ্খমুখেব ডুবা চর বড় বিষম জায়গা।
মাঝি মাল্লা এইখানে পাইছে কত দাগা ॥
দুই দিগেতে বাজি' উঠ্ল লড়াই বাজনা।
সাগরে আসিল জোয়ার মাতিল পবনা ॥"

* * *

"বাদ্শাই নাওরা হৈতে খেঁচিল কামান।
মগের 'ঢুলব' তার দিল পরতিদান ॥
কামান-আবাজে কান হৈল ঝালপালা।
আকাশ ধুমায় ছাইল, সাইগর উতালা ॥
গাঙের কইতর উইড়া ধাইল, ধাইল মাছের ঝাঁক।
মুসলমানে পাইয়ে আজ খাউগ্গা মগর লাগ ॥
বন্দুক ছাড়িছে কেহ, কেহ ছাড়ে তীর ॥
দুই কিনারারত্তুন মারা পৈল শত শত বীর ॥
রোসাঙ্গ্যার তীরের কিছু শোনরে বয়ান।
আগার গোলাদে বিষ পিছে কৈর বাঁধান ॥
চুঙ্গায় ভ'রিয়া তীর মুখে ফুঁক মারে।
হায়রান করিল তারা বাদ্শাই ফৌজেরে ॥"

* * *

'জলেবা' 'ঘুরাইয়া টানে 'ঘরাবে'র পাশ।
বাদ্শাই 'নাওরা' যদি ঘিরে সর্ব্বনাশ ॥
সায়াদ করিল কিবা শুন বিবরণ।
ফৌজদারের নিকট যাইয়া দিল দরশন ॥
সায়াদ কহিল—'আইজ মগে যদি ঘিরে।
বাদ্শাই 'নাওরা' একখান (ও) ন যাইব ফিরে ॥

রোসাঙ্গ্যার মগ তারা জানে চোরা বাণ।
ঘিরে যদি, মগর হাতৎ যাইব সবার জান॥'
ফৌজদারের সহিত সায়াদ পরামিশ্ব করি।
লৈয়া 'বালাম' সুকা চলে তড়াতাড়ি॥
লৈল ক'জন লাঠিয়াল বড় বড় বীর।
মগের 'জলেবা'র কাছে হৈল হাজির॥
'জলেবা'র মগ্যা মাঝি বড় ভয়ানক।
কিযে কাণ্ড কৈল্ল তারা, শুন আচানক॥
ঝম্প দিয়া পৈল্ল তারা সাইগরের জলে।
একই ডুবে চলি আইলো বালাম সুকার তলে॥
বালামের তলে আসি কি কাম করিল।
ঢুশ দিয়া সেই না সুকা উলটাইয়া দিল॥
লাঠিয়াল পড়ে জলে লাঠি সঙ্গে লই।
কেহ ডুব মারে, কেই চিৎ হই॥"

অনেক কথা আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ হইয়া গিয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই জাহাজের নাম, যাহা দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বেও আমরা চালাইতাম এবং হয়ত তাহার কোন কোনটি এখনও চট্টগ্রামের বন্দরে দুষ্প্রাপ্য নহে। বঙ্গোপসাগরের কত দ্বীপ, উপদ্বীপ বালুরচর প্রভৃতির নাম ও বর্ণনা এই গীতিকাগুলিতে আছে, তাহা আর কি বলিব? বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমরা পোপোকেটিপেটেল ও হনলুলু দেশের বিষয় খুবই প্রাজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছি, অথচ আমাদের বাড়ীর কাছে, বঙ্গোপসাগরের অতি সন্নিহিত স্থানগুলির নাম জানি না। এখনও চাটগাঁয়ের মাঝিরা সে-সকল দ্বীপে আনাগোনা করে। আমরা যে ভূগোল পড়ি, তাহা সিনেমার ছবির মত, কিন্তু এইসব দেশের বাস্তব ও দুরন্ত অভিজ্ঞতা

যাহাদের আছে, তাহারা অশিক্ষিত বলিয়া আমরা ঘৃণা করি এবং যেমন করিয়া তাহাদিগকে ঘৃণার সহিত সমাজের বাহিরে রাখিয়াছি, তেমনই তাহাদের অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের লেখায় তাহাদের কোন কথা দিতে কুণ্ঠিত হই।

যে-সকল জাহাজের নাম ও স্থানের নামের সঙ্গে আমাদের দেশের শিশুদেরও পরিচয় থাকা উচিত, আমাদের দম্ভোলি, ইরম্মদ, একদস্যুপবাস প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ-বহুল অতিকায় বাঙ্গলা অভিধান খুঁজিলে তাহাদের একটির নামও পাওয়া যাইবে না।

স্থানে স্থানে কবি দুটিছত্রে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। একটি অধ্যায়ের মুখবন্ধ-স্বরূপ তিনি যে চরণ দুইটি লিখিয়াছেন তাহা এই—

"মন কুইলার ছাও—ওরে মন কুইলার ছাও।
কোয়ে তুমি চিনি লৈলা দইনালী বাও।"

"রে মন কোকিলের ছানা, তুই দক্ষিণা হাওয়া কি করিয়া চিনিলি?" কোকিলের ছানা দক্ষিণা হাওয়া বহিলেই কুহু কুহু করিয়া উঠে।

১৪। রঙ্গপুর ঘোড়াঘাট নিবাসী হায়াৎ মামুদ 'আম্বিয়ার বাণী' নামক একখানি বৃহৎ কাব্য ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন, সেই বৎসর পলাশীর যুদ্ধের বৎসর। এই পুস্তকের একখানি প্রতিলিপি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে করিমুল্লা নামক এক লেখক তৈরী করেন। সুতরাং গ্রন্থ রচনার প্রায় ১০০ শত বৎসর পরেও ইহা নকল করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। পুঁথিখানি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র সেন সংগ্রহ করিয়াছেন, পত্র সংখ্যা ১১০।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, ইহাতে আদম ও ইভের বৃত্তান্ত, শয়তানের ছলনা, মহা-প্লাবন ও নোয়ার তরণী প্রভৃতি পুরাতন 'টেষ্টামেণ্টের' কাহিনী ছাড়া জগৎ-উৎপত্তির যেসব বর্ণনা আছে, তাহার হয়ত কতক কতক মুসলমানী শাস্ত্র হইতে কবি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

কিন্তু নাথ-ধর্ম্মাবলম্বীদের সৃষ্টি-রহস্য ও ব্যাখ্যা তাহাতে মিশিয়া গিয়াছে। কবি হজরত মোহাম্মদের সঙ্গে 'নাথ-নিরঞ্জনের' আবির্ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। এই পুস্তকের আদ্যন্ত গুরুর প্রতি ভক্তি উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শেষাংশে ইসলামের জয় ও কয়েকজন রাজকুলোদ্ভব নর-নারীর ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণের বিজয়-বার্ত্তা বর্ণিত হইয়াছে মাতার প্রতি বন্দনাটি এইরূপ—

"কাঁখে বুকে করিয়া লইয়াছ সর্ব্বক্ষণ।
প্রাণ পুত্র বলি'—মুখে দিয়াছ চুম্বন ॥
খাইতে না জানি খাদ্য মুখে দিছ তুলি।
কহিতে না জানি কথা শিখায়েছ বুলি ॥"

নবম পরিচ্ছেদ

শেষ কথা

এই পল্লী-গীতিকার জগৎ আমার চক্ষে একরূপ স্বপ্নে-পাওয়া সাম্রাজ্য, এই খনি কালিফর্ণিয়া ও গোলকুণ্ডার রত্ন-খনি অপেক্ষা আমার চক্ষে মূল্যবান।

পল্লী-গাথার কবি হিন্দুও আছেন, মুসলমানও আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্ট নর-নারীর কোন জাতি নাই, তাহারা এক পরিবারের লোক, তাহাদের তিলক, টিকি বা ফেজ নাই, তাহাদের সকলেরই গায়ে এক ছাপ মারা—তাহা প্রেমের ছাপ।

প্রেমকে আমি তিন-ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম শ্রেণী—দৈহিক। তাহাতে চুম্বন, আলিঙ্গন ও স্পর্শাদির জন্য প্রাণ ধড়ফড় করে, দৈহিক তৃপ্তি মিটিলে অনেক সময় তাহার আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না, ইহা নিবৃত্তি পাইয়া যায়, ঈদৃশ প্রেমে নাভীকূপ হইতে বেণীর লহর পর্য্যন্ত সমস্তই কামের শরাসনের আসবাব-পত্র। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কালীকৃষ্ণদাসের 'কামিনী কুমার' এবং রসিকচন্দ্র রায়ের 'জীবন তারা' প্রভৃতি পুস্তকে এইরূপ রচনায় বহু নিদর্শণ পাওয়া যাইবে। এই শ্রেণীর কোন কোনখানি পুলিশ আইনের আমলে আসিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেম—মানসিক। ইহা তরুণ বয়সের স্বপ্ন-ঘোর রাজ্যের আবহাওয়ায় ফোটে, খুব জাঁকাল ভাবেই ফোটে, তখন ইহা ধরাতলে স্বর্গের স্বপ্ন দেখায়, নায়িকার শ্রী আশ্রয় করিয়া বিচিত্র মনোভাবের সুরভি বিতরণ করিয়া ইহা মনের আনাচে-কানাচে আনাগোনা করে—কিন্তু এই স্বপ্ন-বিলাসী প্রেমের কোন স্থায়ী অবলম্বন নাই, লতা যেমন তাহার পুষ্পের ঐশ্বর্য্য লইয়া আজ এ-তরু শাখা, কাল একটা বাঁশের খুঁটী যাহা কিছু কাছে

পায় তাহাকে অবলম্বন করিয়া নিজের লীলা-খেলা দেখায়—এপ্রেমও তেমনই—পাতা-বাহার গাছের মত ইহার বাহ্যিক রূপ আছে, কিন্তু ইহা পরিণামে ফুল কি ফল কিছুই দেয় না—"দেখতে অতি বড় লাল, মনে ভাবি পাব মাল পাপড়ি গুলি খুলে দেখি মধু নাই তার, শুধুই তুলো।" এই প্রেমকে রোমান্টিক নাম দিতে চাও দিও। আমাদের তরুণ কবিদের কেহ কেহ এই পাঠশালার ছাত্র। এখনকার অবিশ্রান্ত ও অক্লান্ত কর্ম্মঠতার দিনে যাহারা প্রেমকে শুধু সাময়িক আনন্দের জন্য চান, তাঁহারা এইটুকুতে তৃপ্ত হইয়া থাকেন—অবসর মত ইহাতে একটু মনের হাওয়া পরিবর্ত্তন করায় এবং খানিকটা সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রনা ভুলাইয়া দেয়, ইহা সাহিত্য জগতের আধুনিক সিনেমা।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রেম—দেহ ও মনের গণ্ডি ছাপাইয়া উঠিয়াছে, ইহা আত্মিক প্রেম, ইহাতে কিছু দৈহিক, কিছু মনের উপদান অবশ্য থাকিবে, তাহা না হইলে জড়-জগতে উহা সম্পূর্ণরূপে একটি বায়ব্য-লতার ন্যায় হাওয়ার উপরে চড়িয়া থাকিতে পারে না, এমন-যে সুন্দর সুগন্ধি ফুলের গাছ, তাহারও কাণ্ড, শাখা ও বাকল থাকিবেই। কিন্তু সেই গাছের পরিচয় কাণ্ড, শাখা বা বাকল নহে, ফুলই তাহার পরিচয়। এই আত্মিক-প্রেম দেহী হইয়াও বিদেহী, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইয়াও অতীন্দ্রিয়, ইহা শুধু তপস্যার ক্ষেত্রে জন্মে, দুঃখ ও ত্যাগ ইহার মাথার মুকুট, আত্ম-বিস্মৃতি ও তন্ময়তা ইহার প্রাণ, ইহা সম্পূর্ণরূপে তপস্যা এবং সাধনাজাত। ইহা কখনও পার্থিব-সুখের ভরসা দেয় না, হয়ত কাঁটা-বন দেখাইয়া দেয়, কিন্তু যে ইহার ডাক শুনিয়াছে, তাহার কাছে কাঁটা-বন 'ফুল বন সম'—মৃত্যু তাহার কাছে বিভীষিকা হারায়, প্রেমের জন্য সে তিল-তুলসী দিয়া দেহ মন বিকাইয়া ফেলিয়াছে। আধুনিক কালের চলন্ত গাড়ীর লোক আমরা—আমাদের নানা কাজ। জগতে অর্থের জন্য, স্বার্থের জন্য ছুটাছুটি

করিয়া মরিতেছি, অবশ্য প্রেম একটা মিষ্ট জিনিষ, তাহা চাই। কিন্তু তাহা ঠিক সরবতের মত তরল হইবে, সুরার মত উত্তেজক হইবে, যেন পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী যাওয়া পর্য্যন্ত একটু মশগুল হইয়া থাকিতে পারি। আর তো অবসর নাই সুতরাং সাধনা-রাজ্যের কথা আমাদের কাছে নিছক পাগলামি, সে যুগেও এখনকার প্রবৃত্তির লোক না ছিল, এমন নহে, তাহারা হাফেজকে দেওয়ানা এবং চণ্ডীদাসকে পাগলা-চণ্ডী বলিত। কিন্তু এই পাগলেরাই এখন পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে মানুষ-সমাজ শাসন করিয়া আসিতেছেন। আমরা ভাগ্য-বলে বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়াছি, ইহা সাধনার তীর্থক্ষেত্র, আমরা যেন তপস্যার প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হই, যে-দিন তাহা হইব—সে-দিন আমাদেব মৃত্যু।

এই গাথা-সাহিত্য সেই অলৌকিক তপস্যার ক্ষেত্রে জন্মিয়াছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, গাথা-বর্ণিত নায়িকাগণ এক পরিবারের লোক, ইহাদের নিরুপম সৌন্দর্য্য বুঝিতে আপনাদের নিবৃত্তিমুখী হইতে হইবে, এই জড় জগতের পরপারে যে রাজ্য আছে—তাহার ভাষা বুঝিতে হইবে। মদিনার স্বামী-গত প্রেম বহু স্ত্রী নিক্কণে (নিনাদিত) একতান সুরের মধ্যে বাস্তবতাকে অবাস্তব-সৌন্দর্য্য দিয়াছে 'আয়না বিবি'র শেষাঙ্কের করুণ মুর্ত্তিকে বরেণ করিয়াছে, ভেলুয়ার শত দুঃখকে স্থল-পদ্মে পরিণত করিয়া প্রেমের মহিমা বিকীর্ণ করিতেছে। নিত্য উদ্ভাবিত উদ্ভট্ কর্ম্মধারার মধ্যে মহুয়ার নীরব প্রেমকে অব্যক্ত ও মহীয়সী করুণায় বিমণ্ডিত করিয়াছে ত্যাগশীলা মহুয়াকে প্রেমরাজ্যের সম্রাজ্ঞীর মত উজ্জ্বল রূপে দেখাইয়াছে, নদী-গর্ভে তাঁহার বিসর্জ্জনের চিত্রে যেন দেবী-বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, চন্দ্রাবতীর প্রেম—সংযম ও সেই নিত্য লোকের সংবাদ দিয়াছে, দুলাল' অশ্বের আরোহী সখিনার অমর আলেখ্য যেন সমাধির উপরে প্রতিষ্ঠিত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত একখানি দেবী-মূর্ত্তির

মত অপার্থিব অম্লান সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে, রাণী কমলার অচঞ্চল মৃত্যুপণকে মৃত্যুর অতীত-লোকের ইঙ্গিতবাহী করিয়াছে। নাম ভিন্ন ইঁহাদের কে হিন্দু কে মুসলমান বুঝিবার উপায় নাই, ইহারা এক পরিবারের লোক—ইঁহাদের লোকালয় অমরা।

কবিগণ ষ্টিফেন ইঙ্ক দিয়া পার্কার ফাউনটেন পেনে লেখেন নাই, তাঁহারা রাজানুগ্রহের পাগ মাথায় বাঁধিতে পারেন নাই, এমন কি তাঁহারা বাঁশের কলমেও লিখিয়া যান নাই মানুষের স্মৃতিই ইঁহাদের অন্তরের ভাষার বাহন, এই বাহন বড় খামখেয়ালী, ইহা যা'-তা' বহন করিতে সম্মত হয় না, কেবল চটকা জিনিষ দেখাইয়া ইহাকে বশীভূত করা যায় না, মনের দরদ দিলে ইহা সেই স্নেহ-চিহ্ন কবচের মত যুগ-যুগান্তর কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। এক-কালে হিন্দুরা বেদকে এইভাবে স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের গাথাগুলি বহু শতাব্দী যাবৎ এইভাবে নর-নারীর মনের আকুলতা ও স্মৃতির বলে টিকিয়া আছে, নেংটীপরা চাষা এখানে ভাব-রাজ্যের রাজা, নেংটীপরা সাধু ও ফকিরের মত ইহারা রাজানুগ্রহ বা কোন সমালোচকের মুরব্বিয়ানা প্রত্যাশা করে না। শুভমস্তু—